খুশবন্ত সিং এর

ট্রেন টু পাকিস্তান

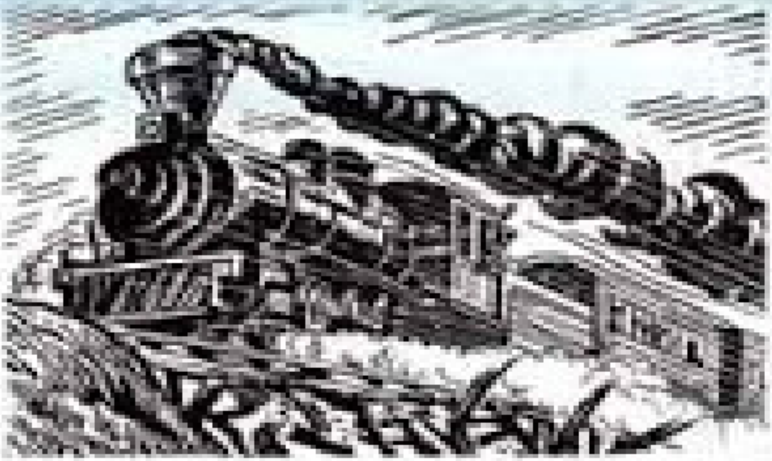

ট্রেন টু পাকিস্তান

খুশবন্ত সিং

১৯৫৬

হঠাৎ এক অচেনা শিশু দুর্ঘটনায় রাস্তায় অনেকের সম্মুখে মারা গেল । আশপাশের মানুষ সবাই ছুটে এলো। সবাই দুঃখ করলো এই অনাকাংখিত মৃত্যুর জন্য। কিছুক্ষন পর শিশুটির ধর্ম জানা গেল। এবার কিছু মানুষের দুঃখ লাঘব হয়ে গেল। বরং অন্য ধর্মের হবার কারণে তারা মনে মনে খুশী হলো। যদিও সেটা প্রকাশ করলো না। আর যারা শিশুটির ধর্মের অনুসারী তাদের কষ্ট অনেকখানি বেড়ে গেল।

আর এই হলো বর্তমান ধার্মিকদের বড় একটা অংশের মানসিক অবস্থা। অথচ প্রতিটি ধর্ম মানবতার কথা বলে। সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার কথা বলে। আর ধর্মের প্রকৃত ভাষা বোঝার ক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে। আর সেই রকম একজন মানুষের আত্নত্যাগের গল্প নিয়ে খুশবন্ত সিংয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস ট্রেন টু পাকিস্তান।

কাহিনী সংক্ষেপেঃ

১৯৪৭, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতের পাকিস্তানের প্রায় এক কোটি মানুষ দিশেহারা। লাশে ভরা ট্রেন পাঠানোর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে দুই দেশের উন্মত্ত কিছু পশু। দুই নতুন সৃষ্ট দেশের পাঞ্জাব সীমান্তের গ্রাম মানো মাজরা। এখানে শিখ আর মুসলিমরা মিলেমিশে বসবাস করে। মাত্র কয়েক মাইল দূরে সাম্প্রদায়িকরা আগুনে একে অপরকে পোড়াচ্ছে সে খবর এ গ্রামের মানুষগুলো তখনও জানে না। আর এই গ্রামের ভয়ংকর বংশীয় এক ডাকাত বাস করে। নাম জুগগাত সিং । গ্রামের ইমাম বখশের মেয়ে নুরানের সাথে জুগগাত সিং এর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে একজন ডাকাত আর গ্রাম্য ইমামের ভালোবাসার সম্পর্ক অনেক সাদামাটা মতে হতে পারে। কিন্তু এই ভালোবাসাই জুগগাত সিং এর ভেতরের মানুষকে স্পর্শ করেছিলো, তাকে বলেছিলো কি তার প্রকৃত কর্তব্য। এর মাঝে গ্রামে একদিন ডাকাতি হয়। ডাকাতরা গ্রামের একমাত্র হিন্দু মহাজন লালাকে হত্যা করে। কিন্তু পুলিশ এই ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। জুগগাত সিং কে গ্রেফতার করা হয় যদিও পুলিশ জানত এতে জুগগাত সিং জড়িত নয়। এই ডাকাতিতে শিখরা জড়িত থাকলেও মুসলিম দের সতর্ক কথা হয়। কিন্তু এর পিছনের সাম্প্রাদায়িক হিংসার উপস্থিতি মনে হলেও জেলা ম্যাজিট্রেট হুকুম সিং এর ছিলো এক অন্যরকম সমীকরণ, যার থেকে পরিশেষের মুসলিমরাই উপকৃত হয়। হঠাৎ একদিন পাকিস্তান থেকে শিখদের মৃতদেহ ভর্তি একটি ট্রেন এসে পৌছায়। পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে। মানো মাজরায় মুসলিমদের অবস্থান ঝুকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাদের নিয়ে যেতে পাকিস্তানের পাঠান সৈন্যরা ট্রাক নিয়ে আসে ক্যাম্পের নিয়ে যাবার জন্য। শত শত বছরের ভালোবাসা আর সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন করে মানো মাজরার মুসলমানদের বাধ্য করা হয় তাদের গ্রাম ত্যাগ করে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে। কিন্তু মানো মাজরার একদম বহিরাগত শিখ উপস্থিত হয়। তারা গ্রামের শিখদের উস্কানি দিতে শুরু করে পাকিস্তানের দিকে চলমান ট্রেনে আক্রমণ করে শিখদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। এইসব ঘটনার মধ্যে জুগগাত সিং ছাড়া পেয়ে যায়।

আর তারপর?

সেটা জানতে হলে এই ঐতিহাসিক অসাধারণ উপন্যাস টি পড়তে হবে।

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় খাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

অনুবাদকের কথা

খুশবন্ত সিং এর ট্রেন টু পাকিস্তান

অনুবাদ আবু জাফর

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তির ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাস ট্রেন টু পাকিস্তান পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তি সারা বিশ্বের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ঐ সময় ভারত ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়। ভারত ও পাকিস্তানের। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু নয়। দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িকতার নগ্নরূপ সাধারণ মানুষের জীবনকে যেভাবে আলোড়িত করে তা বিশ্বের অন্য কোন দেশে সংঘটিত হয়েছে কি-না তা আলোচনার একটা বিষয় হতে পারে। এদিকে বাংলা আর ওদিকে পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে দু'টো অংশ যুক্ত হয়। ভারত আর পাকিস্তানের সঙ্গে। ধর্মের কারণে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। আশ্রয়ের সন্ধানে অন্য দেশে যাওয়ার সময় কত মায়ের বুক খালি হয়েছে, কত লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে, অপমানের শিকার হয়েছে কত মা-বোন তার হিসাব হয়ত কোন দিন পাওয়া যাবে না। হেঁটে, গাড়িতে চড়ে বা ট্রেনে করে যাওয়ার সময় কত লোক যে সারাজীবনের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাওয়ার পথেই বা কত লোক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয় তার হিসাবই বা কে দেবে! মানব ইতিহাসের এ ট্রাজেডি নিয়ে যে সব উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে ট্রেন টু পাকিস্তান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। অনেকে এ উপন্যাসকে সামাজিক দলিল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

কেউ বলেছেন, ক্লাসিক সাহিত্যের দাবি করতে পারে এই উপন্যাসটি। এর লেখক খুশবন্ত সিং নিজেও ছিলেন পাকিস্তানের অধিবাসী। দেশ বিভাগের সময়কার সেই উত্তল তরঙ্গের দিনগুলোতে তিনি তাঁর পরিবারের অন্যদের সাথে ভারতে চলে যান। একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক হিসাবে তিনি এখন সবার কাছে পরিচিত। তাঁর অসংখ্য লেখা প্রতিদিনই কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর লেখা পড়েননি এমন লোক ভারতে খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর সেক্স ঘেঁষা ব্যঙ্গাত্মক লেখা সব বয়সের লোকের কাছেই প্রায় সমান প্রিয়। সুপণ্ডিত ও প্রতিভাধর এই লেখক সমগ্র উপমহাদেশেই খ্যাতিমান।

দীর্ঘদিন ভারতে একটি নাম করা শহরে অবস্থানের সময় যে দুজন লেখকের লেখা পেলে আমি না-পড়ে শান্তি পেতাম না, তার মধ্যে একজন হলেন এম জে আকবর এবং অন্য জন খুশবন্ত সিং। বয়স আশির ওপর। কিন্তু বয়স এখনও মিঃ সিংকে কাবু করতে পারেনি। ভারতের প্রতি প্রান্তে তিনি ঘুরে বেড়ান। আশপাশের দেশে তিনি কখন যান, কখন আসেন, খোঁজ রাখা প্রায় অসম্ভব। বছরে দু-চারবার ইউরোপ-আমেরিকা না ঘুরলে তাঁর যেন সময় কাটে না। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লেখার সময় করে নেন। ভারতের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় নিয়মিত। খুব বড় নয়, ছোট ছোট লেখা। কিন্তু পড়লে মনে হয়। কত গভীর। সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ সচেতনতা, খেলাধুলা- কোন বিষয় বাদ নেই। অতি জটিল বিষয়ের সরল সমাধান তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে অতি সাধারণ কথায়। তরুণ-তরুণীর প্রেম, দাম্পত্য কলহ এবং সেক্স ঘেঁষা সরস আলোচনা তাঁর লেখার যেন প্রাণ।

খুশবন্ত সিং ও তাঁর স্ত্রীর সাথে দুবার সাক্ষাতের এবং তাঁদের সাথে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটাবার সুযোগ হয়েছিল আমার। ঐ শিখ দম্পতির সাথে সে সময় অনেক কথাই হয়েছিল। তাঁর বাকপটুতা, হাস্যরস আর অমায়িকু ব্যবহারে আমি শুধু মুগ্ধ নয়, তাঁর এক ভক্তে পরিণত হই। সারা ভারতে এই পরিচিত ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানসমৃদ্ধ এক বিরল _প্রতিভা আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন একের পর এক, এ কথা এখন আমার ভাবতেও ভাল লাগে। ঐ দিন তিনি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকদের একটা সাধারণ গুণের (!) কথা

বলেছিলেন হাসতে হাসতে। এরা ভাল খেতে চায়, ভাল পরতে চায়, ভাল ঘর বানাতে চায়, সুন্দরী বিবি চায় কিন্তু কাজ করতে চায় না। ঐ শিখ দম্পতির সাথে সাক্ষাত হওয়ার মাস তিনেক পরে ট্রেন টু পাকিস্তান পড়ার সুযোগ হয়। আমার। বইখানি এমন যে, পড়া শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না। অতি সাধারণ কথায় এমন সাবলীল বর্ণনা, গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সত্যি তুলনাহীন। দেশ বিভাগের সময়কার জটিল পরিস্থিতিতে গ্রামের সাধারণ লোক কিভাবে আলোড়িত হয়েছে, প্রাণভয়ে পলায়নপর মানুষ কিভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে, কিভাবে তাদের জীবন বিপন্ন হয়েছে, কিভাবে মেয়েরা সাধারণ পণ্যের মতো ব্যবহৃত হয়েছে-মানুষ দ্বারা মানুষের সেই চরম অবমাননার কাহিনী নিয়ে রচিত উপন্যাসখানি সত্যি একটা সামাজিক দলিল।

বিশিষ্ট অনুবাদক বন্ধুবর জাফর আলম প্রথমে উপন্যাসটির বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ নেন এবং লেখকের কাছ থেকে অনুমতিও নেন। পরে শারীরিক কারণে একাজ সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় এবং এ ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা তাঁর জানা থাকায় তিনি আমাকে এই বইটি অনুবাদের জন্য উৎসাহিত করেন। এ কাজে কিছুটা বিলম্ব হলেও বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে বইখানির বঙ্গানুবাদ তুলে ধরতে পেরে আমি আনন্দিত।

ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসখানি প্রথমে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়। এজন্য এ পত্রিকার উপদেষ্টা-সম্পাদক জনাব তোয়াব খান এবং সহকারী সম্পাদক জনাব নাসির আহমদ-এর অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যাপারে। জনাব বদিউদ্দিন নাজিরের উদ্যোগ আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইউপিএল-এর কর্ণধার জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আবদার রহমান এই বই প্রকাশে সবরকম সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আবু জাফর
ঢাকা, ১৪ জুন, ১৯৯৬

১.০১ ডাকাতি

ডাকাতি

উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের গ্রীষ্মকাল। ভারতের এই গ্রীষ্মকালটা ছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। এমন কি ঐ বছরে ভারতের আবহাওয়ার অনুভূতিও ছিল কিছুটা অন্য রকম। স্বাভাবিকের তুলনায় সময়টা ছিল গরম, শুষ্ক ও ধূলিময়। গ্রীষ্মকাল যেন শেষই হতে চায় না। কেউ স্মরণ করতে পারল না, কোন বছরে বর্ষাকাল আসতে এত দেরি হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষিপ্ত মেঘ শুধু ছায়াই বিস্তার করল। কিন্তু বৃষ্টি হলো না। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করল, আল্লাহ্ তাদের পাপের শাস্তি দিচ্ছে।

তাদের অনেকের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, তারা পাপ করেছে। ঐ গ্রীষ্মের আগে দ্রুত খবর রুটে গেল যে, দেশটা হিন্দু ভারত ও মুসলিম পাকিস্তানে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে। ফলে কলকাতায় শুরু হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কয়েক মাসের মধ্যে এই দাঙ্গার শিকার হলো কয়েক হাজার মানুষ। মুসলমানরা বলল, হিন্দুরা পরিকল্পনা মোতাবেক হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে। হিন্দুরা বলল, মুসলমানরাই এজন্য দায়ী। আসল কথা হলো, দুপক্ষের লোকই দাঙ্গার শিকার। উভয় পক্ষই গুলি করেছে, ছোরা মেরেছে, তীর ছুড়েছে, লাঠালাঠি করেছে। উভয় পক্ষের লোকই ভোগ করেছে। যন্ত্রণা, মেয়েরা হারিয়েছে সতীত্ব। কলকাতা থেকে ঐ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম এলাকার জনপদে। পূর্ব বাংলার নোয়াখালীতে মুসলমানরা খুন করল হিন্দুদের। বিহারে হিন্দুরা খুন করল মুসলমানদের। বিহারে নিহত মুসলমানদের বাক্স ভর্তি মাথার খুলি নিয়ে মোল্লারা ঘুরে বেড়াল পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় কয়েক শতাব্দী ধরে যেসব হিন্দু ও শিখ বাস করছিল, তারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিল পূর্বাঞ্চলে প্রধানত হিন্দু ও শিখবসতি এলাকায়। তারা চলে গেল পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, লরিতে গাদাগাদি করে, ট্রেনের পাশে ঝুলে ও ছাদের ওপর বসে। হেঁটে নদী পার হওয়ার সময়, রাস্তার চৌমাথায়, রেল স্টেশনে তারা মুখোমুখি হলো পশ্চিমাঞ্চলের নিরাপদ স্থানে পলায়নপর ভীতসন্ত্রস্ত মুসলমানদের সাথে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিল। ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার সময় পর্যন্ত এক কোটি লোক-হিন্দু, মুসলমান, শিখ পালিয়ে বেড়ালো। এ সময় শুরু হলো বর্ষ। তাদের মধ্যে প্রায় দশ লাখ লোক নিহত হলো। সমগ্র উত্তর ভারত প্রত্যক্ষ করল অস্ত্রের ঝনঝনানি। ভীতির শিকার হলো এক কোটি লোক, তারা পালিয়ে রইল। প্রসারিত সীমান্তের দূরবতী এলাকার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ছোট গ্রামই শান্তির মরূদ্যান হিসাবে টিকে রইল। এর মধ্যে একটা গ্রামের নাম মানো মাজরা।

মানো মাজরা গ্রামটি খুবই ছোট। এখানে মাত্র তিনটি দালান বাড়ি আছে। এর মধ্যে একটা বাড়ি মহাজন লালা রাম লালের। অপর দু'টো দালানের মধ্যে একটা শিখ মন্দির এবং অন্যটা মসজিদ। এই তিনটি দালান একই স্থানের তিন কোণায় অবস্থিত। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পিপুল গাছ। এছাড়া গ্রামের অন্য সব বাড়ি মাটির তৈরী, তাদের ছাদ সমান্তরাল। সামান্য উঁচু মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা আঙ্গিনা। বাড়ির সামনে সরু গলিপথ, আঙ্গিনার কেন্দ্রস্থল থেকে ঐ গলিপথে যাওয়া যায়। গলিপথ মিশে গেছে পায়ে হাঁটা পথের সাথে এবং ঐ পায়ে হাঁটা পথ হারিয়ে গেছে। আশপাশের ক্ষেতি জমিতে। গ্রামের পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে আছে একটি পুকুর। পুকুরের চতুর্দিকে রয়েছে কিকার গাছ। মানো মাজরা গ্রামে প্রায় সত্তরটি পরিবার বাস করে। এর মধ্যে লাল রামলালের পরিবারই কেবল হিন্দু। অন্যরা শিখ ও মুসলমান, প্রায় আধাআধি। গ্রামের আশপাশের সব জমির মালিক শিখ, মুসলমানরা হলো রায়ত এবং তারা মালিকের জমি চাষ করে ফসলের ভাগ পায়। ঝাড়ুদারদের কয়েকটি পরিবার আছে। কিন্তু তারা কোন ধর্মের লোক, তা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। মুসলমানরা দাবি করে যে, তারা তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু যখন মার্কিন মিশনারীরা মানো মাজরা গ্রামে আসত, তখন তারা মাথায় খাকি সোলার টুপি পরে হারমোনিয়াম বাজাতো এবং

তাদের মেয়েদের সাথে ধর্ম সঙ্গীতে যোগ দিত। কোন কোন সময় তারা শিখ মন্দিরেও যায়। কিন্তু মানো মাজরাবাসী, এমন কি লালা রামলালও একটা বস্তুকে শ্রদ্ধা করে। বস্তুটি হলো তিন ফুট বিশিষ্ট বেলে পাথরের একটা খণ্ড। ঐ পাথর খণ্ডটি আছে পুকুর পাড়ে কিকার গাছের নিচে। এই পাথর খণ্ডটি হলো স্থানীয় দেব বা দেবী। হিন্দু, শিখ, মুসলমান বা নামধারী খ্রীষ্টান-গ্রামের সবাই বিশেষ প্রয়োজনে ঐ দেব বা দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

মানো মাজরা শত্রুঘ্ন নদীর তীরে অবস্থিত, একথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে নদীতীর থেকে আধ মাইল দূরে তার অবস্থান। ভারতে নদী তীরের নিকটবর্তী স্থানে কোন গ্রামের স্থায়ীভাবে অবস্থান সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন ঋতুতে নদীর আকৃতি বদলে যায় এবং সতর্ক না করেই এসব নদী গতিপথ বদলায়। শত্রুঘ্ন পাঞ্জাবের বৃহত্তম নদী। বর্ষাকালে এর পানি বেড়ে যায় এবং তা দুকূলের ব্যাপক বালুময় তীরে ছড়িয়ে পড়ে। এর ঢেউ আছড়ে পড়ে মাটির তৈরী বাঁধের ওপর। এ সময় শত্রুঘ্ন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং এর আকৃতি প্রশস্ত হয় প্রায় মাইলের ওপর। বর্ষার পর এর স্রোতধারা ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ঐ স্রোতের গতিও হয়ে পড়ে মন্থর। জলাভূমির মধ্য দিয়ে ক্ষীণ ধারায় নদীর পানি গাড়িয়ে যায়। মানো মাজরা থেকে এক মাইল উত্তরে শত্রুঘ্ন নদীর ওপর একটা রেলওয়ে ব্রিজ আছে। ব্রিজটি বেশ সুন্দর। এর আঠারোটি প্রকাণ্ড খিলান। এক পিলপা থেকে অন্য পিলপা পর্যন্ত দেখতে অনেকটা নদীর পানির ঢেউয়ের মত। প্রতিটি খিলানের শেষে রয়েছে পাথরের ঢালাই, রেলের লাইন সংযুক্ত করার জন্য। পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে ঐ বাঁধ বিস্তারিত হয়েছে গ্রামের ষ্টেশন পর্যন্ত।

রেল ষ্টেশনের জন্য মানো মাজরা গ্রামটি আগে থেকেই বেশ পরিচিত। ব্রিজের ওপর একটা লাইন থাকায় ঐ স্টেশনে রয়েছে একাধিক লাইন। উদ্দেশ্য, জরুরী ট্রেন ব্রিজ পার হওয়ার সময় যেন অন্য ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ট্রেনযাত্রীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পান, সিগারেট, চা, বিস্কুট, মিষ্টি সরবরাহের জন্য স্টেশনের চারপাশে গড়ে উঠেছে দোকানদার ও হকারদের একটা ছোট কলোনী। এতে স্টেশনের নিত্য কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে। স্টেশনের কর্মচারীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা একটু বেশি করেই প্রতিভাত হয়। আসলে স্টেশন মাস্টার নিজেই তাঁর অফিসের পায়রার খোপের মতো স্থান দিয়ে টিকিট বিক্রি করেন, দরজার পাশে বাইরে যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে যাত্রীর কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করেন এবং তাঁর টেবিলের ওপর রাখা মেশিনের সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ করেন। যেসব ট্রেন ঐ ষ্টেশনে থামে না, সেসব ট্রেন আসার সময় তাঁকে সবুজ ফ্লাগ হাতে নিয়ে প্লাটফরমে দেখা যায়। তাঁর একমাত্র সহকারী প্লাটফরমের কাছে কাচে ঘেরা কেবিনে সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারোত্তোলন দণ্ড পরিচালনা করে, এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাওয়ার জন্য শান্টিং ইঞ্জিনকে সাহায্য করে। সন্ধ্যায়। সে প্লাটফরমে বাতি জ্বলায়। সিগন্যালের কাছে সে নিয়ে যায়। ভারী এলুমিনিয়ামের বাতি এবং লাল ও সবুজ কাচে লাগিয়ে দেয় পটি। সকালে সে এলুমিনিয়ামের বাতি ফেরৎ নিয়ে আসে এবং প্লাটফরমের সব বাতি নিভিয়ে দেয়।

মানো মাজরায় বেশি ট্রেন থামে না। এক্সপ্রেস ট্রেন তো থামেই না। লোকাল ট্রেনের মধ্যে মাত্র দু'টো ট্রেন থামে। সকালে দিল্লী থেকে লাহোর এবং সন্ধ্যায় লাহোর থেকে দিল্লীগামী ট্রেন এই স্টেশনে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য থামে। অন্যান্য ট্রেন থামে আটকে পড়ার কারণে। একমাত্র মাল ট্রেনই এই স্টেশনে নিয়মিত থামে। মানো মাজরা থেকে কোন মাল প্রায় গ্রহণ বা প্রেরণ করা হয় না। তবু এর বাড়তি লাইনগুলোতে প্রায় সব সময় ওয়াগন থাকে একাধিক। প্রতিটি চলমান মাল ট্রেন এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে কিছু ওয়াগন রেখে যায় আবার কিছু ওয়াগন নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর স্টেশনের বাইরে নীরবতা নেমে এলেও স্টেশনে ইঞ্জিনের হুশি হুশ ও হুইসেলের শব্দ, ইঞ্জিনের সাথে ওয়াগন সংযুক্ত হওয়ার শব্দ বা দুই ওয়াগন সংযুক্ত হওয়ার শব্দ সারা রাত ধরেই শোনা যায়।

এসব কারণে মানো মাজরা ট্রেনের ব্যাপারে বেশ সচেতন। দিন শুরু হওয়ার

আগেই লাহোরগামী মেল ট্রেনটি ছুটে যায়। ব্রিজের কাছে পৌঁছার সময় ট্রেন চালক নিশ্চিতভাবে দুবার দীর্ঘ হুইসেল বাজাবে। ঐ হুইসেলের শব্দে মানো মাজরা হঠাৎ জেগে ওঠে। কিকার গাছে থাকা কাকের ক-ক করে ডেকে ওঠে। একের পর এক বাদুড়গুলো উড়ে এসে পিপুল গাছের ওপর বসে এবং নিজেদের স্থান করে নেয়ার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দেয়। মসজিদের মোল্লা জানেন যে, সময়টা ফজর নামাজের। তিনি ওজু করে কেবলমুখী হয়ে দাঁড়ান এবং দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে দীর্ঘ স্বরে বলেন আল্লাহু আকবর। আজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিখ মন্দিরের গুরু বিছানায় শুয়ে থাকেন। তারপর তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন, মন্দির প্রাঙ্গণের কুয়া থেকে এক বালতি পানি তুলে নিজের শরীরের ওপর ঢেলে দেন। অতঃপর তিনি প্রার্থনা শুরু করেন। একই স্বরে, ক্রমাগত উচ্চারিত মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে।

এরপর সকাল সাড়ে দশটার প্যাসেঞ্জার ট্রেন দিল্লী থেকে এসে মানো মাজরায় থামলে নীরব মানো-মাজরায় প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়। এটা নিত্যদিনের ঘটনা। পুরুষরা মাঠের কাজে এবং মেয়েরা বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নদীর ধারে গরু চরানোর জন্য শিশুরাও বেরিয়ে পড়ে। আটা বা গম ভাঙ্গানোর কলের চারদিকে চক্রাকারে গরু ঘোরে, চাকার কিচ কিচ শব্দ শোনা যায়। ঠোঁটে ছোট ছোট কাঠি নিয়ে চড়ুই পাখি বাড়ির ছাদের চারপাশে উড়ে বেড়ায়। উঁচু মাটির দেয়ালের ছায়ায় রাস্তার কুকুর আশ্রয় খোঁজে। বাদুড়ের ঝগড়া থেমে যায়, ডানা ভাঁজ করে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

দুপুরের এক্সপ্রেস ট্রেন চলে যাওয়ার পর মানো মাজরা বিশ্রামের জন্য তৈরি হয়। পুরুষ ও শিশুরা বাড়ি ফিরে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর পুরুষরা জমায়েত হয় পিপুল গাছের ছায়ায় এবং গাছতলায় পাতা তক্তার ওপর বসে গল্প-গুজবে মেতে ওঠে। ছেলেরা মহিষের পিঠে চড়ে পুকুরে নামে এবং তারপর পিঠের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পুকুরের কাদা পানিতে লাফালাফি করে। মেয়েরা গাছের নিচে খেলা করে। মহিলারা পরস্পরের চুলে তেল মাখায়, তাদের ছেলে-মেয়েদের মাথা থেকে উকুন বাছে এবং গল্প করে। তাদের গল্পের মধ্যে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুই বেশি সময় জুড়ে থাকে।

সন্ধ্যার সময় লাহোর থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসার পর সবাই আবার কাজ শুরু করে। পশুগুলোকে একত্র করে বাড়িতে ফেরত আনা হয় এবং গাভীর দুধ দোহন করা হয়। অতঃপর তাদের একটা ঘরে সারা রাতের জন্য তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। মেয়েরা রান্না করে রাতের খাবার। তারপর পরিবারের সবাই যায় ছাদের ওপর। গ্রীষ্মকালে তাদের প্রায় সবাই ছাদের ওপর ঘুমায়। খাটিয়ার ওপর বসে তারা চাপাতি ও সবজি দিয়ে রাতের খাবার খায় এবং পিতলের বড় গ্লাসে করে সরপড়া গাঢ় দুধ পান করে। ঘুম না। আসা পর্যন্ত তারা অলসভাবেই সময় কাটায়। মাল ট্রেন আসার শব্দ শোনার পর তারা নিজেরা বলাবলি করে; ঐ মাল ট্রেন এলো। এ কথা বলার অর্থ যেন সকলকে শুভ রাত্রি জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। মসজিদের মৌলবী আবার বিশ্বাসীদের আহবান জানান নামাজ পড়ার। উচ্চ স্বরে তিনি বলেন, আল্লাহ্ মহান। বিশ্বাসীরা ছাদের ওপর থেকেই মাথা নত করে আমিন বলে। ঘুমে আচ্ছন্ন বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলার অর্ধবৃত্ত সমাবেশে শিখ-ধর্মযাজক সন্ধা প্রার্থনার মন্ত্র পাঠ করেন। কিকার গাছের ওপর কাক ডাকে নরম স্বরে। ছোট ছোট বাদুড় সন্ধ্যার আঁধারে চারদিকে চঞ্চলভাবে উড়ে বেড়ায়, বড় বাদুড়গুলো ওপরে ওঠে গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে সব কিছু নিরীক্ষণ করে। মাল ট্রেনটি দীর্ঘ সময় ধরে স্টেশনে অবস্থান করে। এক লাইন থেকে অন্য লাইনে গিয়ে ওয়াগন বদলায়। ট্রেনটি যখন স্টেশন ত্যাগ করে, তখন ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে পড়ে। বৃদ্ধ লোকরা অপেক্ষা করে ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাওয়ার শব্দ শোনার জন্য। ঐ শব্দই যেন তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এরপর মানো মাজরার জীবন থেমে যায়। শুধু জেগে থাকে। কয়েকটা কুকুর। রাতের ট্রেন অতিক্রম করার সময় তারা কেবল ঘেউ ঘেউ করে তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়।

উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।

১.০২ ঐ বছরের আগষ্ট মাসের এক গভীর রাতে

ঐ বছরের আগষ্ট মাসের এক গভীর রাতে মানো মাজরার নিকটবর্তী কিকার তরুবীথি থেকে পাঁচজন লোক বেরিয়ে এলো। তারা নীরবে এগিয়ে চলল। নদীর দিকে। তারা ছিল ডাকাত, ডাকাতি তাদের পেশা। তাদের একজন ছাড়া সবাই ছিল সশস্ত্র। দুজনের কাছে ছিল বল্লম। অপর দুজনের কাঁধে ঝুলে ছিল হালকা ধরনের বন্দুক। পঞ্চম ব্যক্তির কাছে ছিল একটা টর্চ লাইট। নদীর তীরে এসে সে একবার টার্চ জ্বালাল। বিরক্তিকর ধ্যাত্তর ধরনের একটা শব্দ উচ্চারণ করে সে টর্চ নিভিয়ে দিল।

আমরা এখানেই অপেক্ষা করব, সে বলল। সে বালির ওপর বসল। অন্যরা তাদের অস্ত্রের ওপর ভর দিয়ে তার চারপাশে হামাগুড়ি দিয়ে রইল। টর্চধারী লোকটি বল্লমধারী একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কাছে জুগ্গার জন্য চুড়ি আছে তো?

হ্যাঁ। এক ডজন লাল ও নীল চুড়ি। এগুলো গ্রামের যে কোন মেয়েকেই খুশি করবে।

কিন্তু জুগ্গাকে তো খুশি করাবে না, একজন বন্দুকধারী বলল।

দলনেতা হাসল। হাতের টর্চটা বাতাসে ছুড়ে দিয়ে আবার ধরে ফেলল। আবার সে হাসল। টর্চের মুখটা নিজের মুখে নিয়ে সুইচ টিপল। ভিতরের আলোয় তার দুই গালে হালকা লাল আভা দেখা দিল।

জুগ্গা চুড়িগুলো তার প্রেমিকা তাঁতীর মেয়েকে দিতে পারে, একজন বল্লমধারী ফোঁড়ন কাটল।

স্ফীত স্তন ও টানা টানা চোখ, মেয়েটির হাতে এগুলো মানাবে ভাল। তার নামটা যেন কি?

দলনেতা মুখ থেকে টর্চ সরিয়ে সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল। বলল, নূরান।

আহ্, বল্লমধারী লোকটি বলল, নূরান। বসন্ত মেলায় তাকে কি তুমি দেখেছ? আঁটো সাঁটো পোশাকে তার স্ফীত স্তন, চুলের খোঁপায় বাঁধা কাঁটার টুং-টাং মিষ্টি আওয়াজ, রেশমী কাপড়ের হিসহিস শব্দ। আহ!

আহ! বল্লমধারী লোকটি চুড়ি হাতে চিৎকার করে উঠল, হায়! হায়!

জুগ্গাকে সে নিশ্চয়ই উজাড় করে দেবে তার যৌবন, এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা বন্দুকধারী লোকটি বলল। দিনের বেলায় তাকে এমনই নিরীহ মনে হয় যেন তার দুধ দাঁত এখনও পড়েনি। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। অথচ রাতে সে চোখে কালো সুরমা লাগায়।

সুরমা চোখের জন্য খুব ভাল। তাদের মধ্যে একজন বলল। সুরমা লাগালে চোখ ঠাণ্ডা থাকে। অন্যের চোখের দৃষ্টিতেও এটা ভাল, বন্দুকধারী লোকটি জবাব দিল। যৌন উত্তেজনার আবেগ নিবৃত্তির জন্যও এর জুড়ি নেই।

কার, জুগ্গার? দলনেতা বলল।

অন্যরা হাসল। তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন সোজা হয়ে বসল।

শোন! সে বলল। মাল ট্রেস আসছে।

হাসি বন্ধ করল। সবাই। তারা সবাই নীরবে অগ্রগামী ট্রেনের শব্দ শুনল। গড় গড় শব্দ করে ট্রেনটা থেমে গেল, দুই ওয়াগনের মধ্যে ধাক্কা লাগারও শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিন আগে-পিছে করার এবং ওয়াগন খুলে রাখার শব্দ। শোনা গেল। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনের সাথে ছেড়ে দেয়া ওয়াগনের ধাক্কা লাগার বিকট শব্দ শোনা গেল। ট্রেনের সাথে ইঞ্জিন লাগাবার শব্দও শোনা গেল।

এখনই রামলালের সাথে দেখা করার সময় দলনেতা বলল। অতঃপর সে উঠে দাঁড়াল।

তার সঙ্গীরাও উঠে দাঁড়াল এবং কাপড়ে লাগা বালি ঝেড়ে ফেলল। তারা লাইন করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করল। একজন বন্দুকধারী একটু এগিয়ে এসে অস্পষ্টভাবে কি যেন বলতে শুরু করল। তার কথা, শেষ হলে সবাই হাঁটু গেড়ে বসল এবং মাটিতে তাদের কপাল

ঠেকাল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে পাগড়ির খোলা অংশ দিয়ে মুখ ঢেকে নিল। খোলা রইল তাদের চোখ দু'টো। ইঞ্জিন থেকে দুবার দীর্ঘ হুইসেল শোনা গেল এবং তারপর ট্রেনটি ব্রিজের দিকে যাত্রা শুরু করল।

এখনই সময়, দলনেতা বলল।

অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। নদীতীর ছেড়ে মাঠ অতিক্রম করার পর তারা বুঝতে পারল, ট্রেনটি ব্রিজের কাছে পৌঁছেছে। লোকগুলো একটা পুকুরের ধার দিয়ে ছোট রাস্তা ধরল। ঐ রাস্তাটিই এসে শেষ হয়েছে গ্রামের মাঝে। তারা লালা রাম লালের বাড়িতে এসে থামল। দলনেতা মাথা নাড়িয়ে একজন বন্দুকধারীকে কি যেন বলল। লোকটা কয়েক পা এগিয়ে বন্দুকের বট দিয়ে দরজায় আঘাত করল।

ঐ লালা! সে চিৎকার করে উঠল।

কোন জবাব এলো না। আগন্তুকদের চারপাশে কয়েকটা কুকুর জমায়েত হয়ে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। একজন বল্লমের ধারালো অংশ দিয়ে একটা কুকুরকে আঘাত করল, অন্য একজন শূন্যে গুলি ছুঁড়ল। কুকুরগুলো সরে গিয়ে-নিরাপদ দূরত্বে থেকে উচ্চ স্বরে ডাকতে লাগল।

লোকগুলো তাদের অস্ত্র দিয়ে দরজায় আঘাত করতে লাগল। একজন তার বল্লম দিয়ে দরজায় এমন জোরে আঘাত করল যে, দরজা ছিদ্র হয়ে বল্লম ঢুকে গেল।

দরজা খোল, শালার ব্যাটা। না হলে তোদের সবাইকে খুন করে ফেলব, লোকটি চীৎকার করে উঠল।

মেয়েলী কণ্ঠে উত্তর এল, তোমরা কে এই রাতে ডাকছ? লালজি শহরে গেছে।

আগে দরজা খোল, তারপর বলব আমরা কে। তা না হলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব, বলল দলনেতা।

তোমাদের তো বললাম। লালাজি ঘরে নেই। তিনি সাথে করে চাবি নিয়ে গিয়েছেন। ঘরে আমাদের কিছুই নেই।

লোকগুলো দরজায় পিঠা, লাগিয়ে জোরে ধাক্কা দিল, হাত দিয়ে দরজা টানল। প্রাচীনকালে অবরুদ্ধ নগরীর দেয়াল ভাঙ্গার জন্য কাঠের গুড়ির মুখে লোহা বাঁধার মত বন্দুকের বাট দিয়ে দরজায় তারা আঘাত করতে লাগল। দরজায় দেয়া খিল ভেঙ্গে গেল এবং দরজা খুলে গেল। বন্দুকধারী একজন লোক খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য চারজন ভিতরে ঢুকল। একটা কামরার এক কোনায় দুজন মহিলা হামাগুড়ি দিয়ে ছিল। ঐ দুই মহিলার মধ্যে অধিকতর বয়স্ক মহিলার গলা জড়িয়ে ছিল সাত বছরের কালো লম্বা চোখের অধিকারী একটা ছেলে।

বয়স্ক মহিলাটি অনুনয় করে বলল, খোদার নামে বলছি, আমাদের যা আছে সব কিছু নিয়ে যাও, সব অলঙ্কার, সব কিছু। সোনা ও রূপার চুড়ি, মল ও কনের দুল হাতে করে মহিলাটি তাদের দিকে এগিয়ে ধরল।

একজন লোক তার হাত থেকে সব ছিনিয়ে নিল।

লালা কোথায়?

গুরুর নামে শপথ করে বলছি, লালা বাইরে গেছে। আমাদের যা আছে সবই তোমরা নিয়েছ। তোমাদের দেয়ার মত আর কিছুই লালজির কাছে নেই।

বারান্দায় চারটি খাটিয়া একই লাইনে পাতা ছিল।

ছোট বন্দুকধারী লোকটি ছোট ছেলেটিকে তার দাদীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর সে তার মাথার কাছে বন্দুকের নল তাক করে রইল। বয়স্ক মহিলাটি লোকটির পায়ে পড়ে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল।

ওকে মের না ভাই, গুরুর নামে, ওকে মের না।

বন্দুকধারী লোকটি মহিলাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল।

তোর বাপ কোথায়?

ছেলেটি ভয়ে কাঁপতে লাগল। ভয়ে ভয়ে সে বলল, ওপরের তলায়।

বন্দুকধারী লোকটি ছেলেটিকে মহিলার কোলে ফিরিয়ে দিল। তারপর লোকগুলো বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। ছাদে মাত্র একটিই কামরা ছিল। তারা অপেক্ষা না করে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজার কাজা ভেঙে তারা ভিতরে ঢুকাল। ঘরে ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্টীলের বাক্স, একের ওপর অন্যটা। ঘরে ছিল দু'টো চারপাই, তার ওপর কয়েকটা লেপ ভাঁজ করা ছিল। টর্চের আলোয় দেখা গেল একটা চারপাই-এর নিচে মহাজন হামাগুড়ি দিয়ে আছে।

মহিলার স্বর নকল করে তাদের মধ্যে একজন বলল, গুরুর নামে বলছি, লালাজি বাইরে গেছে। লোকটি রামলালের পা ধরে টেনে আনল।

দলনেতা তার হাতের উল্টো দিক দিয়ে মহাজনকে চপেটাঘাত করল। তোর অতিথিদের সাথে তুই এমন আচরণ করিস? আমরা এলাম আর তুই চারপাই-এর নিচে লুকিয়ে রইলি।

রামলাল দু'হাত দিয়ে।মুখ ঢেকে নাকী সুরে অস্পষ্টভাবে কথা বলতে শুরু করল। সিন্দুকের চাবি কোথায় দলনেতা তাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

আমার যা কিছু আছে তোমরা সব নিয়ে যাও-অলঙ্কার, নগদ টাকা, হিসাব খাতা, কিন্তু কাউকেই খুন করো না। দলনেতার পা দুহাতে জড়িয়ে ধরে মহাজন অনুনয় করতে লাগল।

পকেট থেকে সে টাকার কয়েকটা বান্ডিল বের করল। এগুলো নাও, পাঁচজন লোককে টাকা ভাগ করে দেয়ার সময় সে বলল, বাড়ীতে এছাড়া আর কিছু নেই। যা আছে সব তোমাদের।

তোমার সিন্দুকের চাবি কোথায়?

সিন্দুকে আর কিছুই নেই। আছে শুধু হিসাবের খাতা। আমার যা আছে সবই তোমাদের দিয়েছি। আমার যা আছে সবই তো তোমাদের। গুরুর নামে আমাকে ছেড়ে দাও। রামলাল দলনেতার পায়ের হাঁটুর ওপর ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গুরুর নামে! গুরুর নামে!

একজন লোক মহাজনকে ধাক্কা দিয়ে দলনেতার কাছ থেকে সরিয়ে দিল। বন্দুকের বাট দিয়ে তার মুখে জোরে আঘাত করল।

রামলাল উচ্চ স্বরে চীৎকার করে উঠল, হায়! তার মুখ দিয়ে রক্তঝরাতে লাগল।

মহিলারা আঙিনা থেকে রামলালের চীৎকার শুনে ভয়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে চেঁচাতে লাগল, ডাকাত, ডাকাত।

বাড়ীর চারদিকে কুকুর ডাকতে লাগল বিরামহীনভাবে। কিন্তু কোন গ্রামবাসী বাড়ীতে এল না।

মহাজনকে তারা ছাদের ওপর বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিটালো, বল্লমের হাতল দিয়ে খোঁচা দিল, লাথি ও ঘুসি মারল। সে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল। তার দেহ থেকে রক্ত ঝরছিল। তার দু'টো দাঁত ভেঙে গেলেও সে তাদের কাছে সিন্দুকের চাবি দিল না। উত্তেজিত হয়ে একজন লোক পশুর মত শুয়ে থাকা লোকটার পেটে জোরে খোঁচা মারল তার হাড়ের অস্ত্র দিয়ে। রামলাল একটা মরণ চীৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মেঝোয় পড়ে গেল। তার পেট দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। লোকটা বাইরে বেরিয়ে এলো। তার একজন সঙ্গী শূন্যে দুবার গুলি ছুঁড়ল। মহিলারা কাতর চীৎকার বন্ধ করল। কুকুরের ডাকাডাকি বন্ধ হলো। গ্রামটি হয়ে গেল একেবারে নীরব।

ডাকাতরা লাফ দিয়ে ছাদ থেকে নেমে গলিরাস্তা ধরল। তারা বিশ্বকে যেন অবজ্ঞা করল বীরদর্পে এবং এগিয়ে গেল নদীতীরের দিকে।

আয় তারা চীৎকার করে বলল, তোদের যদি সাহস থাকে তাহলে বাইরে আয়!

তোদের মা ও বোনদের বেইজ্জতি দেখতে চাস, তাহলে বেরিয়ে আয়। সাহস থাকে তো বেরিয়ে আস্য তোরা।

কেউ তাদের কথার জবাব দিল না। মানো মাজরায় কোন শব্দ শোনা গেল না। তারা হাসতে হাসতে এবং চীৎকার করতে করতে গলিপথ দিয়ে এগিয়ে চলল গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা কুঁড়েঘর পর্যন্ত। দলনেতা দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একজন বল্লমধারীর দিকে ফিরে তাকাল।

এটাই জুগ্‌গার বাড়ী, সে বলল, তাকে আমরা যে উপহার দিতে চেয়েছিলাম তার কথা ভুলে যেও না। তাকে চুড়িগুলো দাও।

বল্লমধারী লোকটি তার কাপড়ের টোপলা থেকে চুড়িগুলো বের করে তা ঘরের দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। আঙিনায় শোনা গেল চুড়ি ভাঙার শব্দ।

ও জুগিয়া, অস্বাভাবিক স্বরে সে ডাকল, জুগিয়া। সে তার সঙ্গীদের দিকে মিটু মিটু করে তাকাল। চুড়িগুলো পরো জুগিয়া। এগুলো হাতে পরে হাতের তালুতে রঙ মেখো।

ওগুলো না হয় তাঁতীর মেয়েকে দিয়ে দিও। বন্দুকধারী একজন উচ্চ স্বরে বলল।

আহ্, অন্যরা চীৎকার করে উঠল। তারা দুই ঠোঁট এক করে দীর্ঘ কামাসক্ত চুম্বনের শব্দ করল। হায়, হায়!

তারা হাসতে হাসতে গলিপথ ধরে নদীর দিকে চলল। কেউ কেউ ঠোঁটে হাত ঠেকিয়ে বাতাসে চুম্বন উড়িয়ে দিল। জুগ্‌গাত্ সিং তাদের কথার জবাব দিল না। সে তাদের কথা শুনতে পায়নি। সে ঘরেই ছিল না।

১.০৩ জুগ্গাত্ সিং

জুগ্গাত্ সিং প্রায় এক ঘণ্টা আগে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। রাতের মাল ট্রেনের শব্দ শুনে তার মনে হয়েছিল এটাই তার জন্য নিরাপদ সময় এবং তখনই সে বেরিয়েছিল। ঐ রাত্রে তার এবং ডাকাতদের জন্য রাতের মাল ট্রেনের আগমন শব্দই ছিল সঙ্কেত ধ্বনি। দূর থেকে ট্রেনের শব্দ শুনেই সে নিঃশব্দে চারপাই থেকে নেমে পড়ল। পাগড়ি তুলে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে নিল। তারপর সে নিঃশব্দে আঙিনা পেরিয়ে খড়ের গাদার কাছে গিয়ে একটা বল্লম হাতে নিল। পা টিপে টিপে সে পুনরায় বিছানার কাছে এসে জুতা পরে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছো?

জুগ্গাত্ সিং দাঁড়ালু। এটা তার মায়ের প্রশ্ন।

মাঠে, সে বলল, কাল রাতে বুনো শুয়োরের ছানারা ক্ষেতের খুব ক্ষতি করেছে।

শুয়োর ছানা! তার মা বলল, চালাকি করার চেষ্টা করো না। তুমি কি ইতিমধ্যে ভুলে বসেছে যে, তুমি পুলিশের নজরবন্দীর মধ্যে আছো—তোমার সন্ধ্যার পর গ্রামের বাইরে যাওয়া নিষেধ। তারপরও হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে একটা বল্লম! শত্রুরা দেখে তোমার কথা বলে দেবে। তারা তোমাকে আবার জেলে পাঠাবে। তখন তোমার ফসল, গরু, ছাগল কে দেখবো?

আমি শিগ্গিত আসব, জুগ্গাত্ সিং বলল, চিন্তার কিছু নেই। গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে আছে।

না, তার মা বলল। সে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

চুপ কর, সে বলল, তুমিই পাড়াপাড়শীদের জাগিয়ে তুলবে। শান্ত হও, কোন অসুবিধা হবে না।

যাও! তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই যাও। কোন কুয়ায় ঝাঁপ দিতে চাইলে ঝাঁপ দাও। তোমার বাপের মত ঝুলে মরতে চাইলে ঝুলে মর। আমার ভাগে আছে শুধু দুঃখ। এটাই আমার কিসমত, কপালে করাঘাত করে সে বলল, এখানে সব কিছু লেখা আছে।

জুগ্গাত্ সিং দরজা খুলে দুই দিকে তাকিয়ে দেখল। না, কেউ কোথাও নেই। দেয়ালের ধার ঘেঁষে সে গলিপথ ধরে এগিয়ে একেবারে পুকুরের ধারে এসে থামল। সে দেখতে পে, দু’টো সাদা হাড়গিলা পাখি কাদায় ব্যাঙ ধরার জন্য এপাশ-ওপাশ করছে। তারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। জুন্নীত সিং তাদের ধরতে আসেনি, এ ব্যাপারে পাখি দু’টো নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে দেয়ালের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে গলিপথ ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। নদীতটের বালি পেরিয়ে সে একবারে স্রোতের কাছে এসে থামল। বল্লমের ধারাল দিকটা ওপরে রেখে সে বল্লমাট পুঁতে দিল। তারপর সে নিজেই বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগল। নীল-কালো আকাশের নিচের ছায়াপথে পেল উল্কার দৃশ্য, যেন একটা রূপালী পথ! হঠাৎ তার চোখের ওপর দুটি হাত এসে থামল।

কে বল?

জুগ্গাত্ সিং তার মাথার ওপর দিয়ে দু’হাত প্রসারিত করে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। মেয়েটি হাত দু’টো সরিয়ে দিল। জুগ্গাত্ সিং এবার চোখের ওপর রাখা হাত থেকে শুরু করে ওপরের দিকে বাহু, কাঁধ এবং তারপর মেয়েটির মুখের ওপর হাত রাখল। সে তার হাতের অতি পরিচিত মেয়েটির চিবুক, চোখ ও নাকে হাত বুলাল আদরের সাথে। সে আঙ্গুল দিয়ে মেয়েটির ঠোঁট দু’টোর ওপর খেলা করতে চাইল, যেন সে আঙ্গুলো চুমো দেয়। মেয়েটি মুখ খুলে তার আঙ্গুল জোরে কামড়ে দিল। জুগ্গাত্ সিং জোর করে হাতটা সরিয়ে নিল। আকস্মিকভাবে সে দু’হাত দিয়ে ময়েটির মাথা জড়িয়ে ধরে জোর করে তার মুখ নিজের মুখের ওপর নিয়ে আসল। তারপর সে তার হাত দু’টো মেয়েটির কোমরের নিচে

নিয়ে গিয়ে তার দেহকে উঁচু করে ধরল। মেয়েটি কাঁকড়ার মত শূন্যে পা লাফাতে লাগল। মেয়েটি হাতে ব্যথা না পাওয়া পর্যন্ত সে তাকে ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করল। তারপর সে একেবারে নিজের দেহের ওপর সমান্তরালভাবে শুইয়ে দিল। দুই দেহ মিলে হয়ে গেল এক।

মেয়েটি তার গালে একটা চড় মারল।

তুমি অন্য একটি মেয়ের গায়ে হাত দিলে? তোমার ঘরে কি মা-বোন নেই? তোমার কি লজ্জা নেই? পুলিশ রেজিস্টারে তোমার নাম লেখা আছে খারাপ চরিত্রের লোক বলে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ইন্সপেক্টর সাহেবকে আমিও বলে দেব যে, তুমি একটা বদমায়েশ।

আমি শুধু তোমার কাছেই বদমায়েশ, নূরু। জেলখানায় একই সেলে আমাদের তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা দরকার।

তুমি বেশি কথা বলতে শিখেছে। আমাকে এখন অন্য লোক দেখতে হবে।

জুগ্‌গাত্ সিং তার দু’টো হাত মেয়েটির পিছনে নিয়ে এমনভাবে চাপ দিল যে, তার বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো। মেয়েটি কোন কথা বলতে গেলেই সে দেয়, ফলে তার কথা গলায় এসে থেমে যায়। সে আর কথা বলার চেষ্টা করল। পরিশ্রান্ত অবস্থায় সে নিজেকে এলিয়ে দিল জুগ্‌গাত্-এর দেহের ওপর। জুগ্‌গাত্ব তাঁকে বাঁদিকে সরিয়ে দিল। মেয়েটির মাথা রইল। তার বাহুর ওপর। ডান হাত দিয়ে সে তার চুল ও মুখে আলতোভাবে বুলাতে লাগল।

মাল ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল দুবার ইঞ্জিনের হুশ হুশ শব্দ শোনা গেল কয়েকবার। এরপর ট্রেনটি চলতে শুরু করল ব্রিজের দিকে। পুকুর থেকে হাড়গিলে পাখিগুলো ‘ক্রাক ক্রাক’ শব্দ করে উড়ে নদীর দিকে গেল। নদীর ওপর এক পাক দিয়ে তারা আবার পুকুরে এসে বসল।

ট্রেনটি ব্রিজ পার হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ ধরে তারা একের পর এক ‘ক্রাক ক্রাক’ শব্দ করতে লাগল। ট্রেনের হুশি হুশ শব্দ এক সময় নিস্তব্ধে মিশে গেল।

জুগ্‌গাত্ সিং-এর আদর ক্রমশ কামুকতায় পরিণত হলো। তার হাত মেয়েটির মুখ থেকে বুক এবং বুক থেকে কোমরে এসে থামল। মেয়েটি তার হাত দু’টো ধরে পুনরায় তার মুখের ওপর নিয়ে ছেড়ে দিল। জুগ্‌গাত্-এর শ্বাস-প্রশ্বাসে কামুকতা ছড়িয়ে পড়ল এবং তা বইতে লাগল ধীরে ধীরে। তার হাত যেন ভুল করে পুনরায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘুরে বেড়াল এবং লক্ষ্যস্থল স্পর্শও করল। মেয়েটি তার হাত ধরে সরিয়ে দিল। জুগ্‌গাত্ সিং তার বাম হাতটি প্রসারিত করে মেয়েটির একটা হাত ধরল। মেয়েটির অন্য হাত আগে থেকেই জুগ্‌গাতের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মেয়েটি হয়ে পড়ল অসহায়।

না! না! না! আমার হাত ছেড়ে দাও! না! আমি তোমার সাথে আর কোনদিন কথা বলব না। জুগ্‌গাত্রে কামাতুর মুখ থেকে বাঁচার জন্য সে তার মাথা জোরে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল।

জুগ্‌গাত্ সিং তার হাতটা ঢুকিয়ে দিল মেয়েটির কামিজের মধ্যে। অনুভব করল অরক্ষিত স্তনের প্রান্তরেখা। এগুলো ছিল সুউচ্চ। স্তনের বোঁটা ছিল শক্ত ও কঠিন। তার কঠিন হাত দু’টো তার স্তন থেকে নাভি পর্যন্ত ওঠানামা করল বার বার। মেয়েটির পেটের ওপরটা রোমাঞ্চে স্ফীত হলো।

না! না! না! দয়া কর। তোমার ওপর আল্লাহ্‌র গজব পড়বে। আমার হাত ছেড়ে দাও। এ রকম আচরণ করলে তোমার সাথে আমি আর কখনও দেখা করব না।

জুগ্‌গাতু সিং-এর অনুসন্ধানী হাত মেয়েটির পাজামার দড়ির একটা কোণা পেল। হ্যাঁচকাটান দিয়ে সে পাজামার দড়ি খুলে ফেলল।

না,–মেয়েটি কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠল।

একটা গুলির শব্দ হল। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ঐ শব্দ মিলিয়ে গেল। হাড়গিলে পাখিগুলো পুকুর থেকে উড়ে ডাকাডাকি শুরু করল। কিকার গাছে কাক ডেকে

উঠল। জুগ্গাত্ সিং একটু থেমে অন্ধকারের মধ্যে গ্রামের দিকে তাকাল। মেয়েটি নিঃশব্দে তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিল। কাকেরা গাছে আবার চুপচাপ করে রইল, হাড়গিলে পাখিগুলো নদীর ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কেবল কুকুরগুলো ডাকাডাকি করতে লাগল।

বন্দুকের গুলির শব্দ মনে হয়, ভয়ে ভয়ে মেয়েটি বলল। জুগ্গাত্ সিং তাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। মেয়েটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, গ্রামের দিক থেকে গুলির শব্দ এলো না?

জানি না। তুমি পালাবার চেষ্টা করছ কেন? এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। জুগ্গাত্ সিং তাকে তার পাশে শুইয়ে দিল।

এখন আনন্দ করার সময় নয়। গ্রামে নিশ্চয়ই কেউ খুন হয়েছে। আমার বাপ জেগে উঠে আমার খোঁজ করবে। আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে।

না, তোমার যাওয়া হবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি বলবে যে, তুমি তোমার এক বান্ধবীর সাথে ছিলে।

চাষার মত কথা বলো না। কি ভাবে... জুগ্গাত্ সিং তার হাত দিয়ে মেয়েটির মুখ চেপে ধরল। সে তার বিরাট দেহটা মেয়েটির দেহের ওপর তুলে দিল। মেয়েটি নিজেকে মুক্ত করার আগেই জুল্লাহু তার পাজামার দড়ি পুনরায় খুলে দিল।

আমাকে যেতে দাও। আমাকে...

জুগ্গাত্ সিং-এর পশু শক্তির বিরুদ্ধে সে লড়তে পারছিল না। সত্যিকারভাবে সেও তা চাচ্ছিল না। তার বিশ্ব সংকীর্ণ হয়ে এলো নিঃশ্বাসের ছন্দময় শব্দের মধ্যে। তার বিষন্ন দেহ উত্তপ্ত হল এবং জুগ্গাতের দৈহিক স্পর্শ ও শরীরের গন্ধ তাকে উতলা করে তুলল। জুগ্গাত্-এর ঠোঁট দু'টো তার চোখ ও চিবুকে আলতোভাবে ঘুরে বেড়াল, জিহ্বা ঢুকে যেতে চাইল তার কানের মধ্যে। নূরানের ধারাল নখ পাগলের মত জুগ্গাতের পাতলা দাঁড়িতে কি যেন খুঁজে ফিরে নাকে গিয়ে আঘাত করল। তার মাথার ওপরে আকাশের তারাগুলো যেন উন্মাদের মত ঘুরপাক খেয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে থেমে গেল নাগরদোলার মত। জীবন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, জীবনের গতি নেমে এলো স্বাভাবিক অবস্থার নীচে। জীবন্মৃত লোকটার দেহভরে সে অনুভব করল, তার চুলের মধ্যে বালি, উলঙ্গ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হল হিমেল হাওয়া। আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা তাদের দিকে তাকিয়ে রইল অপালক দৃষ্টিতে। সে জুগ্গাতুকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল, জুগ্গাত্ তার পাশেই শুয়ে পড়ল।

এটাই তুমি চাও এবং তা তুমি পেয়েও গেলো। তুমি নেহায়েতই একটা চাষা। সব সময় তুমি বীজ বুনতে চাও। সারা দুনিয়া জাহান্নামে গেলেও তোমার এটা চাই। এমনকি গ্রামে গুলি চললেও তোমার এটা চাই। তাই না? নূরান বিরক্তভাবে বলল।

কেউ কোন বন্দুক ছোঁড়েনি। এটা তোমার কল্পনা, ক্লান্তভাবে উত্তর দিল জুগ্গাত্। সে নূরানের দিকে ফিরেও তাকাল না।

নদীতীরে বাতাসে ভেসে আসছিল বিলাপের অস্পষ্ট আওয়াজ। নূরান ও জুগ্গাত্ দু'জনই উঠে বসল এ আওয়াজ স্পষ্টভাবে শোনার জন্য। পর পর দুটি গুলির শব্দ শোনা গেল। কিকার গাছ থেকে কাকেরা উড়ে গেল, তারা ডাকতে লাগল পাগলের মত।

মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল।

গ্রামে কিছু একটা ঘটছে। আমার বাবা জেগে জানতে পারবে যে, আমি বাইরে গিয়েছি। সে আমাকে মেরে ফেলবে।

জুর্গাত্ সিং তার কথা শুনছিল না। সে কি করবে বুঝতে পারল না। সে গ্রামের বাইরে গিয়েছে একথা জানাজানি হলে পুলিশ তাকে বিপদে ফেলবে।-পুলিশের বিপদ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল না। সে ভাবল নূরানের বিপদের কথা। সে আর আসবে না। এমন কথাই সে বলছিল, তোমার সাথে দেখা করতে কখনই আর আসবো না। আল্লাহ্ এবার মাফ করে দিলে আর কখনও এ কাজ করব না।

তুমি কি কথা বন্ধ করবে, না তোমার মুখ ভেঙ্গে দেব?

নূরান কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সে একথা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, এই লোকটিই কয়েক মুহুর্ত আগে তার সাথে যৌন মিলনে রত ছিল।

চুপ কর! কিছু যেন এদিকে আসছে, মেয়েটির মুখে হাত দিয়ে চুপিচুপি বলল জুগ্গাত্। তারা দুজন বালির ওপর শুয়ে অন্ধকারে মাথা উঁচু করে রইল। বন্দুক ও বল্লম হাতে নিয়ে পাঁচ জন লোক তাদের থেকে মাত্রা কয়েক গজ দূর দিয়ে অতিক্রম করল। তারা কথা বলছিল এবং তাদের মুখ ছিল খোলা।

ডাকাত! তুমি তাদের চেনো! চুপি চুপি মেয়েটি বলল।

হ্যাঁ, জুগ্গাত্ বলল। টর্চ হাতে লোকটার নাম মাল্লি। তার মুখমণ্ডলে প্রতিহিংসার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাল্লি ছিল তার বোনের প্রেমিক। আমি তাকে হাজার বার বলেছি, এখন ডাকাতি করার সময় নয়। অথচ সে এসেছে আমার গ্রামে তার দলবল নিয়ে। তার সাথে আমার এ নিয়ে কাল বোঝাপড়া হবে।

ডাকাতরা নদীর ধারে গিয়ে নদীতীর ধরে কয়েক মাইল হেঁটে গেল। এক জোড়া জলচর পাখির ডাকে নীরবতা ভঙ্গ হল নিস্তব্ধ রাতের। তিত্-তিতি-তিতি-উত্, তিতি উত্, তিত্-তি-উত্।

তুমি কি পুলিশের কাছে ওদের কথা বলবে?

জুগ্গাত্ সিং-এর মুখে চাপা হাসি দেখা দিল।

গ্রামের লোক আমাকে অনুপস্থিত দেখার আগেই আমাদের ফেরা উচিত।

জুগ্গাত্ ও নূরান মানো মাজরার দিকে হেঁটে চলল। জুগ্গাত্ আগে, নূরান পিছনে। তারা ক্রন্দনধ্বনি ও কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিল। এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে মেয়েরা জোরে কথা বলছিল। গ্রামের সব লোকই যেন জেগে ছিল। পুকুরের ধারে জুগ্গাত্ দাঁড়াল। পিছন ফিরে সে নূরানকে অনুরোধ করে বলল, নুরু, তুমি কি কাল আসবে?

তুমি আগামীকালের কথা চিন্তা করছ, আর আমি চিন্তা করছি আমার জীবন নিয়ে। আমি খুন হলেও তোমার সুসময় থাকবে।

আমি বেঁচে থাকতে তোমার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। মানো মাজরায় এমন কেউ নেই যে, তোমার দিকে চোখ উঁচু করে তাকাতে পারে। জুর্গার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়ার সাহস কারও নেই। আমি বদমায়েশ নই, বেশ উদ্ভ্রান্তভাবেই বলল জুগ্গাত্। সব ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর কাল বা পরশু রাতের মাল ট্রেন চলে যাওয়ার পর আমাকে সব খুলে বলবে।

না! না! না! উত্তরে মেয়েটি বলল, বাপকে এখন আমি কি বলব? এই গোলমালে নিশ্চয়ই সে জেগে উঠেছে।

এমনি বলবে যে, তুমি বাইরে গিয়েছিলে। তোমার পেট ভাল ছিল না বা এমন ধরনের অজুহাত দেখাবে। তুমি গুলির শব্দে লুকিয়ে ছিলে ডাকাতরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত। পরশু দিন কি আসবে?

না, একই কথা বলল নূরান। তবে এই না বলার মধ্যে দৃঢ়তা ছিল না। এই অজুহাত হয়ত কাজে আসবে। কারণ তার বাপ প্রায় অন্ধ। সে নূরানের সিল্কের কামিজ বা চোখের সুরমা দেখতে পাবে না। অন্ধকারের মধ্যে নূরান এগিয়ে গেল এমন প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর আসবে না।

গলিপথ ধরে জুগ্গাত্ বাড়ীর দিকে গেল। দরজা খোলাই ছিল। আঙিনায় কয়েকজন গ্রামবাসী তার মায়ের সাথে আলাপ করছিল। নিঃশব্দে সে ফিরে এসে পুনরায় নদীতীরে যাওয়ার পথ ধরল।

১.০৪ রেল ব্রিজের উত্তর পাশে

রেল ব্রিজের উত্তর পাশে অফিসারদের একটা রেস্ট হাউস থাকায় প্রশাসনিক দিক থেকে মানো মাজরার কিছুটা গুরুত্ব ছিল। ইটের তৈরী ঘরটার ছাদ সমান্তরাল, নদীর দিকে একটা বারান্দা। চারদিকে প্রাচীর দেয়া জমির মাঝখানে এই রেষ্ট হাউস। মূল গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত ইটের তৈরী একটা রাস্তা৷ রাস্তার দুধারে উঁচু করে কোণাকুণিভাবে ইট বসানো। রাস্তার দুপাশে বাগান। বাগানের মাটি শক্ত, আগাছা বলতে কিছু নেই। ফলে মাটিতে ফাটল ধরার প্রশ্ন নেই এবং মাটি একেবারে সমান। বারান্দার আশেপাশে ও রেষ্ট হাউসের পিছন দিকে সার্ভেন্ট কোয়াটারের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটা জুই ফুলের গাছ। ব্রিজ নির্মাণের সময় রেস্ট হাউসটি বানানো হয়। যে প্রকৌশলী এ ব্রিজের নির্মাণ কাজ দেখাশোনা করতেন, তিনিই ওখানে থাকতেন। ব্রিজ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর রেষ্ট হাউসটি সিনিয়র অফিসারদের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হয়। রেস্ট হাউসটি নদীর তীরে হওয়ার কারণে মোটামুটিভাবে সবার কাছেই আকর্ষণীয় ছিল। এর আশেপাশে আছে অনাবাদী মাঠ, বন-জঙ্গল ও বিভিন্ন ধরনের গাছ। এছাড়াও আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিতির-পাখির ডাক। শীতকালে নদীর পানি কমে গেলে নদীতীরের জলাভূমিতে গজিয়ে ওঠে নল খাগড়ার গাছ। পুকুরটা তখন আলাদা অস্তিত্ব নিয়েই টিকে থাকে। রাজহাঁস, বুনো হাঁস, বালি-হাস এবং এমন ধরনের অনেক জলচর পাখির আগমন ঘটে। এখানে। বড় জলাশয়ে দেখা যায় রুই, মালি ও মাহসি মাছের প্রাচুর্য।

সারা শীতকাল ধরে অফিসাররা তাঁদের ভ্রমণ তালিকা এমনভাবে তৈরি করেন। যেন মানো মাজরার রেক্ট হাউসে সাময়িকভাবে যাত্রাবিরতি করা যায়। সূর্যোদয়ের সময় তাঁরা বেরোন জলচর পাখি শিকারে, দিনে যান তিতির পাখি ধরতে এবং বিকেলে যান মাছ ধরতে। ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার সময় তাঁরা সন্ধ্যার দিকে যান হাঁস শিকার করতে। বসন্তকালে আসেন আবেগপ্রবণ লোকেরা তাঁদের অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে। মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে দেখেন উজ্জ্বল কমলার মত বিনম্র সূর্যটক, উপভোগ করেন নদীর পানিতে ডুবন্ত সূর্যের গাঢ় লাল রঙের আভা। জলাভূমিতে ব্যাঙের ডাক ও চলন্ত ট্রেনের গুড়গুড় শব্দ শুনে তাঁরা সময় কাটান। ব্রিজের খিলানের মধ্য দিয়ে ওপরে চাঁদ ওঠার সময় তাঁরা দেখেন নল খাগড়ার বনে জোনাকি পোকার আলোর ঝালকানি। নিঃসঙ্গতা যাঁদের কাম্য, তাঁরাই কেবল মানো মাজরার রেষ্ট হাউসে আসেন গ্রীষ্মকালে। বর্ষাকাল শুরু হলেই পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তরঙ্গাকারে ফুলেফেপে ওঠা শক্রিয় নদীর প্রবাহিত স্রোতের দৃশ্য যেমন চমৎকার তেমনি তা ভয়াবহ।

মানো মাজরায় ডাকাতি হওয়ার দিন সকালে রেস্ট হাউসকে সজ্জিত করা হল একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে বরণ করার জন্য। সুইপার বাথরুম পরিষ্কার করুল, ঘরের মেঝে মুছল এবং রাস্তায় পানি ছিটিয়ে দিল। বেয়ারা ও তার স্ত্রী আসবাবপত্রের ধুলো মুছে তা সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল। সুইপারের ছেলে ঘরের ভিতর দিককার ছাদের সাথে বাধা হাওয়া পাখার দড়ির ছিড়ে যাওয়া অংশ ঠিক করে তা দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে বাইরে বের করে দিল বারান্দায় বসে পাখা টানার জন্য। নতুন লাল কাপড় পরে সে বারান্দায় বসে দাঁড়িতে গিট দিয়ে মাপ ঠিক করে নিল। বাবুর্চিখানা থেকে হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল মুরগী রান্নার গন্ধ।

বেলা এগারটার দিকে রেস্ট হাউসে সাইকেল চেপে এল একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টর ও দু'জন কনস্টেবল। তাদের উদ্দেশ্য, রেষ্ট হাউসের আয়োজন ঠিকমত হয়েছে কিনা তা দেখা। এরপর এল সাদা ইউনিফরম পরা দু'জন চাপরাশি। তাদের কোমরে লাল ফিতা আর মাথায় সামনের দিকে উপচে পড়া চওড়া ফিতাসহ টুপি। ঐ চওড়া ফিতায় পিন দিয়ে আটকানো পাঞ্জাব সরকারের পিতলের প্রতীকঢেউখেলানো পাঁচটা রেখার ওপর দিয়ে সূর্য উঠছে। এই পাঁচটা রেখা হল পাঞ্জাব প্রদেশের পাঁচটা নদীর প্রতীক। তাদের সাথে এল কয়েকজন গ্রামবাসী। তারা বহন করে আনল বাক্স-পেটরা ও উজ্জ্বল ক্যালো ফাইলে

মোড়া সরকারী চিঠিপত্র।

আরও ঘন্টাখানেক পরে ধূসর রঙের একটা বড় মার্কিন গাড়ী রেস্ট হাউস চত্বরে প্রবেশ করল। চাপরাশি সামনের সীট থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল তার প্রভুর জন্য। সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলরা সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম জানাল। গ্রামবাসীরা দাঁড়িয়ে রইল সম্মানজনক দূরত্বে। চাপরাশি তারের জালিবিশিষ্ট দরজা খুলে দিল। এই দরজা দিয়েই যেতে হয় বসার ও শোয়ার ঘরে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিশনার মি: হুকুম চাঁদ তাঁর মাংসল দেহটা নিয়ে গাড়ী থেকে নামলেন। সারা সকাল ধরে তিনি গাড়ীতেই ভ্রমণ করছিলেন এবং এজন্য তিনি ছিলেন ক্লান্ত ও রুক্ষ। তাঁর দুই ঠোঁটের মাঝে আটকে পড়া সিগারেটের ধোঁয়া তাঁর চোখে গিয়ে ঢুকল। তাঁর ডান হাতে ছিল সিগারেটের টিন ও দেশলাই। তিনি কয়েক কদম এগিয়ে সাব-ইন্সপেক্টরের কাছে গেলেন এবং হৃদ্যতার সাথে তাঁর পিঠ থাপড়ে দিলেন। অন্যরা তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আসুন ইন্সপেক্টর সাহেব, আসুন, বললেন হুকুম চাঁদ। তিনি ইন্সপেক্টরের ডান হাত ধরে একেবারে কামরার মধ্যে নিয়ে গেলেন। চাপরাশি ও ডেপুটি কমিশনারের ব্যক্তিগত কর্মচারীরা তাদের অনুসরণ করল। ড্রাইভার গাড়ী থেকে মালপত্র বের করছিল। কনষ্টেবলরা তাকে সাহায্য করল।

হুকুম চাঁদ সরাসরি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। মুখের ধুলোবালি পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে তিনি বাইরে এলেন। তখনও তিনি তোয়ালে দিয়ে মুখের পানি মোছার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সাব-ইন্সপেক্টর পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন।

বসুন, বসুন, তিনি আদেশ দিলেন।

তিনি বিছানার ওপর তোয়ালে রেখে আরাম কোদারায় বসলেন। পাখা আগে পিছে করতে লাগল। দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে দড়ি টানার ফলে বিরক্তিকর শব্দ হতে লাগল। একজন চাপরাশি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জুতা মোজা খুলে পা টিপতে শুরু করল। হুকুম চাঁদ সিগারেটের টিন খুলে সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সিগারেট ধরিয়ে নিজেরটা ধরালেন। হুকুম চাঁদের সিগারেট টানার পদ্ধতি এমনই যে, তাতে প্রকাশ পায় তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তিনি শব্দ করে সিগারেট টানেন, মুষ্টিবদ্ধ হাতে মুখ দিয়ে তিনি সিগারেট টানেন। তিনি আঙ্গুলো তুড়ি দিয়ে সিগারেটের ছাই ফেলেন। অপরদিকে যুবক সাব-ইন্সপেক্টরের সিগারেট টানার পদ্ধতি ছিল মোটামুটি আধুনিক।

বলুন ইন্সপেক্টর সাহেব, দিনকাল কেমন চলছে?

ইন্সপেক্টর সাহেব দুই হাত নমস্কারের ভঙ্গী করে বললেন, স্রষ্টা দয়ালু। আমরা শুধু আপনার কৃপা প্রার্থনা করি।

এ এলাকায় কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই?

এখনও পর্যন্ত ঐ সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত আছি, স্যার। পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু দল এ পথ দিয়ে গিয়েছে। কিছু মুসলমানও এ পথ দিয়ে ওপারে গিয়েছে। কিন্তু কোন সমস্যার সম্মুখীন আমরা হইনি।

আপনি সীমান্তের এপারে মৃত শিখদের আনতে দেখেননি? তাদের আনা হচ্ছে অমৃতসরে। তাদের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই। ওপারে হত্যা চলছে। হুকুম চাঁদ তাঁর দুই হাত উচু করে জোরে উরুর ওপর ছেড়ে দিলেন হতাশভাবে। সিগারেটের আগুন থেকে একটা টুকরা তাঁর প্যান্টের ওপর পড়ল। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব অতি দ্রুততার সাথে হাত বাড়িয়ে তা নিভিয়ে দিলেন।

আপনি জানেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, শিখরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটা মুসলমান উদ্বাস্তু ট্রেনে আক্রমণ করে। প্রায় এক হাজারের বেশি লোককে হত্যা করে সব মৃতদেহ সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়। তারা ট্রেনের ইঞ্জিনের বগিতে লিখে দেয়,

পাকিস্তানের জন্য উপহার।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব চিন্তান্বিত হয়ে মাথা নত করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তারা বলে যে, সীমান্তের ওপারে হত্যা বন্ধ করার ওটাই একটা পথ। পুরুষের বদলে পুরুষ, মহিলার বদলে মহিলা, শিশুর বদলে শিশু। কিন্তু আমরা হিন্দুরা তাদের মত নই। সত্য সত্যই আমরা এই ছোরা খেলায় মেতে উঠতে পারি না। সামনাসামনি যুদ্ধ হলে আমরা যে কোন লোকের মোকাবিলা করতে পারি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের আর. এস. এস ছেলেরা সব শহরে মুসলমানদের পিটিয়ে দিয়েছে। শিখরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। তারা তাদের সাহস হারিয়ে ফেলেছে। তারা শুধু বড় কথা বলে। আমরা এখানে এই সীমান্তে দেখছি, শিখ অধুষিত গ্রামে মুসলমানরা এমনভাবে বসবাস করছে যেন কিছু হয়নি। মানো মাজরার মত গ্রামে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মোয়াজ্জিন আজান দিচ্ছে। শিখরা এটা করতে দিচ্ছে কেন জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয়, মুসলমানরা তাদের ভাই। আমি নিশ্চিত যে, তারা তাদের কাছ থেকে টাকা পায়।

হুকুম চাঁদ তাঁর প্রশস্ত কপালে হাত দিয়ে মাথার চুলের দিকে নিয়ে গেল। টাক পড়ার জন্য তাঁর কপাল ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে প্রশস্ত।

এ এলাকার কোন মুসলমান কি সচ্ছল আছে?

বেশি নয়। স্যার। তাদের প্রায় সবাই তাঁতী নয়তো কুমোর।

কিন্তু চন্দননগর তো একটা ভাল থানা বলে পরিচিত। এখানে অনেক খুন হয়, অবৈধ চোলাই মদের কারখানা বেশি আর শিখ কৃষকরা বেশ সম্পদশালী। আপনার পূর্বসূরীরা এখানে থেকেই শহরে বাড়ী তৈরি করেছে।

আপনি বোধ হয় স্যার আমার সাথে কৌতুক করছেন।

আপনিও যদি কিছু করেন তাতে আমার মনে করার কিছু নেই। যা পারেন নিয়ে নিন, অবশ্য সীমার মধ্যে। সবাই এ কাজ করছে। শুধু সতর্ক থাকবেন। এ ধরনের সব কিছু নির্মূল করার কথা নতুন সরকার খুব বড় গলায় বলছে। কয়েক মাস পরে তাদের উৎসাহ কমে যাবে এবং সব কিছু আগের মতই চলবে। রাতারাতি সব কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা বৃথা।

তারাই শুধু একথা বলছে না। দিল্লী থেকে যারা আসছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তারা বলবে যে, সব গান্ধীবাদীরা টাকার, পাহাড় গড়ে তুলছে। তারা সব সারস পাখীর মতো সাধু! তারা বকধার্মিকের মত চোখ বন্ধ করে থাকে। আর সাধনায় মগ্ন যোগীর মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে; হাতের কাছে মাছ আসলেই তারা খপ করে ধরে ফেলে।

পা টেপায় রত চাকরকে হুকুম চাঁদ কিছু বিয়ার আনার আদেশ দিলেন। চাকর বাইরে গেলে তিনি তাঁর একটা হাত সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের হাঁটুর ওপর রাখলেন সস্নেহে।

আপনি শিশুর মত হঠকারী কথা বলেন। এ রকম করলে একদিন আপনি বিপদে পড়বেন। আপনার নীতি হবে সব কিছু দেখা এবং কোন কথা না বলা। বিশ্ব খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে। আপনি চাইলেও কারও মতের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারবেন না বা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের সাথে মিলবে না। কোন বিষয়ে আপনি দৃঢ়ভাবে কিছু বিশ্বাস করলেও চুপ থাকার শিক্ষা গ্রহণ করুন।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তিনি কড়া সমালোচনামূলক পিতার মত উপদেশ আরও কামনা করলেন। তিনি জানতেন যে, হুকুম চাঁদ তাঁর সাথে একমত হবেন।

অনেক সময় স্যার, কেউ নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। দিল্লীতে বসে গান্ধী টুপি পরে তারা পাঞ্জাব সম্পর্কে কি জানে? সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানে কি ঘটছে তা তাদের কাছে কোন বিষয়ই নয়। তারা তাদের বাড়ী বা সম্পত্তি হারায় নি, তাদের মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা রাস্তায় ধর্ষিতা হয়নি, খুন হয়নি। শেখুপুরা ও গুজরানওয়ালায় হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুদের ওপর সবার চোখের সামনে মুসলমানরা কি করেছে তা কি আপনি শুনেছেন? ঐ

হত্যাযজ্ঞে পাকিস্তান পুলিশ ও মিলিটারী অংশ নিয়েছে। তাদের কেউ বেঁচে নেই। মহিলারা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করে ঝাঁপ দিয়েছে কুয়ার মধ্যে। কুয়া ভর্তি হয়েছে মৃতদেহে।

হরে রাম, হরে রাম, গভীর দুঃখের সাথে বললেন হুকুম চাঁদ। আমি সব কিছু জানি। হিন্দু মহিলার বৈশিষ্ট্যই ঐ রকম। তারা এমনই পবিত্র যে, পরপুরুষে স্পর্শ করার চেয়ে তারা আত্মহত্যা করাকে শ্রেয় মনে করে। কোন মহিলার ওপর আমরা হিন্দুরা কখনও হাত তুলি না। কিন্তু দুর্বল মহিলাদের প্রতি মুসলমানদের কোন শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের কি করা উচিত? এখানে ঐ রকম ঘটনা শুরু হওয়ার আগে এটা কতদিন চলবে?

মানো মাজরা হয়ে কোন লাশভর্তি ট্রেন আসবে না বলে আমার বিশ্বাস। যদি আসে তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণ ঠেকানো অসম্ভব হবে। আমাদের চারপাশে শত শত ছোট গ্রাম আছে মুসলমানদের। মানো মাজরার মত অনেক শিখপ্রধান গ্রামে বহু মুসলিম পরিবারও আছে, কিছুটা আশার বাণী শুনিয়ে বললেন সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব।

হুকুম চাঁদ বেশ শব্দ করে সিগারেটে টান দিয়ে আঙ্গুলো তুড়ি দিয়ে ছাই ঝাড়লেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, আমাদের অবশ্যই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। সম্ভব হলে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণভাবে চলে যেতে দিন। রক্ত ঝরিয়ে সত্যিকারের কেউ লাভবান হয় না। অসৎ চরিত্রের লোকেরা লুঠতরাজ চালাবে আর সরকার আমাদের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করবে না ইন্সপেক্টর সাহেব, তা হতে পারে না। আমাদের উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা জানেন, সরকারী কর্মকর্তা না হলে এসব পাকিস্তানীদের আমি কি করতাম-আমরা কাউকে হত্যা করতে বা কারও সম্পত্তি ধ্বংস করতে দেব না। তারা চলে যাক। তবে খেয়াল রাখবেন, তারা যেন সাথে বেশি কিছু নিয়ে না যায়। পাকিস্তানের হিন্দুদের চলে আসার অনুমতি দেওয়ার আগে তাদের সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানী ম্যাজিস্ট্রেটরা রাতারাতি কোটিপতি হয়েছে। আমাদের এখানকার কেউ কেউ কিছু করেছে, কিন্তু অতটা করতে পারেনি। যেখানে হত্যা ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে সরকার তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা বদলি করেছে। কোন হত্যাযজ্ঞ নয়। হবে শান্তিপূর্ণ উদ্বাসন।

ভৃত্যটি এক বোতল বিয়ার এনে হুকুম চাঁদ ও সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের সামনে দু’টো গ্লাস রাখল। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব গ্রাসটা হাতে নিয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললেন, না স্যার, আমি শিষ্টাচার লঙঘন করে আপনার সামনে বসে। বিয়ার পান। করতে পারিনে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সরাসরি ঐ প্রতিবাদ নাকচ করে দিয়ে বললেন, আপনাকে আমার সাথে বসে বিয়ার পান করতে হবে। এটা আমার আদেশ। বেয়ারা, ইন্সপেক্টর সাহেবের গ্লাস ভরে দাও। তাঁর জন্য মধ্যাহ্ন ভোজেরও ব্যবস্থা কর।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব তাঁর গ্লাস বেয়ারার দিকে এগিয়ে দিলেন। আপনি আদেশ দিলে আমি অমান্য করতে পারি না। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ি খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। শিখদের পাগড়ি যেমন খোলার পর বাঁধতে হয়, এই পাগড়ি তেমন নয়। এটা হল তিন গজ লম্বা শক্ত খাকি মসলিনের কাপড়ের চারপাশে নীল বেষ্টনীবিশিষ্ট টুপি, যা টুপির মত যখন-তখন পরা ও খোলা যায়।

মানো মাজরার পরিস্থিতি কেমন?

এখনও পর্যন্ত সব ঠিক আছে। গ্রামের মোড়ল নিয়মিত খবর দিচ্ছে। এ গ্রামের মধ্য দিয়ে এখনও কোন উদ্বাস্তু আসেনি। আমি নিশ্চিত, মানো মাজরার কেউ এখনও জানেই না যে বৃটিশরা চলে গেছে এবং দেশটা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে ভাগ হয়ে গেছে। অনেকে গান্ধীর নাম শুনেছে, কিন্তু জিন্নাহর নাম কেউ শুনেছে বলে আমার সন্দেহ আছে।

খুব ভাল। মানো মাজরার ওপর আপনি দৃষ্টি রাখবেন। সীমান্তের কাছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম। এটা ব্রিজেরও খুব কাছে। গ্রামে কোন অসৎ চরিত্রের লোক আছে?

মাত্র একজন স্যার। তার নাম জুগ্গা। আপনি দয়াপরবশ হয়ে তাকে গ্রামেই নজরবন্দী করে রেখেছেন। সে প্রতিদিনই মোড়লের কাছে রিপোর্ট করে এবং সপ্তাহে

একবার থানায় হাজিরা দেয়।

জুগ্গা? সে কে?

আপনার বোধ হয় ডাকাত আলম সিং-এর কথা স্মরণ আছে, দুবছর আগে যার ফাঁসি হয়েছিল। জুগ্গাত্ সিং তারই ছেলে। বেশ লম্বা। এ এলাকায় সে-ই সবার চেয়ে লম্বা। ছ'ফুট চার ইঞ্চি তো হবেই। মোটাও তেমনি। শক্ত সমর্থ ষাঁড়ের মত।

ও হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে। সে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য কিছু করে? প্রতি মাসেই তো সে একটা না একটা মামলায় আমার সামনে হাজির হয়।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব খোলা মনেই হাসলেন। স্যার, পাঞ্জাবের পুলিশ যা করতে পারেনি, ষোল বছরের একটি মেয়ের, দু'টো চোখের যাদুই তা করেছে।

হুকুম চাঁদের উৎসাহ বেড়ে গেল।

তার সাথে কি সম্পর্ক আছে? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, এক মুসলমান তাঁতীর মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক আছে। মেয়েটি কালো, তার চোখ দু'টো অধিক কালো। সে-ই জুগ্গাকে গ্রামে আটকে রেখেছে। ঐ মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো নেই। মেয়েটির অন্ধ পিতা গ্রামের মসজিদের মোল্লা।

বেয়ারা দুপুরের খাবার না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা দুজন বিয়ার পান করলেন এবং সিগারেট জ্বালালেন একটার পর একটা। খাওয়ার পরও তারা দুজনে বিয়ার পান করলেন, সিগারেট ধরালেন এবং জেলার পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন বিকেল পর্যন্ত। বিয়ার ও বেশি খাবার খাওয়ার জন্য হুকুম চাঁদের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। সূর্যের কিরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বারান্দার চিক নীচু করে দেওয়া হয়েছিল। টানা পাখা চলছিল ধীরে ধীরে। হুকুম চাঁদ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর রূপার দাঁত খিচুনি বের করে দাঁতের ফাঁকে ঢোকালেন এবং টেবিলের ওপর পাতা কাপড়ে তা মুছলেন। এত কিছু করেও তিনি ঘুমঘোর থেকে অব্যাহতি পেলেন না। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব লক্ষ্য করলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নাক ডাকছেন। তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

আমাকে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি দিন স্যার।

আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন, পাশেই একটা বিছানা আছে।

আপনি মেহেরবান স্যার। স্টেশনে আমার কিছু কাজ আছে। আমি দুজন কনষ্টেবলকে রেখে যাচ্ছি। আপনি যদি আমার উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে তারা আমাকে ডেকে দেবে।

ঠিক আছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আপনি কি রাতের জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন?

ঐ ব্যাপারটা খেয়ালে না রাখা কি আমার পক্ষে সম্ভব? সে যদি আপনাকে খুশি করতে না পারে তাহলে আপনি আমাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দেবেন। আমি ড্রাইভারকে বলে দেব, কোথায় যেতে হবে এবং কাকে আনতে হবে।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব তাঁকে সালাম জানিয়ে চলে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন এবং দিবানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

১.০৫ গাড়িটা বাংলো ত্যাগ করার সময়

গাড়িটা বাংলো ত্যাগ করার সময় গাড়ির শব্দে হুকুম চাঁদের ঘুম ভাঙলো। বারান্দায় ঝুলানো চিক তখন গুটিয়ে ছাদের কলামের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। চুনকাম করা সাদা বারান্দায় তখন সূর্যাস্তের আলতো আভা মিশে অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। জমাদার ছেলেটা হাতে টানা পাখার দড়ি নিয়ে মেঝের ওপর দলা পাকিয়ে শুয়ে ছিল। তার পিতা বাংলোর চারপাশে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মাটির স্যাঁতসেঁতে গন্ধের সাথে তারের জাল দিয়ে ঘেরা দরজা দিয়ে ভেসে আসছিল জুই ফুলের সুগন্ধ। বাড়ির সামনে ভৃত্যরা পেতে দিয়েছিল একটা বড় মাদুর এবং তার ওপর একটা কার্পেট। কার্পেটের এক পাশে পাতা ছিল একটা বড় বেতের চেয়ার, একটা টেবিলের ওপর এক বোতল হুইস্কি, কয়েকটা মনোরম পানপত্র ও প্লেট। টেবিলের নিচে সারি দিয়ে রাখা ছিল বেশ কয়েকটা সোডা পানির বোতল।

হুকুম চাঁদ ভৃত্যকে ডেকে গোসলের পানি দিতে বললেন এবং দাড়ি কামাবার তাকিয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে। তাঁর মাথার ওপর তখন দু'টো টিকটিকি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাদের মুখ থেকে মৃদু হুংকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। দু'টো প্রাণীর মধ্যে আধা ইঞ্চি ব্যবধান থাকার সময় তারা থেমে গেল, তাদের লেজ নড়তে লাগল। মনে হলো, তারা একে অপরকে ভয় দেখাচ্ছে। এরপর শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধ। হুকুম চাঁদ সরে যাওয়ার আগে তারা পড়ে গেল তার বালিশের ওপর। ধপাস করে একটা শব্দ হলো। তাঁর মনে হলো, তাঁর দেহের ওপর ঠাণ্ডা আঁঠাল কিছু একটা লেগে গেছে। তিনি আঁতকে উঠে শোয়া থেকে বিছানায় বসলেন এবং টিকটিকি দু'টোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। টিকটিকি দু'টো, মনে হলো, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তখনও তারা পরস্পরকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিল, যেন উভয়ে ছিল চুম্বনরত। বেয়ারার পদধ্বনি শোনা গেল। টিকটিকি দু'টোর দিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দিকে টিকটিকি দু'টোর যে সম্মোহনী দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল তা ভেঙে গেল। তারা বিছানা থেকে নেমে এসে দেয়াল বেয়ে আবার উঠে গেল ছাদের নিচের অংশে। হুকুম চাঁদের মনে হলো, তিনি যেন টিকটিকির গায়ে হাত দিয়েছেন। তাঁর হাত দু'টো যেন তারা ময়লা করে দিয়েছে। কিন্তু হাতের ময়লা এমন ছিল না যা মুছে বা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়।

বেয়ারা এক মগ গরম পানি ও সেভিং-এর জিনিসপত্র ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। একটা চেয়ারের ওপর সে রেখে দিল তার প্রভুর কাপড়াচোপড়। একটা পাতলা মসলিনের জামা, এক জোড়া পাজামা। ময়ূরের মতো নীল রংয়ের মধ্যে রূপালী সাদা সূতায় পাকানো পাজামার দড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কালো জুতা জোড়া চকচকে না হওয়া পর্যন্ত সে ব্রাশ করল। পরে জুতা জোড়া সে সযত্নে রেখে দিল চেয়ারের পাশে।

হুকুম চাঁদ শেভ ও গোসল করলেন বেশ যত্ন নিয়ে। গোসলের পর তিনি মুখমণ্ডল ও দুই বাহুতে স্কিন লোশন লাগালেন এবং সুগন্ধি ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে দিলেন দেহের বিভিন্ন অংগে। এ্যাডুকোলন দিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজিয়ে নিলেন। চুলের জন্য ব্যবহৃত তেল জাতীয় প্রসাধনী মাখার ফলে তাঁর চুল ছিল নরম ও ভেজা ভেজা। কিন্তু চুলের গোড়া যে সাদা হয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গত এক পক্ষ কাল তিনি চুলে রং করতে পারেন নি। তিনি তাঁর মোটা গোঁফে হাত বুললেন, পাঁক দিয়ে গোঁফের শেষাংশ সুচাল করে তুললেন। গোঁফের গোড়াও সাদা হয়ে গেছে। তিনি গায়ে চড়ালেন ফিনিফিনে মসলিনের জামা। জামার ওপর দিয়ে আবছা হলেও দেখা যাচ্ছিল দেহের বিভিন্ন অংশ। পাজামা পরার পর ইস্ত্রি করার ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠল কয়েকটি স্থানে। জামার বিভিন্ন অংশে তুলোয় করে তিনি লাগিয়ে দিলেন সুগন্ধি আন্তর। সব কিছু শেষ হলে তিনি দৃষ্টি ফেরালেন। ছাদের নিচের অংশে। দেখলেন, টিকটিকি দু'টোর উজ্জ্বল কালো চোখ আপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মার্কিন দেশে তৈরি গাড়িখানা ফিরে এসে পাড়ি বারান্দায় থামল। হুকুম চাঁদ তারের

জালিবিশিষ্ট দরজার কাছে এসে উকি দিয়ে দেখলেন। তখনও গোঁফে তা দিচ্ছিলেন তিনি। দুজন লোক এবং দুজন মহিলা গাড়ি থেকে নামল। ঐ দুজন লোকের একজনের কাছে ছিল একটা হারমোনিয়াম এবং অন্য জনের কাছে ছিল দু'টো তবলা। দুজন মহিলার মধ্যে একজন বয়স্ক, মাথায় সাদা চুলে কমলা রং মাখানো। অন্য জন যুবতী। মুখে পান। চওড়া নাকের এক পাশে উজ্জ্বল হীরার অলংকার চকচক্ করছে। তার কাছে ছিল একটা পুটুল। আকারে ছোট। সে যখন গাড়ি থেকে নামল তখন পুটুলিটা ঝনঝনি করে বেজে উঠল। তারা সবাই ঘরে গিয়ে কার্পেটের ওপর বসল।

হুকুম চাঁদ আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখলেন। মাথার চুলের গোঁড়ার সাদা অংশ বেশ স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল। আঙ্গুল দিয়ে চুলগুলো তিনি নাড়াচাড়া করলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। এরপর আগের মতোই তিনি সিগারেটের টিনের বাক্সের ওপর দেশলাই বাক্সটি রেখে এক সাথে দু'টোই হাতে নিলেন। তারের জালি দেয়া দরজা অর্ধেক খুলে তিনি বেয়ারাকে হুইস্কি আনার নির্দেশ। দিলেন। হুইস্কির বোতল আগেই টেবিলে রাখা ছিল, এ কথা তিনি জানতেন। তবু বেয়ারাকে তিনি ঐ নির্দেশ দিলেন এ কারণে যে, ঘরে যারা বসে আছে তারা যেন তাঁর আগমন বার্তা পায়। তিনি দরজাটা বন্ধ করলেন একটু শব্দ করেই। ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটার জন্য জুতোর মচমচে শব্দ হলো। তিনি সোজা বেতের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন।

যারা বসে ছিল তারা উঠে দাঁড়াল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে তারা সসম্মানে অভিবাদন জানোল। বাদক দুজন মাথা নত করে তাঁকে সালাম জানোল। দন্তবিহীন মহিলা প্রশংসার বান দুটালো: আপনার যশ-সম্মান বাড়ুক, খোদাবন্দ আপনার জয় হোক। যুবতী মেয়েটি শুধু তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখ দু'টো তার বড়, কাজলমাখা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হাতের ইশারায় তাদের বসতে বললেন। বৃদ্ধা মহিলার একঘেয়েমি চিৎকার স্তিমিত হলো। তারা চারজনেই কার্পেটের ওপর বসে পড়ল।

বেয়ারা তার প্রভুর গ্লাসে মদ ও সোডা ঢেলে দিল। হুকুম চাঁদ একটা বড় ব্লকমের হাই তুলে হাতের পিছন দিক দিয়ে মুখগহ্বর থেকে গোঁফ সরিয়ে দিলেন। অলস মেজাজে তিনি গোঁফে তা দিতে লাগলেন। মেয়েটি তার পুটুলি খুলে পায়ে ঘুঙুর বাধল। হারমোনিয়াম বাদক তার হারমোনিয়ামে একটা সুর তুলল। তবলা বাদক তবলার উপরিভাগের চারপাশে চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা গিরে ঢ়িলে বা শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করল ছোট হাতুড়ির আঘাত দিয়ে। হারমোনিয়ামের সুরের সাথে তবলার শব্দ মধুময় না হওয়া পর্যন্ত সে তবলার উপরিভাগের সাদা অংশে আঙ্গুল দিয়ে চাটি মারুল। এভাবেই শেষ হল তাদের প্রস্তুতি।

যুবতী মেয়েটি মুখ থেকে পানের পিক্ ফেলে দিল, খুব খুকু করে কেশে কফি ফেলে গলা পরিষ্কার করে নিল। বৃদ্ধ মহিলাটি বলল:

খোদাবন্দ। আপনি কি শুনতে ভালবাসেন? পুরোনো গান, পুকক্কা না ফ্লিমের গান?

না, পুকক্কা না। কিছু সিনেমার গান শোনাও, ভাল সিনেমার গান, বিশেষ করে পাঞ্জাবী গান।

যুবতী মেয়েটি সালাম করল। বলল, আপনি যা হুকুম করেন।

যন্ত্রী দুজন নিকটবর্তী হয়ে কি যেন বলাবলি করল। অতঃপর তারা মেয়েটির সাথে সামান্য কথা বলে বাজনা শুরু করল। তবলা ও হারমোনিয়াম এক সাথে বেজে ওঠার পরও মেয়েটিকে নীরবে কিছুটা অস্বস্তি ও উদাসভাবে বসে থাকতে দেখা গেল। তাদের প্রাথমিক বাজনা শেষ হলে মেয়েটি তার নাক ঝাড়ল এবং পুনরায় গলা পরিষ্কার করে নিল। সে তার বাম হাত কানের কাছে রেখে অন্য হাতটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দিকে প্রসারিত করে তাকেই লক্ষ্য করে কৃত্রিম চড়া স্বরে গাইল:

ওহে আমার প্রিয়, যে চলে গেছে
আমি বেঁচে আছি, কিন্তু মরে যাওয়াই ভাল ছিল।
ঝরা আশ্রুজল আমি দেখি না।

আমি শ্বাস নেইনা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি।
আলোর শিখাকে পোকা ভালবাসে
সেই শিখাই তার মৃত্যুর কারণ হয়
আমি আমার মাঝে অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছি
সেই শিখা আমার শ্বাস হরণ করেছে
রাত কাটাই আমি আকাশের তারা গুণে।
দিন কটাই সুদিনের স্বপ্ন দেখে।
তুমি কখন ফিরে আসবে
আমি দেখব আবার
তোমার সেই চাঁদ মুখখানি।

মেয়েটি থামল। বাদকরা এমনভাবে বাজনা বাজাল যেন মেয়েটি তার গানের শেষাংশ শুরু করতে পারে।

এই পত্রের কথা আমার প্রিয়াকে জানাবে
পৃথক থাকার জ্বালা কিভাবে পোড়ায়।

মেয়েটির গান শেষ হলে হুকুম চাঁদ পাঁচ টাকার একটি নোট কার্পেটের ওপর জুড়ে দিলেন। মেয়েটি ও দুই যন্ত্রী তাদের মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা জানাল। বৃদ্ধা মহিলাটি টাকাটা তুলে নিয়ে বলল, খোদাবন্দ, আপনার জয় হোক।

আবার গান শুরু হলো। হুকুম চাঁদ এবার নিজেই এক পেগ মদ ঢেলে এক ঢোকে গিলে ফেললেন। হাত দিয়ে মুখ থেকে গোঁফ সরিয়ে দিলেন। মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকানোর অবস্থা তাঁর ছিল না। মেয়েটি যে গানটি গাচ্ছিল, তা হুকুম চাঁদের কাছে খুবই পরিচিত মনে হলো। ঐ গানটি তিনি তাঁর মেয়েকে গাইতে শুনেছেন।

মৃদুমন্দ বায়ুতে
আমার মসলিনের
লাল উড়নাখানি উড়ছে।
হো স্যার, হো স্যার।

হুকুম চাঁদ অস্বস্তি বোধ করলেন। তিনি আর এক পেগী হুইস্কি পান করে বিবেকের তাড়না থেকে মুক্তি পেতে চাইলেন। মানুষের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। এর মধ্যে অত বিবেকের তাড়না না থাকাই ভাল। তিনি হো স্যার, হো স্যার কথার তালে তালে আঙ্গুলো তুড়ি এবং উরুর ওপর চাপড় দিতে শুরু করলেন।

গোধূলির রক্তিম আভা মিলিয়ে যাওয়ার পর চন্দ্রবিহীন রাতের অন্ধকার বিস্তৃত হলো চারদিকে। নদীর ধারের জলাভূমিতে ব্যাঙ ডেকে উঠল। নল খাগড়ার বনে কিচমিচ করে উঠল পতঙ্গের দল। বেয়ারা স্ফটিকাবৎ একটা বাতি নিয়ে এল। ঐ বাতি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল নীলাভ আলো। বাতির ফ্রেমের মধ্য থেকে আবছা! আলো হুকুম চাঁদ-এর গায়ে গিয়ে পড়ল। আলো থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় রত মেয়েটির দিকে তিনি অপালক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটি নেহায়েত শিশু এবং খুব বেশি সুন্দরীও নয়। তবে সে যুবতী ও মাসুম। তার স্তন দু'টোও খুব স্ফীত হয়নি। ঐ স্তনে এখনও কোন পুরুষের হাত পড়েনি বলেই মনে হয়। মেয়েটি বোধ হয় তাঁর নিজের মেয়ের চেয়েও বয়সে ছোট। এই ধারণা তাঁর মনে উদয় হতেই হুকুম চাঁদ আর এক পেগ হুইস্কি ঢেলে নিলেন। এটাই জীবন। জীবনকে গ্রহণ করে নাও যখন যেভাবে আসে, অসঙ্গত প্রথা ও মূল্যবোধকে দূরে রেখে মৌখিক ভদ্রতাকে স্বাগত জানাও। মেয়েটি হুকুম চাঁদ-এর টাকা চায় আর হুকুম চাঁদ চায়... ব্যস। সব কিছুই যখন বলা হয়েছে যে, মেয়েটি পতিতা এবং সেইভাবে তাকে দেখা হয়েছে। ফলে মূল্যবোধ অবাস্তর। মেয়েটির কালো রঙের শাড়ির পাড়ের রূপালী পাতা ঝলমল করে উঠল। নাকে লাগানো হীরা তারার মতো চিকচিক করে উঠল। সব সন্দেহ দূর করার জন্য হুকুম চাঁদ আর এক চুমুক মদ গলায় ঢেলে দিলেন। এ সময় হুকুম চাঁদ তাঁর গোঁফ মুছে

নিলেন সিল্কের রুমাল দিয়ে। তিনি বেশ জোরেই অফুট শব্দ করতে শুরু করলেন এবং কটা কট করে হাতের আঙ্গুল ফোটালেন।

হুকুম চাঁদ যেসব সিনেমার গান জানতেন তার সবই গাওয়া শেষ হলো।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার স্বরে হুকুম চাঁদ হুকুম করলেন, তুমি যা জান তাই গাও, নতুন ও আনন্দঘন গান।

মেয়েটি এমন একটা গান শুরু করল। যার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ছিল একাধিক :

সানডে আফটার সানডে,
এই আমার জীবন।

হুকুম চাঁদ উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে প্রশংসাসূচক ধ্বনি বাহ বাহ বেরিয়ে এল। মেয়েটি তার গান শেষ করলে তিনি তার দিকে পাঁচ টাকার নোট জুড়ে দিলেন না। তাকে তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে টাকা নিতে বললেন। বৃদ্ধা মহিলাটি তাকে তাঁর কাছে যেতে বলল, যাও, হুজুর তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল এবং টেবিলের কাছে গেল। টাকার নোটটি নেয়ার জন্য সে হাত বাড়োল; হুকুম চাঁদ তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন এবং নোটখানা তাঁর বুকের মধ্যে রাখলেন। তিনি দাঁত বের করে হাসলেন কামাসক্তভাবে। মেয়েটি তার সাথীদের দিকে তাকাল সাহায্যের আশায়। হুকুম চাঁদ এবার নোটটা রাখলেন টেবিলের ওপর। মেয়েটি তা নেয়ার আগেই তিনি তা তুলে নিয়ে পুনরায় বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর ব্যাপক কামাসক্ত হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। মেয়েটি তার সাথীদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। হুকুম চাঁদ তৃতীয় বারের মতো নোটটি তুলে ধরলেন।

হুজুরের কাছে যাও, বৃদ্ধা মহিলাটি অনুরোধ করল। মেয়েটি আজ্ঞাবাহের মতো ঘুরে দাঁড়াল এবং ধীর পদক্ষেপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গেল। হুকুম চাঁদ তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন: তুমি গাও ভাল।

মেয়েটি তার সাথীদের দিকে বিস্ময়ে তাকাল।

হুজুর তোমার সাথে কথা বলছেন, তুমি তাঁর কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? বৃদ্ধা মহিলাটি তাকে গালাগাল করল। হুকুম চাঁদকে সে ব্যাখ্যা করে বলল, খোদাবন্দ, মেয়েটির বয়স কম এবং খুব লাজুক। আস্তে আস্তে সে সব কিছু শিখে যাবে।

হুকুম চাঁদ মেয়েটির ওষ্ঠে হুইস্কি ভরা গ্লাসটি ধরে অনুনয় করে বললেন, সামান্য একটু পান কর। আমার খাতিরে মাত্র একবার খাও।

মুখ না খুলেই মেয়েটি উদাসীনভাবে উঠে দাঁড়াল।

বৃদ্ধা মহিলাটি অনুনয় করে বলল খোদাবন্দ, মদ পান সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তার বয়স ষোল হবে না এবং সে একেবারেই সরল। এর আগে সে কোনদিন কোন পুরুষের কাছে যায়নি। আমি আপনার সম্মানেই তাকে যোগাড় করে এনেছি।

হুজুম চাঁদ বললেন, সে যদি মদ পান না করে তাহলে অন্য কিছু খাবে। তিনি বৃদ্ধা মহিলার কথার শেষাংশ উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলেন। তিনি প্লেট থেকে একটা গোসতের টুকরা তুলে নিয়ে তার মুখে পুরে দেয়ার চেষ্টা করলেন। মেয়েটি টুকরাটি হাতে নিয়ে নিজেই খেয়ে নিল।

হুকুম চাঁদ মেয়েটিকে টেনে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে তার চুল নাড়াচাড়া করতে লাগলো। মেয়েটির চুল ছিল তৈলাক্ত এবং ক্লিপ দিয়ে বাঁধা। তিনি কয়েকটা ক্লিপ খুলে মেয়েটির চুলের বাঁধন খুলে দিলেন। খোলা চুল মেয়েটির ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

বৃদ্ধা মহিলা ও বাদ্যযন্ত্রীরা উঠে দাঁড়াল।

দয়া করে আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিন।

হ্যাঁ, যাও। ড্রাইভার তোমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবে।

বৃদ্ধা মহিলাটি আবার একঘেয়েমি চিৎকার শুরু করে দিল খোদাবন্দ, আপনার জয় হোক। আপনার বিচার প্রতিভার সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র।

হুকুম চাঁদ এক তোড়া টাকার নোট টেবিলের ওপর রাখলেন বৃদ্ধা মহিলার জন্য। টাকা নিয়ে তারা গাড়িতে গিয়ে উঠল। মেয়েটি বসে রইল ম্যাজিস্ট্রেটের কোলের ওপর। বেয়ারাটি অপেক্ষা করে রইল। পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়।

রাতের খাবার দেব, স্যার। বেয়ারা জিজ্ঞাসা করল।

না। টেবিলের ওপর খাবার রেখে যাও। আমরা খেয়ে নেব। তুমি যাও।

বেয়ারাটি টেবিলের ওপর খাবার রেখে নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল।

হুকুম চাঁদ হাত বাড়িয়ে স্ফটিকবৎ ল্যাম্পটি নিভিয়ে দিলেন। একটা শব্দ করে ল্যাম্পটি নিভে গেল। ঘরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলেও দরজার ফাঁক দিয়ে আসা শোয়ার ঘরের জ্বলন্ত বাতির কিছুটা আভা দেখা যাচ্ছিল। হুকুম চাঁদ দরজার বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মালগাড়িটা তখন মানো মাজরায় ওয়াগন রেখে চলে যাচ্ছিল ব্রিজের দিকে। বেশ শব্দ করেই ওটা এগুচ্ছল। ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ দেখে গাড়ির গতিবেগ আন্দাজ করা যাচ্ছিল। গাড়ির লোকেরা অগ্নিকুণ্ডে কয়লা ভরছিল। উজ্জ্বল লাল ও হলুদ আলো ব্রিজের খিলানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রিজের অপর পারের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। ট্রেনের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ট্রেনটি চলে যাওয়ার পর ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার পরিবেশ অনুভূত হলো।

হুকুম চাঁদ আর এক পেগ হুইস্কি ঢেলে নিয়ে নিজেকে যেন সংহত করলেন। মেয়েটি তখনও তার কোলে বসেছিল শক্ত ও অনড় হয়ে।

তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ? তুমি কি আমার সাথে কথা বলবে না? মেয়েটিকে আরও নিজের দিকে টেনে এনে হুকুম চাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন। মেয়েটি সে কথার জবাব দিল না বা তাঁর দিকে ফিরেও তাকাল না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মেয়েটির প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। সব কিছুর জন্য তিনি আগেই টাকা দিয়েছেন। তিনি মেয়েটির মুখটা নিজের দিকে টেনে তার গলা ও কানে চুম্বন দিলেন। তিনি মালগাড়ির শব্দ আর শুনতে পাচ্ছিলেন না। মালগাড়িটা তখন নির্জন প্রত্যন্ত এলাকায় চলে গিয়েছিল। হুকুম চাঁদ তাঁর নিজের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দই শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি মেয়েটির অন্তর্বাসের হুক খুলে দিলেন।

রাতের নিস্তব্ধতা একটা গুলির শব্দে প্রকম্পিত হলো। মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা গুলির শব্দ শুনেছ?

মেয়েটি মাথা নাড়াল। হতে পারে একজন শিকারী। মেয়েটি জবাব দিল। এই প্রথম সে হুকুম চাঁদের সাথে কথা বলল। ইতিমধ্যে সে অন্তর্বাসের হুক লাগিয়ে দিল।

এই অন্ধকার রাতে কোন শিকারী হতে পারে না।

দুজন কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। হুকুম চাঁদের মনে কিছু একটা আশঙ্কা ছিল; মেয়েটা মুক্ত হলো মদ, তামাক ও মুখে দুর্গন্ধভরা প্রেমিকের বন্ধন থেকে। কিন্তু এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা হুকুম চাঁদকে নিশ্চিন্ত করল যে, সব কিছু ঠিক আছে। এই নিশ্চিন্ততাকে আরও নিশ্চিত করার জন্য তিনি আর এক পেগী হুইস্কি নিলেন। মেয়েটি অনুধাবন করল যে, তার পলায়নের কোন পথ নেই।

এটা নিশ্চয় পটকার আওয়াজ। কেউ হয়ত বিয়ে করতে যাচ্ছে বা অন্য কিছু, হুকুম চাঁদ মেয়েটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তার নাকে চুমু খেলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, চল আমরাও বিয়ে করি।

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। সিগারেটের ছাই, গোশতের টুকরা ও প্লেট ভর্তি টেবিলের ওপর হুকুম চাঁদ যখন তাকে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখনও সে কোন বাধা দিল না। হুকুম চাঁদ হাত দিয়ে টেবিলের ওপর সব কিছু ঠেলে ফেলে দিলেন এবং শুরু করলেন আদিম মিলনের প্রক্রিয়া। দুই হাতে তিনি চেপে ধরলেন মেয়েটির প্রস্ফুটিত যৌবন। তাঁর

আদিম থাবায় মেয়েটি ক্ষত-বিক্ষত হলেও কোন বাধা দিল না। তিনি মেয়েটিকে টেবিলের ওপর থেকে নামিয়ে কার্পেটের ওপর শুইয়ে দিলেন। মেয়েটি তার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে নিল এবং মুখটা এক পাশে সরিয়ে নিল হুকুম চাঁদ-এর মুখের দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য।

হুকুম চাঁদ শুরু করলেন মেয়েটির বিন্যস্ত পোশাক অবিন্যস্ত করতে।

মানো মাজরা থেকে মানুষের চিৎকার ও উত্তেজিত কুকুরের ডাক শোনা গেল। হুকুম চাঁদ শব্দ লক্ষ্য করে কান পেতে রইলেন। আবার দু'টো গুলির শব্দ হল এবং সাথে সাথেই থেমে গেল মানুষের চিৎকার আর কুকুরের ডাক। ধুৎতরি ধরনের শব্দ উচ্চারণ করে হুকুম চাঁদ মেয়েটিকে ছেড়ে দিলেন। মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে তার চুল আঁচড়ালো, পোশাক ঠিক করল। সার্ভেন্ট কোয়ার্টার থেকে বেয়ারা ও জমাদার হারিকেন নিয়ে ছুটে এল। তাদের আলোচনায় উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছিল। একটু পরে ড্রাইভার গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থামাল। গাড়ির হেড লাইটে বাংলো আলোকিত হলো।

১.০৬ যে রাতে ডাকাতি হলো

যে রাতে ডাকাতি হলো, তার পরদিন সকালে রেল স্টেশনে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিমাত্রায় ভিড় পরিলক্ষিত হলো। দিল্লী থেকে লাহোরগামী সকল সাড়ে দশটার লোকাল ট্রেনটি দেখতে স্টেশনে আসা মানো মাজরাবাসীদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এই ছোট স্টেশনে ঐ ট্রেন থেকে যাত্রীদের ওঠা-নামা, ট্রেনটি দেরী হওয়ার কারণ নিয়ে যাত্রীদের তর্ক-বিতর্ক এবং কবে ঐ ট্রেনটি সময়মতো পৌঁছেছে, তা নিয়ে সরস আলোচনা তারা উপভোগ করত। দেশ বিভাগের পর তাদের একটা বাড়তি আকর্ষণও ছিল। ট্রেনটি এখন প্রায়ই চার/পাঁচ ঘন্টা দেরীতে আসে, অনেক সময় বিশ ঘণ্টা দেরীতে।

ঐ ট্রেনটি যখন পাকিস্তান থেকে আসে তখন ঐ ট্রেনে আসে শিখ ও হিন্দু উদ্বাস্তু। আবার যখন হিন্দুস্থান থেকে আসে তখন আসে মুসলমান উদ্বাস্তু। ট্রেনে এত ভিড় থাকে যে, তাদেরকে ছাদের ওপর বাদুড় ঝোলা অবস্থায় অথবা দুই বগির মাঝে দেখা যায় বিপজ্জনক অবস্থায়।

এদিন সকালে ট্রেনটি ছিল মাত্র এক ঘণ্টা লেট-প্রায় বিভাগ-পূর্ব সময়ের মতো। ট্রেনটি যখন ষ্টেশনে এসে থামল, তখন প্লাটফরমে হকারদের চিৎকার, যাত্রীদের ছোটাছুটি এবং একে অপরকে চিৎকার করে ডাকাডাকিতে মনে হলো যে, স্টেশনে অনেক যাত্রীই অবতরণ করবে। কিন্তু গার্ড যখন ট্রেন চলার হুইসেল দিল তখন দেখা গেল অধিকাংশ যাত্রীই ট্রেনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। শুধু একটা শিখ কৃষক পরিবারকে দেখা গেল প্লাটফরমে হকারদের মাঝে। লোকটির হাতে একটা বাঁকানো লাঠি, তার স্ত্রী এবং স্ত্রীর কোলে ছোট একটা শিশু। লোকটি তাদের গোলাকার বিছানাপত্র মাথায় নিয়ে এক হাত দিয়ে ধরে রাখল এবং অন্য হাতে নিল মাখনের একটা বড় টিন। লাঠিখানা সে বুলিয়ে নিল তার ঘাড়ে। টিকিট দু'টো সে মুখে করেই নিল। মহিলাটি ষ্টেশনের রেলিং-এর বাইরে দাঁড়ানো অসংখ্য লোকের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ঘোমটা দিল। সে তার স্বামীকে অনুসরণ করল। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে চলার সময় তার স্যান্ডেলের এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পরিহিত রূপার অলঙ্কারের ঝনঝনানি শব্দ হলো। স্টেশন মাস্টার লোকটির মুখ থেকে টিকিট নিয়ে শিখ দম্পতিকে গেটের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। গেটের বাইরে তাদের অনেকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে এবং তার হারিয়ে গেল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ অভিবাদনের মধ্যে।

গার্ড দ্বিতীয়বার হুইসেল দিলেন এবং সবুজ ফ্লাগ উত্তোলন করলেন। ঠিক সেই সময় ইঞ্জিনের পাশের বগি থেকে কয়েকজন বন্দুক ধারী পুলিশ নামল। তারা সংখ্যায় বারোজন এবং একজন সাব-ইন্সপেক্টর। তাদের হাতে রাইফেল এবং কোমরের বেল্টে গুলি। দুজনের কাছে হাতকড়া ও শিকল। ট্রেনের শেষ দিকে গার্ডের কামরার কাছের বগি থেকে নেমে এলেন আর একজন লোক। লোকটি যুবক। তাঁর গায়ে লম্বা সাদা সার্ট, বাদামী রংয়ের মোটা সুতোর ওয়েষ্টকোট এবং চিলেঢালা পাজামা। তাঁর কাছে ছিল একটা হোল্ডঅল। ট্রেন থেকে তিনি বেশ সাবধানেই নামলেন, মাথার এলোমেলো চুল হাত দিয়ে ঠিক করে নিলেন এবং প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর দেহের গঠন পাতলা এবং মুখাবয়ব অনেকটা মেয়েলী ধরনের। পুলিশ দেখে তিনি যেন সাহস ফিরে পেলেন। হোল্ডঅলটা বাম ঘাড়ের ওপর রেখে তিনি বেশ খুশি মনেই স্ট্রেশন থেকে বোরোনোর পথ ধরলেন। গ্রামবাসীরা এই যুবক লোকটিকে বেশ ভাল করেই দেখল। পুলিশের দলটি অপর দিক থেকে গেটের দিকে এগিয়ে এল। ষ্টেশন মাষ্টার গেটের কাছেই ছিলেন। তিনি গেটের দরজা খুলে দিলেন পুলিশদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। সাব-ইন্সপেক্টরকে দেখে তিনি বিনীতভাবে মাথা নোয়ালেন। যুবক ভদ্রলোক গেটের কাছে আগেই পৌঁছেছিলেন। তিনি পড়ে গেলেন পুলিশ ও স্টেশন মাস্টারের মাঝামাঝি স্থানে। স্টেশন মাস্টার তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ থেকে টিকিট নিলেন। কিন্তু যুবকটি গেট পার হওয়ার তাড়া দেখালেন না বা সাব-ইন্সপেক্টরের যাওয়ার জন্যও পথ ছেড়ে দিলেন না।

ষ্টেশন মাস্টার সাহেব, এ গ্রামে থাকার মতো কোন জায়গা আছে কিনা বলতে

পারেন?

ষ্টেশন মাস্টার কিছুটা বিরক্ত হলেন। কিন্তু লোকটার শুদ্ধ উচ্চারণ, তাঁর চেহারা, পোশাক ও হোল্ডঅল দেখে তিনি রাগ চেপে রাখলেন।

সহাস্য ব্যঙ্গোক্তি করে স্টেশন মাস্টার জবাব দিলান, ‘মানো মাজরায় কোন হোটেল বা সরাইখানা নেই। গ্রামের মধ্যে মাত্র একটা শিখ গুরুদুয়ারা আছে। গ্রামের মাঝখানে ঐ গুরুদুয়ারায় আপনি দেখতে পাবেন হলুদ পতাকা উড়ছে।

ধন্যবাদ।

স্টেশন মাস্টার ও পুলিশ সদস্যরা ঐ যুবককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলেন। এই এলাকায় বেশি লোক ধন্যবাদ বলে না। যাঁরা ধন্যবাদ বলেন তাঁদের অধিকাংশই বিদেশে লেখাপড়া করা লোক। ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করা অনেক বিত্তবান যুবকের কথা তাঁরা শুনেছেন, যাঁরা কৃষকের পোশাক পরিধান করে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তাঁদের অনেকে আবার কমিউনিস্টদের এজেন্ট বলে পরিচিত। তাঁদের অনেকে কোটিপতির ছেলে, অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার ছেলে। এদের সবাই গোলমালের তালে থাকে এবং তারা গোলমাল বাধাতেও সক্ষম। এ কারণে সতর্ক থাকাই ভাল।

যুবক লোকটি স্টেশন থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথ ধরলেন। যেখানে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল তার কয়েক গজ, সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি জেনেশুনে বেশ সোজা হয়েই হাঁটলেন। তিনি যে গুলিশের সতর্ক দৃষ্টিতে এসেছেন। একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর দিকে তাদের প্রখর দৃষ্টি তাঁকে বুঝিয়ে দিল যে, তারা তাঁকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করছে। তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকালেন না। একজন সৈনিকের মতোই তিনি তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন। অদূরেই দেখা গেল একটা সাধারণ কুটির, তার ওপরে হলুদ রংয়ের ত্রিকোণা পতাকা পৎ পৎ করে উড়ছে। পতাকায় ছিল কালো রংয়ে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতীক–একটা পোলাকার চক্রের মাঝে ছোরা এবং তার নিচে আড়াআড়িভাবে দু’টো তলোয়ার। তিনি ধূলিময় পথ দিয়ে এগিয়ে চললেন। পথের দুধারে বেড়া দেয়া। এই পথ থেকেই একটা গলি পথ বেরিয়ে গেছে মন্দির, মসজিদ ও মহাজনের বাড়ির কাছে। পিপুল গাছের নিচে-কাঠের বেঞ্চিতে বসে জনা বারো লোক গল্প করছিল। পুলিশ দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। তারা দেখল, পুলিশ রামলালের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আগন্তুক লোকটির দিকে তারা খেয়ালই করল না।

মন্দিরের বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ দ্বারের বিপরীত দিকে একটা বড় রকমের হল ঘর। ঐ ঘরেই আছে রুচিহীন জমকালে সিঙ্কের কাপড় দিয়ে মোড়ানো ধর্মগ্রন্থ। হলঘরের এক পাশে দু’টো কামরা। দেয়াল ঘেঁষে একটা সিঁড়ি দিয়ে ঐ কামরার ছাদে যাওয়া যায়। মন্দির বারান্দার ধারে একটা পাতকুয়া, চতুর্দিকে বুক সমান উঁচু দেয়াল দেয়া। এই পাতকুয়ার সাথেই আছে চার ফুট উঁচু একটা ইটের স্তম্ভ। হলুদ রংয়ের পতাকা দণ্ডটি এই স্তল্পের সাথেই বাঁধা।

যুবক লোকটি কাউকে দেখতে পেলেন না। তবে তিনি ধারে কাছে কাপড় কাচার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বেশ ভয়ে ভায়ে কুয়ার অপর পাশে গেলেন। তাঁকে দেখে একজন বৃদ্ধ শিখ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর লম্বা দাড়ি এবং পরিধেয় সাদা কাপড় থেকে টপ টপ করে পানি ঝরেছিল।

শুভ দিন।

শুভ দিন।

আমি কি এখানে দুতিন দিন থাকতে পারি?

এটা গুরুদুয়ারা-গুরুর ঘর। যে কেউ এখানে থাকতে পারে। কিন্তু আপনাকে মাথার ওপর কাপড় দিতে হবে এবং সাথে তামাক বা সিগারেট আনতে পারবেন না। বা ধূমপান করতে পারবেন না।

আমি ধূমপান করি না, যুবক বললেন। এরপর তিনি তাঁর হোল্ডঅলটি মাটিতে রেখে

মাথার ওপর একটা রুমাল ছড়িয়ে দিলেন।

না, বাবু সাহেব, এখন নয়। আপনি যখন ধর্মগ্রন্থের কাছে যাবেন তখনই কেবল জুতো খুলে এবং মাথায় কাপড় দিয়ে যেতে হবে। আপনার জিনিসপত্র ঐ ঘরে রেখে বিশ্রাম করুন। আপনার কাছে খাওয়ার কিছু আছে?

ধন্যবাদ। আমার খাবার আমি সাথে করে এনেছি।

বৃদ্ধ লোকটি আগন্তুককে খালি কামরা দেখিয়ে দিয়ে কুয়ার ধারে চলে গেলেন। যুবক লোকটি কামরার মধ্যে গিয়ে দেখলেন, ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে আছে একটি মাত্র খাটিয়া। এক পাশের দেয়ালে টাঙানো আছে একটা বড় রঙিন ক্যালেন্ডার। ঘোড়ার পিঠে বসা লাগাম হাতে গুরুর একটা ছবি আছে। ঐ ক্যালেন্ডারে। ক্যালেন্ডারের আশপাশে দেয়ালে পেরেক পোতা আছে কাপড় ঝোলানোর জন্য।

আগন্তুক তাঁর হোল্ডঅল খালি করলেন। তিনি তাঁর বাতাস দিয়ে ফোলানো গদি বের করে তা ফুলিয়ে চারপাই-এর ওপর বিছিয়ে দিলেন। পাজামা ও সিল্কের গাউন বের করে ঐ গাদির ওপর রাখলেন। সামুদ্রিক মাছের টিন, অস্ট্রেলিয়ান মাখনের টিন এবং এক প্যাকেট শুকনা বিস্কুট তিনি বের করলেন। তিনি তাঁর পানির বোতল নাড়িয়ে দেখলেন। না, বোতলে পানি নেই।

বৃদ্ধ শিখ তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁর লম্বা দাড়ি হাতের আঙ্গুল দিয়েই আঁচড়াচ্ছিলেন।

আপনার নাম কি? তিনি চৌকাঠের ওপর বসে জিজ্ঞাসা করলেন।

ইকবাল। আপনার নাম কি?

ইকবাল সিং? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধ লোকটি উচ্চারণ করলেন নামটি। উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি বলতে শুরু করলেন, আমি এই মন্দিরের ভাই। ভাই মিত সং। ইকবাল সিংজি, মানো মাজরায় আপনার কোন কাজ আছে?

যুবক লোকটি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, বৃদ্ধ লোকটি তাঁর প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। তাকে আর বলতে হলো না যে, তিনি ইকবাল সিং না অন্য কিছু। তিনি মুসলমানও হতে পারেন, যেমন ইকবাল মোহাম্মদ। তিনি হিন্দু হতে পারেন, যেমন ইকবাল চাঁদ অথবা শিখও হতে পারেন যেমন ইকবাল সিং। তিনটে সম্প্রদায়ের কাছে নামটি বেশ পরিচিত। শিখ আধূষিত একটা গ্রামে নিঃসন্দেহে ইকবাল সিং, উত্তম আপ্যায়ন পাবেন ইকবাল চাদ বা ইকবাল মোহাম্মদের চেয়ে, যদিও তীর মাথার চুল ছোট এবং দাড়ি কামানো এবং তাঁর নিজেরও কিছুটা ধর্মীয় অনুভূতি ছিল।

আমি একজন সমাজকর্মী, ভাইজি। এখন গ্রামে অনেক কাজ। দেশ বিভাগের ফলে এত রক্ত ঝরিছে যে, তা বন্ধ করতে কাউকে কিছু করতে হবে। উদ্বাস্তু যাতায়াতের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম বলে পার্টি আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। এখানে কোন অশান্তি দেখা দিলে তা হবে ভয়াবহ।

ভাইজি ইকবালের পেশা সম্পর্কে খুব বেশি উৎসাহী বলে মনে হলো না।

আপনি কোথা থেকে আসছেন, ইকবাল সিংজি?

ইকবাল বুঝলেন, তিনি জানতে চাচ্ছেন তাঁর পূর্বপুরুষের কথা।

আমি ঝিলাম জেলার লোক, এখন ঝিলাম পাকিস্তানে। কিন্তু আমি বহুদিন ধরে ছিলাম বিদেশে। বিদেশে থাকলে বোঝা যায় আমরা কত পিছনে পড়ে আছি। তাই অনেকে দেশের জন্য কিছু করতে চায়। এজন্য আমি সমাজের কাজ করি।

এজন্য তারা আপনাকে কি রকম বেতন দেয়?।

ইকবাল জানতেন এ ধরনের প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করা ঠিক নয়।

খুব বেশি কিছু পাইনে। যা পাই তা দিয়ে কোন রকমে আমার খরচ চলে।

তারা কি আপনার স্ত্রী ও সন্তানের খরচও দেয়?

না ভাইজি, আমি বিয়ে করিনি।

আপনার বয়স কত?

সাতাশ বছর। আচ্ছা, এ গ্রামে আর কোন সমাজকর্মী আসেন? মিত সিং-এর প্রশ্ন থামিয়ে দেয়ার জন্য ইকবাল প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

কখনো কখনো আমেরিকান পাদ্রিরা আসে।

তারা যে আপনার গ্রামে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করে, এটা আপনি পছন্দ করেন?

যে যার নিজের ধর্মকে ভালবাসে। এখানে পাশের ঘরটা মুসলমানদের মসজিদ। আমি যখন গুরুর কাছে প্রার্থনা করি, চাচা ইমাম বখশ তখন আল্লাহকে ডাকেন। বিলেতে কত ধর্ম আছে?

তারা সব খ্রীষ্টান, কেউ ক্যাথলিক, কেউ প্রোটেস্টান্ট। তারা আমাদের মতো ধর্ম নিয়ে ঝগড়া করে না। সত্যি কথা বলতে কি, ধর্ম নিয়ে তারা খুব বেশি মাথা ঘামায় না।

এ রকমই আমি শুনেছি, মিত সিং বেশ গভীরভাবেই বললেন, এ কারণেই তাদের নৈতিকতা বলতে কিছু নেই। তারা অন্যের স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী অন্য সাহেবের সাথে ঘুরে বেড়ায়। এটা ভাল নয়। ঠিক কিনা?

কিন্তু তারা আমাদের মতো মিথ্যা বলে না। আমাদের মধ্যে অনেকে যেমন দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ, তারা তেমন নয়, ইকবাল বললেন।

মাছ ভর্তি টিনের মুখ খুলে তিনি বিস্কুটের ওপর মাছ বিছিয়ে দিলেন এবং খেতে খেতেই কথা বলতে শুরু করলেন।

মিত সিংজি, নৈতিকতা হলো এক ধরনের টাকা। গরিব লোকরা নৈতিকতা অর্জন করতে পারে না। এজন্য তাদের আছে ধর্ম। আমাদের প্রথম সমস্যা হলো মানুষকে অধিক খাদ্য, কাপড় ও আরাম প্রদান করা। সেটা করা সম্ভব যদি গরিবদের ওপর ধনীদের শোষণ বন্ধ করা যায়। আর জমিদারদের উচ্ছেদ করা যায়। একমাত্র সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

মিত সিং অত্যন্ত বিরক্তের সাথে যুবক লোকটির খাওয়া দেখছিলেন। লোকটি কিনা অতি নির্বিকারভাবে মাছের মাথা, চোখ ও লেজ খেয়ে যাচ্ছে। গ্রামের লোকদের ঋণগ্রস্ত হওয়া, গড় জাতীয় আয় ও পুঁজিবাদী শোষণ সম্পর্কে লোকটি শুকনো বিস্কুট খেতে খেতে যে সব কথা বলছিলেন, সেদিকে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিলনা। ইকবালের খাওয়া শেষ হলে মিত সিং তাঁর কলসি থেকে এক মগ পানি এনে দিলেন। ইকবাল তার কথা তখনও শেষ করেন নি। মিত সিং ভাই যখন পানি আনতে বাইরে গেলেন তখন তিনি একটু উচ্চ স্বরেই তাঁর বক্তব্য শুনিয়ে যাচ্ছিলেন।

ইকবাল তার থলে থেকে কাগজে মোড়া একটা ছোট প্যাকেট বের করে তা থেকে সাদা একটা ট্যাবলেট নিয়ে পানির মাগে ছেড়ে দিলেন। মিত সিং-এর হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখের নিচে ময়লা জমে ছিল। ঐ ময়লার আকার দেখতে অনেকটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির মতো। পানি আনার সময় মিত সিং ঐ ময়লা হাত পানিতে ডুবিয়েছিলেন, ইকবাল তা দূর থেকেই দেখেছিলেন। ঘটনা যাই হোক, এটা ছিল কুয়ার পানি এবং তা জীবাণুমুক্ত ছিল না।

বৃদ্ধ দেখলেন, ইকবাল পানিতে ট্যাবলেট ছেড়ে দিয়ে তা গুলিয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি অসুস্থ?

না, আমার খাবার হজম করতে এটা সাহায্য করে। খাওয়ার পর এ ধরনের জিনিস খেতে আমার মতো শহরবাসীরা অভ্যস্ত।

ইকবাল তাঁর কথা শুরু করলেন। আসল কথা হলো, পুলিশ বাহিনী আছে আমাদের। কিন্তু তারা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা ঘুষ ও দুর্নীতির ওপর বেঁচে থাকে। আমি নিশ্চিত যে, আপনি ঐসব কথা জানেন।

বৃদ্ধ মাথা দুলিয়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন। কিন্তু কোন মন্তব্য করার আগেই যুবক লোকটি আবার বলতে শুরু করলেন, আমি যে ট্রেনে এলাম ঐ ট্রেনে কয়েকজন পুলিশ ও

একজন ইন্সপেক্টর আসে। তারা এ এলাকার সব মুরগি খেয়ে ফেলবে এবং ইন্সপেক্টর ঘুষ হিসাবে কিছু টাকা কামাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এরপর তারা অন্য গ্রামে চলে যাবে। কেউ হয়ত মনে করতে পারে যে, লোকের কাছ থেকে টাকা কামানো ছাড়া তাদের করার আর কিছুই নেই।

বৃদ্ধ লোকটি ইকবালের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন বলে মনে হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু পুলিশের কথা শুনে তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, তাহলে পুলিশ এসেছে। তারা কি করছে আমার দেখা দরকার। তারা নিশ্চয়ই মহাজনের বাড়িতে আছে। গত রাতে সে খুন হয়েছে, ঐতো, গুরুদুয়ারার ওপাশে। ডাকাতরা অনেক টাকা নিয়ে গিয়েছে। মহাজনের স্ত্রীর কাছ থেকেও তারা পোচ হাজার টাকার ওপর সোনা-রূপার গয়না নিয়েছে বলে লোকে বলাবলি করছে।

মিত সিং বুঝতে পারলেন যে, তিনি এ বিষয়ে ইকবালের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার সেখানে যাওয়া দরকার। গ্রামের সব লোক সেখানেই জমায়েত হয়েছে। তারা ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ নিয়ে যাবে। কোন লোক খুন হলে ডাক্তার তাকে ডেথ সার্টিফিকেট না দেয়া পর্যন্ত তার সৎকার করা যাবে না। বৃদ্ধ লোকটির মুখে দেখা গেল বিকৃত হাসি।

হত্যা! কেন? কেন তাকে হত্যা করা হলো? ইকবাল যেন আঁতকে উঠলেন। কিছুটা ভয়ও পেলেন বলে মনে হলো। তিনি আরও অবাক হলেন এই ভেবে যে, নিকট প্রতিবেশীর নিহত হওয়ার ঘটনাটি মিত সিং একবারও তার কাছে উল্লেখ করেন। নি। এটা কি সাম্প্রদায়িক? এ অবস্থায় আমার কি এখানে থাকা উচিত? এই হত্যা নিয়ে গ্রামবাসী যেহেতু উত্তেজিত, সেহেতু আমি কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না।

কি হলো বাবু সাহেব! আপনি এসেছেন। হত্যা বন্ধ করতে আর একটা হত্যার খবরে আপনি মুষড়ে পড়লেন? মিত সিং মৃদু হেসে তাঁকে বললেন, আমার ধারণা ছিল আপনি এসব বন্ধ করতেই এসেছেন বাবু সাহেব। তবে মানো মাজরায় আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি বললেন, ডাকাতরা এ গ্রামে বছরে একাধিকবার আসে। কয়েকদিন পর পাশের গ্রামেও ডাকাতি হবে এবং তা গ্রামের লোক একদিন ভুলেও যাবে। রাতের প্রার্থনার পর আমরা সব গ্রামবাসী এখানে মিলিত হব। সেই জমায়েতে আপনার কিছু বলার থাকলে বলবেন। আপনি বরং এখন বিশ্রাম নিন। কি হলো তা আমি ফিরে এসে আপনাকে বলব।

বৃদ্ধ লোকটি বারান্দা অতিক্রম করে বেরিয়ে গেলেন। ইকবাল খালি টিন, ছুরি, চামচ, টিনের থালা সব এক সাথে করে কুয়ার ধারে গেলেন ধোয়ার জন্য।

১.০৮ পরদিন সকালে ইকবালকে গ্রেফতার করা হলো

পরদিন সকালে ইকবালকে গ্রেফতার করা হলো।

মিত সিং তাঁর পানি ভর্তি পিতলের মাগটি নিয়ে মাঠের জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন একটা গাছের ডাল দিয়ে দাঁতন করতে করতে। অতিক্রান্ত ট্রেনের গুড় গুড় শব্দ, মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনি এবং গ্রামের অন্যান্য কোলাহলের মধ্যে তাঁর বেশ ঘুম হয়েছিল। দুজন কনস্টেবল গুরুদুয়ারায় এসে তাঁর কামরা দেখল। সেলুলয়েডের কাপ ও প্লেট, এলুমিনিয়ামের ঝকঝকে চামচ ও ছুরি, থার্মোফ্লাস্ক তারা পরীক্ষা করে ছাদের ওপর উঠে গেল। তারা ইকবালকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিল। ইকবাল চোখ ডলাতে ডালতে উঠে বসলেন। তাঁকে বেশ আতঙ্কগ্রস্ত মনে হলো। অবস্থা কি হয়েছে তা পুরোপুরি বুঝে ওঠার এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়ার আগেই তিনি তাঁর পরিচয় ও পেশা সম্পর্কে কনস্টেবলদের বললেন। তাদের একজন তাঁর ঘুমন্ত চোখের ওপর ছাপানো একখানা হলুদ কাগজের খালি অংশ পূরণ করে তা মেলে ধরল।

এটা আপনার গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট, উঠে পড়ুন।

অপর কনস্টেবলটি তার বেল্টের সাথে রাখা হাতকড়ার একটি অংশ খুলে নিয়ে ইকবালের হাতে লাগাবার জন্য তার সংযুক্তি চাবি দিয়ে খুলল। হাতকড়ার দৃশ্য ইকবালকে যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। তিনি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে কনষ্টেবলদের মোকাবিলা করলেন।

এভাবে গ্রেফতার করার কোন অধিকার তোমাদের নেই, তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তোমরা আমার সামনেই গ্রেফতারী পরোয়ানা তৈরি করেছ। এখানেই এর শেষ নয় মনে রেখো। পুলিশ শাসনের দিন চলে গেছে। তোমরা যদি আমার গায়ে হাত দাও। তাহলে সারা বিশ্বকে আমি তা জানিয়ে দেব। সংবাদপত্রে আমি প্রকাশ করে দেব, তোমাদের মতো লোক কিভাবে কর্তব্য পালন করে।

কনস্টেবল দুজন হতবাক হয়ে গেল। ঐ যুবক লোকটির কথা বলার ধরন, রাবারের বালিশ, পদি ও কামরার অন্যান্য জিনিস যা তারা দেখেছে এবং সব কিছুর উর্ব্বে তাঁর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি-সব কিছু তাদের কেমন যেন অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে নিক্ষেপ করল। তাদের মনে হলো, তারা যেন একটা ভুল করে ফেলেছে।

বাবু সাহেব, আমরা শুধু ডিউটি করছি। এসব বিষয় আপনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাথে বোঝাপড়া করবেন, একজন কনস্টেবল বিনম্রভাবে কথাগুলো বলল। অন্যজন হাতকড়া হাতে অস্বস্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট, সবার সাথেই বোঝাপড়া করব। ঘুমন্ত মানুষকে বিরক্ত করা! এ ভুলের জন্য তোমাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। কনষ্টেবল দুজন কিছু বলবে এই আশা করে ইকবাল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তারা কিছু বললে সেই কথার ওপর ভিত্তি করে আইন-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলবেন। কিন্তু তারা চুপ করে রইল অনুগতভাবে।

তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমি মুখ-হাত ধোব, কাপড় বদলাব এবং আমার জিনিসপত্র কারও হাওলা করে যাব, ইকবাল বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই কথা বললেন। তারা কিছু বলুক, এ সুযোগও তিনি তাদের করে দিলেন।

ঠিক আছে বাবু সাহেব। আপনার যত সময় লাগে লাগুক।

পুলিশদের এই অসামরিক মনোভাব তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করল। তিনি তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচতলায় তাঁর কামরায় নেমে এলেন। এরপর তিনি পাতকুয়ার ধারে গেলেন, কুয়া থেকে এক বালতি পানি উঠিয়ে হাত-মুখ ধোয়া শুরু করলেন। তাঁর কাজকর্ম দেখে মনে হলো, তাঁর কোন তাড়া ছিল না।

ভাই মিত সিং দাঁতন করতে করতে গুরুদুয়ারায় এলেন। পুলিশের উপস্থিতি তাঁকে অবাক করল না। পুলিশরা যখনই গ্রামে এসে সরদারের বাড়িতে থাকার জায়গা পেত না

তখনই তারা গুরুদুয়ারায় চলে আসত। মহাজনের খুন হওয়ার পর পুলিশদের আগমন নিশ্চিত, একথা তিনি ধরেই নিয়েছিলেন।

শুভ সকাল, মিত সিং তাঁর হাতের দাঁতনটা ফেলে দিয়ে বললেন।

শুভ সকাল, পুলিশ দুজন উত্তর দিল।

আপনারা চা বা অন্য কিছু খাবেন? ঘোল?

আমরা বাবু সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছি, পুলিশরা বলল। বাবু সাহেবের তৈরি হওয়া পর্যন্ত যদি কিছু দেন তাহলে ভালই হয়।

মিত সিং সাধারণভাবে উদাসীনতা দেখালেন। পুলিশের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা বা তাদের কাজ নিয়ে উৎসাহ দেখানো তিনি পছন্দ করলেন না। ইকবাল সিং সম্ভবত একজন কমরেড। কারণ তিনি কমরেড-এর মতোই কথা বলেন।

আমি তাঁর জন্যও এক কাপ চা তৈরি করি, মিত সিং বললেন। এরপর ইকবালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি আপনার বোতলে রাখা চা খাবেন?

অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে, টুথপেস্ট মুখে বললেন ইকবাল। তিনি একবার থুথু ফেললেন। বোতলে রাখা চা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এক কাপ গরম চা পেলে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি যতদিন বাইরে থাকিব ততদিন কি আমার জিনিসপত্রগুলো দেখবেন দয়া করে। ওরা কি কারণে যেন আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে। কারণ সম্পর্কে ওরাও কিছু জানে না।

মিত সিং এমন ভান করলেন যেন তিনি কিছুই শুনতে পাননি। পুলিশ দুজনকে

দেখা গেল কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়।

বাবু সাহেব, এতে আমাদের কোন দোষ নেই, একজন পুলিশ বলল। আমাদের ওপর আপনি কেন রাগ করছেন। রাগ যদি করতে হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওপরই করুন।

ইকবাল তাদের প্রতিবাদ অবজ্ঞা করে আরও জোরে দাঁত মাজতে লাগলেন। তিনি হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখের পানি মুছতে মুছতে কামরায় ঢুকলেন। তিনি গদি ও বালিশের বাতাস ছেড়ে দিয়ে তা গোল করে ভাঁজ করলেন। হোল্ডআলোর ভিতর যে সব জিনিস ছিল তা বার করলেন এসব জিনিসের মধ্যে ছিল বই, কাপড়-চোপড়, টর্চ লাইট, একটা বড় ফ্লাস্ক। তিনি এসব জিনিসের একটা তালিকা করে তা পুনরায় হোল্ডঅলের মধ্যে রেখে দিলেন। মিত সিং যখন চা নিয়ে এলেন, তিনি তাঁর কাছে হোল্ড অলটা বুঝিয়ে দিলেন।

ভাইজি, আমার সব জিনিস। এই হোল্ডঅলের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এগুলো দেখতে আপনার খুব কষ্ট হবে না বলে মনে হয়। আমাদের এই স্বাধীন দেশে আমি পুলিশের চেয়ে আপনাকেই বেশি বিশ্বাস করি।

পুলিশ দুজন অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মিত সিং অস্বস্তিবোধ করলেন।

নিশ্চয়ই বাবু সাহেব, তিনি খুব ক্ষীণ স্বরে বললেন। আমি আপনার মতো পুলিশেরও সেবক। এখানে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। আপনি কি আপনার নিজের কাপে চা খাবেন?

ইকবাল তাঁর সেলুলয়েডের চায়ের কাপ ও চামচ বের করলেন। কনস্টেবল দুজন মিত সিং-এর কাছ থেকে পিতলের মগ নিল। মাথার পাগড়ির বাড়তি অংশ দিয়ে তারা মগের চারপাশে জড়িয়ে নিল। উদ্দেশ্য, হাতে যেন পরম না লাগে। নিজেদের আরও নিরাপদ রাখার জন্য তারা ফু দিয়ে চায়ে চুমুক দিল বেশ শব্দ করে। ইকবালের যেমন তাড়া ছিল না তেমনি কোন ভীতিও ছিল না। পুরো পরিস্থিতি ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তিনি বসেছিলেন স্প্রিং-এর খাটিয়ার ওপর। পুলিশ দুজন দরজার চৌকাঠের নিচের অংশে আর মিত সিং বাইরে মেঝের ওপর বসে ছিলেন। তারা ইকবালের সাথে কথা বলার সাহস পেল না, যদি তিনি আবার খারাপ ব্যবহার করেন, এই ভয়ে। যে কনস্টেবলের হাতে হাতকড়া ছিল সে অতি সন্তর্পণে হাতকড়াটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখল। তারা চা খাওয়া শেষ করে এদিক ওদিক তাকাল অসহিষ্ণুভাবে। ইকবাল বসে রইলেন। মাঝে মাঝে তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে

তাকালেন এবং অতি ধীর গতিতে চায়ে চুমুক দিলেন। কয়েকবার তিনি শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। চা খাওয়া শেষ করে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

আমি প্রস্তুত, তিনি বললেন। নাটকীয়ভাবে তিনি তাঁর দু'হাত প্রসারিত করে বললেন, হাতকড়া লাগাও।

হাতকড়ার প্রয়োজন নেই, বাবুজি, একজন কনষ্ট্রেবল বলল। আপনি বরং আপনার মুখটা ঢেকে নিন, অন্যথায় সনাক্তকরণ প্যারেডে সবাই আপনাকে চিনে ফেলবে।

ইকবাল যেন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এভাবেই তোমরা ডিউটি করা? আইনে যদি বলা হয় হাতকড়া লাগাতে হবে, তাহলে হাতকড়া লাগাও। কেউ আমাকে চিনে ফেললেও আমি ভয় করি না। আমি চোর বা ডাকাত নই। আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী। আমি গ্রামের মধ্য দিয়েই যাব। গ্রামের লোক আমাকে দেখুক। তারা দেখুক, তারা যা চায় না পুলিশ সেই কাজ করে।

ইকবালের এই কথা একজন পুলিশের সহ্য হলো না। সে তৎক্ষণাৎ বলল:

বাবুজি, আমরা আপনার সাথে সদায় ব্যবহার করে আসছি। সব সময় আপনাকে জি, জি বলে আসছি। কিন্তু আপনি চান আমাদের মাথার ওপর বসতে। আমরা আপনাকে হাজার বার বলেছি যে, আমরা শুধু ডিউটি করছি। কিন্তু বার বার আপনি এমন কথা বলছেন যাতে, বিশ্বাসযোগ্য হয় যে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে আমরা এ কাজ করছি। এরপর পুলিশটি তার সহকমীরি দিকে তাকিয়ে বলল, লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও। সে তার খোলা মুখ নিয়ে যা খুশি করুক। আমার মুখ এরকম হলে আমি তা লুকিয়ে রাখতাম। আমরা রিপোর্ট করব যে, তিনি মুখ ঢাকতে অস্বীকার করেছেন।

এই বিদ্রুপের ত্বরিত উত্তর ইকবালের কাছে ছিল না। তাঁর নাক বাঁকা এ কথা তিনি জানতেন। অনিচ্ছ সত্ত্বেও তিনি তার হাতের উলটো দিক দিয়ে নাক ঘষলেন। তার দৈহিক বিবরণের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাঁর হাতে হাতকড়া লাগানো হলো এবং একজন পুলিশের বেল্টের সাথে চেন দিয়ে আটকে রাখা হলো।

বিদায় ভাইজি, আমি শীঘ্র ফিরে আসব।

বিদায় ইকবাল সিংজি, গুরু আপনাকে রক্ষা করুন। বিদায় সেন্ট্রি জি।

বিদায়।

গুরুদুয়ারার আঙ্গিনা পেরিয়ে তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মিত সিং সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতে তাঁর চায়ের কেট্‌লি।

১.০৯ ইকবালকে গ্রেফতার করতে দুজন কনষ্টেবল

ইকবালকে গ্রেফতার করতে দুজন কনষ্টেবলকে পাঠানোর সময় দশ জন কনস্টেবলকে পাঠানো হয়েছিল জুগ্‌গাত্‌ সিংকে গ্রেফতার করতে। তারা জুগ্‌গাত্‌-এর বাড়িতে গিয়ে বাড়ির চতুর্দিক ঘিরে রইল। রাইফেলসহ কনস্টেবলরা পাশের বাড়ির ছাদের ওপর বসে জুর্গাত্র-এর বাড়ির দিকে তাক করে রইল। এরপর রিভলবারসহ ছয়জন কনস্টেবল বাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। জুগ্‌গাত্‌ সিং খাটিয়ার ওপর ঘুমিয়ে ছিল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ময়লা চাদর দিয়ে ঢাকা। সে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল। দুই রাত ও একদিন সে জঙ্গলে কাটিয়েছে খাদ্য ও আশ্রয় ছাড়াই। ঐ দিন ভোর রাতেই সে বাড়ি ফিরেছে। তার ধারণা, ঐ সময় গ্রামের সব লোক ঘুমিয়ে থাকবে এবং তাকে কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু গ্রামের লোক সতর্ক প্রহরায় ছিল। তার আগমনের সাথে সাথে তারা পুলিশকে খবর দেয়। তবু তারা অপেক্ষায় ছিল জুগ্‌গাত্‌-এর খাওয়া ও ঘুমিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। তার মা বাইরে গিয়েছিল। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে।

জুগ্‌গাত্‌ সিং-এর পায়ে বেড়ি এবং ডান হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হলো। তখনও সে ঘুমিয়ে। পুলিশরা তাদের রিভলভারের খাপ থেকে রিভলবার বের করে নিল। রাইফেলধারী পুলিশরাও বাড়ির আঙ্গিনায় এসে জমায়েত হলো। তারা বন্দুকের বাট দিয়ে জুগ্‌গাত্‌কে গুতা মারল।

ও জুগ্‌গা, উঠে পড়, সন্ধ্যা হয়ে এলো যে!

দেখ, কিভাবে সে শূকর ছানার মতো ঘুমিয়ে আছে। কি ঘটে যাচ্ছে তার কোন খেয়াল নেই।

চোখ রাগড়াতে রাগড়াতে জুগ্‌গা ক্লান্তভাবে উঠে বসল। দার্শনিক উদাসীনতায় সে তার হাতের কড়া ও পায়ের বেড়ি দেখল। তারপর সে তার দুবাহু প্রসারিত করে জোরে হাই তুলল। ঘুমে তার চোখ বুজে এল। সে বসেই ঝিমুতে লাগল।

জুগ্‌গাতু সিং-এর মা বাড়িতে এসে দেখল তার বাড়ির উঠেন অস্ত্রধারী পুলিশে ভর্তি। সে দেখল তার ছেলে খাটিয়ার ওপর বসে আছে। তার মাথা রয়েছে হাতকড়া বাঁধা হাতের ওপর। তার চোখ বন্ধ। সে তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার হাতের মধ্যে নিজের মাথা রেখে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

জুগ্‌গাত্‌ সিং তন্দ্রাচ্ছন্নভাব থেকে জেগে উঠল। সে তার মাকে পিছনের দিকে জোর করে সরিয়ে দিল।

তুমি কাঁদছো কেন?, সে বলল। তুমি তো জানো ঐ ডাকাতিতে আমি জড়িত ছিলাম না।

কিন্তু তার কান্না থামল না। সে এ কাজ করেনি। সে কিছুই করেনি। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, সে কিছুই করেনি।

তা হলো খুনের রাতে সে কোথায় ছিল? হেড কনস্টেবল জিজ্ঞাসা করল। সে রাতে সে নিজের ক্ষেতে ছিল। সে ডাকাত দলের সাথে ছিল না। আমি শপথ করে বলছি, সে ছিল না।

সে একটা বদমায়েশ। সন্ধ্যার পর তার গ্রামের বাইরে যাওয়া নিষেধ। এ কারণে হলেও তাকে আমাদের গ্রেফতার করতে হবে। সে তার লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘর ও তার চারপাশে তল্লাশি কর। হেড কনষ্টেবলের সন্দেহ ছিল যে, জুগ্‌গাত সিং তার নিজের গ্রামে। ঐ ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। কারণ এ ধরনের ঘটনা সাধারণত ঘটে না।

চারজন কনস্টেবল ঘর ও তার চারপাশে তল্লাশির কাজে লেগে গেল। তারা টিনের বাক্স খুলে সব জিনিস বের করল। খড়ের গাদা টেনে নামিয়ে ফেলল। ঘরের আঙ্গিনায় খড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। এর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল বর্শাটি।

আমার মনে হয় তোমার চাচা এটা এখানে রেখে দিয়েছে, জুগ্‌গার মাকে লক্ষ্য করে রসিকতা করে বলল হেড কনষ্টেবল। এর ধারাল অংশ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখ। এতে

রক্তের দাগ লেগে থাকতে পারে।

এতে কিছুই নেই, জুগ্‌গার মা চিৎকার করে বলল, ক্ষেতে ফসল নষ্ট করতে আসা শুয়োর মারতে সে এটা রেখেছিল। আমি শপথ করে বলছি, সে নির্দোষ।

আমরা দেখব, আমরা অবশ্যই দেখব। হেড কনস্টেবল জুগ্‌গার মায়ের কথায় আমল না দিয়ে বলল, তুমি বরং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থাপনের জন্য তার নির্দোষিতার প্রমাণ তৈরি রাখ।

বৃদ্ধ মহিলাটি তার কান্না থামাল। তার কাছে প্রমাণ আছে। এক প্যাকেট ভাঙ্গা চুড়ি। সে জুয়াকে এ কথা বলেনি। এ কথা তাকে বললে রাগে ও অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। এখন তার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া। এখন তার শুধু মেজাজ খারাপ হওয়ার কথা।

দাঁড়াও পুলিশ ভাই, আমার কাছে প্রমাণ আছে।

রংয়ের কাগজ দিয়ে মোড়া একটা প্যাকেট নিয়ে এল। সে কাগজের মোড়া খুললো। এর মধ্যে দেখা গেল নীল ও লাল রংয়ের ভাঙ্গা কাচের চুড়ি। এর মধ্যে দু'টো চুড়ি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। হেড কনস্টেবল এগুলো হাতে নিল।

এর থেকে কি প্রমাণ পাওয়া যায়?

খুন করার পর ডাকাতরা এগুলো ঘরের আঙ্গিনায় ছুড়ে মারে। তাদের সাথে না যাওয়ার জন্য তারা জুগ্‌গাকে অপমানিত করে। দেখ! বৃদ্ধা মহিলা তার হাত প্রসারিত করে বলল, আমি বৃদ্ধা। আমি কাচের চুড়ি পরি না। তাছাড়া এগুলো এতই ছোট যে, আমার হাতে পরা যাবে না।

তাহলে জুগ্‌গা অবশ্যই জানে ঐ ডাকাতদের। চুড়ি নিক্ষেপ করার সময় তারা কি বলেছিল? হেড কনস্টেবল জিজ্ঞাসা করল।

না, তারা কিছুই বলেনি। জুগ্গাকে তারা শুধু অপমানিত করেছিল...।

জুগ্‌গা তার মায়ের কথার মাঝে বলল, তুমি কি মুখ বন্ধ করবে? কারা ডাকাত আমি জানিনে। আমি যা জানি তা হলো, ঐ ডাকাতদের সাথে আমি ছিলাম না।

তোমার জন্য চুড়ি রেখে দিয়েছে কারা? হেড কনষ্টেবল জিজ্ঞাসা করল। তার মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল।

জুগ্‌গা তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। হাতকড়া পরানো হাতটা সে উঁচু করে হেড কনষ্টেবলের হাতের মধ্যে রাখা চুড়ির দিকে নিক্ষেপ করল সজোরে। কোন মায়ের বেজন্ম ছেলে আমাকে লক্ষ্য করে চুড়ি ছুড়েছে? কোন...।

কনষ্টেবলরা জুগ্‌গাত্‌কে ঘিরে ধরল। তারা তাকে থাপ্পড় মারল এবং জুতো দিয়ে লাথি মারতে লাগল। জুগ্‌গা খাটিয়ার ওপর বসে তার হাত দিয়ে মাথা ঢেকে রাখল। তার মা তার কপাল চাপড়ে পুনরায় কান্না শুরু করল। সে পুলিশের কর্ডন ভেদ করে ছেলের কাছে আছড়ে পড়ল।

তাকে মেরো না। তোমাদের ওপর গুরুর অভিশাপ নেমে আসবে। সে নির্দোষ। এটা আমার অপরাধ। মারতে হয় আমাকে মার।

জুগ্‌গাকে মারা বন্ধ হলো। হেড কনস্টেবল তার হাতের তালুতে আটকে যাওয়া কাচের টুকরা বের করল। রক্তের দাগ মুছে ফেলল রুমাল দিয়ে।

সে জুগ্‌গার মাকে লক্ষ্য করে বেশ কর্কশভাবেই বলল, তোমার ছেলের নির্দোষিতার প্রমাণ হিসাবে এগুলো রেখে দাও। তোমার শয়তান ছেলের কাছ থেকে আমরা আমাদের পদ্ধতিতে আসল কথা জেনে নেব। পাছায় কয়েকটা বেত পড়লে সে কথা বলবে। এরপর অন্য পুলিশদের দিকে তাকিয়ে বলল, নিয়ে চল। ওকে।

জুগ্‌গাত্ সিংকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। তার হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি। তার মায়ের কান্না তখনও থামেনি। সমানে সে কপাল ও বুক চাপড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থাতেও জুগ্‌গার আচরণে আবেগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তার বিদায়ী কথা ছিল এ রকম :

আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। বর্শা রাখার জন্য ও গ্রাম থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য তারা আমাকে কয়েক মাসের বেশি আটকে রাখতে পারবে না। বিদায়।

জুগ্‌গা যেমন ক্ষণিকের মধ্যে তার মেজাজ খারাপ করে ফেলেছিল, ঠিক তেমনি দ্রুত তার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। সে চুড়ির ঘটনা ভুলে গেল। ঘরের আঙ্গিনার বাইরে পা দিয়েই সে পুলিশ প্রহারের কথা ভুলে গেল। পুলিশের প্রতি তার কোন বিদ্বেষ নেই বা তাদের কোন ক্ষতি করারও ইচ্ছা নেই। অন্যান্য মানুষের মতো তারা মানুষ নয়। তাদের কোন স্নেহ-মমতা নেই। অনুরাগ নেই। নেই কোন শত্রুতা। তারা শুধুই ইউনিফর্ম পরা মানুষ-মানুষ যাদের এড়িয়ে চলতে চায়।

জুগ্‌গাত্‌ সিং-এর মুখ ঢেকে রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ সারা গ্রামের লোক তাকে চেনে। সে গ্রামের পথ ধরে হাটছিল হাসতে হাসতে। কাউকে দেখতে পেলে হাতকড়া পরা হাত দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল। পায়ে বেড়ি থাকায় তাকে হাঁটতে হচ্ছিল আস্তে আস্তে। তার পদক্ষেপ ছিল ছন্দপূর্ণ। সে তার পাতলা সরু মোচে তা দিয়ে প্রকাশ করল, তার কোন চিন্তা নেই। পুলিশের দিকে তাকিয়ে সে ব্যঙ্গোক্তিও করুল অশ্লীল ভাষায়।

নদীর ধারে এসে দুজন পুলিশসহ ইকবাল জুগ্‌গাত্‌ সিং-এর দলের সাথে মিশলেন। তারা সবাই উজান মুখে ব্রিজের দিকে চলল। হেড কনস্টেবল ছিল সবার আগে। অস্ত্রধারী পুলিশ ছিল বন্দীর পাশে ও পিছনে। পুলিশদের খাকি ও লাল ইউনিফর্মের মাঝে ইকবালকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু জুগ্‌গাত্‌ সিং-এর ঘাড় ও মাথা দেখা গেল পুলিশের পাগড়ির ওপর। মনে হলো, মাঝখানে হাতিসহ ঘোড়ার একটা মিছিল। হাতিটা লম্বা চওড়া, ধীর গতিসম্পন্ন এবং তার পায়ে বেড়ি। হাঁটার সময় ঝন ঝন শব্দ হচ্ছিল। ঐ শব্দ যেন সজ্জিত অনুষ্ঠানের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল!

কেউ কথা বলার মেজাজে ছিল বলে মনে হলো না। পুলিশরাও অস্বস্তিতে ভুগছিল। তারা বুঝতে পেরেছে যে, তারা হয় একটা আর না হয় দুটা ভুল করেছে। একজন সমাজকর্মকে গ্রেফতার করা তাদের মারাত্মক ভুল হয়েছে এবং এজন্য তাদের সাংঘাতিক বিড়ম্বনা হতে পারে। তিনি যে নির্দোষ তা তার উদ্ধত আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্য অন্য যে কোন মামলা দায়ের করা যেতে পারে। শিক্ষিত লোকের ব্যাপারে এ ধরনের চালাকির আশ্রয় প্রায়ই নিতে হয়। জুগ্‌গাত্‌ সিংকে গ্রেফতার করা অবশ্য ঠিক হয়েছে। কারণ সে রাতে গ্রামের বাইরে গিয়ে নিঃসন্দেহে আইন ভঙ্গ করেছে। কিন্তু নিজের গ্রামের এক বাড়িতে ডাকাতির কাজে সম্ভবত সে অংশ গ্রহণ করেনি। বিরাট দেহ নিয়ে ঐ কাজে গেলে সহজেই লোকে তাকে চিনে ফেলত। এ কথাও সত্য যে, ইকবাল ও জুগ্‌গাত্‌ সিং এই প্রথম একে অপরের সাথে মিলিত হলো।

ইকবাল নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। জুগ্‌গাত্‌ সিংকে দেখার পর তাঁর মনে হয়েছিল যে, রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি নিজে হাতকড়ি লাগাবার অনুরোধ করেছিলেন এই কারণে গ্রামবাসী তাঁকে দেখে এই ধারণা নিক যে, তিনি কতটা মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক স্বাধীনতার ঐ হাল দেখে গ্রামবাসীরা নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হতো। কিন্তু পুরুষরা তাঁর দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাল আর মেয়েরা অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কে? জুগ্‌গাত্‌ সিংকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া দলের সাথে তিনি যখন মিশলেন তখন তাঁর পুলিশের সেই উপদেশের (আপনি মুখ ঢেকে নিন। অন্যথায় সনাক্তকরণ প্যারেডে সবাই আপনাকে চিনে ফেলবে) কথা মনে হলো। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে রামলালের খুনের সাথে জড়িত থাকার কারণে। এমন নিবুদ্ধিতা তাঁর বিশ্বাস হয় না। প্রত্যেকেই জানে যে, রামলাল খুন হওয়ার পর তিনি মানো মাজরায় আসেন, এমনকি পুলিশের সাথে একই ট্রেনে। খুন হওয়ার সময় তিনি এখানে ছিলেন না, এ কথার সাক্ষ্য তারাও দিতে পারবে। হাস্যকর এই ঘটনা বলার ভাষা নেই। কিন্তু পাঞ্জাবী পুলিশ সেই ধরনের পুলিশ নয় যারা ভুল করে স্বীকার করে যে, ভুল করা হয়েছে। তারা যে কোন অভিযোগ দায়ের করবে: ভবঘুরে, অফিসারদের কাজে বাধা দান বা অনুরূপ

অন্য কোন অভিযোগ। এর বিরুদ্ধে অবশ্যই তিনি আপ্রাণ লড়বেন।

ঐ দলের মধ্যে জুগ্গাত্ সিং-এর মনে কোন ভাবান্তর দেখা দিল না। এই ঘটনায় সে যেন কিছুই মনে করেনি। আগেও সে গ্রেফতার হয়েছে। সে বাড়িতে যত দিন কাটিয়েছে প্রায় ততদিন সে জেলে কাটিয়েছে। পুলিশের সাথে তার সম্পর্ক বলা যায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। পুলিশের দশ নম্বর খাতায় তার পিতা আলম সিং-এর নাম ছিল। অসৎ চরিত্রের লোকদের কাজের ফিরিস্তি এই খাতায় থাকে। খুন করে ডাকাতি করার দায়ে আলম সিং দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তার ফাঁসি হয়। উকিলের পয়সা যোগাড় করতে জুর্গাত্ সিং-এর মাকে সব সম্পত্তি বন্ধক দিতে হয়। সম্পত্তি ফেরত আনার জন্য জুগ্গাত সিংকে টাকার যোগাড় করতে হয় এবং ঐ বছরেই সে টাকা ফেরত দিয়ে জমি ছাড়িয়ে নিয়েছে। কিভাবে সে ঐ টাকা যোগাড় করেছে কেউ তার প্রমাণ দিতে পারবে না। বছর শেষেই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। তার নাম খাতার দশ নম্বরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারীভাবে তাকে অসৎ চরিত্রের লোক বলে ঘোষণা করা হয়। তার অগোচরে লোকে তাকে দশ নম্বর বলে ঠাট্টা করে।

জুগ্গাত্ সিং তার পাশের বন্দীর দিকে কয়েকবার তাকিয়ে দেখল। সে তার সাথে আলাপ করতে চাইল। কিন্তু ইকবালের সেদিকে খেয়াল ছিল না। তাঁর দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে নিবদ্ধ। তিনি যেন হাঁটছিলেন ক্যামেরাসচেতন একজন নায়কের মতো করে যার দৃষ্টি ক্যামেরার লেন্সের দিকেই প্রসারিত। জুগ্গাত্ সিং আর ধৈর্য রাখতে পারল না।

শুনুন। আপনি কোন গ্রাম থেকে আসছেন? কপট হেসে জুগ্গাত্ সিং জিজ্ঞাসা করল। হাসির সময় তার সামনের দাঁতগুলো দেখা গেল। মাঝের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

ইকবাল ফিরে তাকালেন, কিন্তু হাসির জবাব দিলেন না। আমি কোন গ্রামের বাসিন্দা নই। আমি দিল্লী থেকে এসেছি। কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু লোকগুলো সংগঠিত হোক সরকার এটা চায় না।

জুগ্গাত্ সিং ভদ্র হয়ে গেল। ঘনিষ্ঠ লোকের সাথে লোকে যেভাবে কথা বলে সে ধরনের কথা থেকে সে বিরত রইল। আমরা শুনেছি আমরা এখন স্বাধীন, সে বলল। দিল্লীতে এখন মহাত্মা গান্ধীর সরকার, তাই না? আমাদের গ্রামে লোকে এ রকমই বলে।

হ্যাঁ। ইংরেজরা চলে গেছে। কিন্তু তাদের স্থান দখল করেছে ধনী ভারতীয়রা। স্বাধীনতা থেকে তুমি বা তোমার গ্রামের লোক কি পেয়েছে? বেশি রুটি বা বেশি কাপড়? ইংরেজরা যে হাতকড়া ও বেড়ি পরাত তোমাদের, সেই হাতকড়া তোমার হাতে, সেই বেড়ি তোমার পায়ে। এর বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। এই শৃঙ্খল ছাড়া আমাদের আর কিছুই হারাবার নেই। ইকবাল শেষের কথাটা খুব জোর দিয়ে বললেন। তিনি তাঁর দু'হাত মুখের কাছে এনে একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দিলেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গি এমনই যেন ঐ আন্দোলন হাতকড়া ভেঙ্গে ফেলবে!

পুলিশরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

জুগ্গাত্ সিং তার পায়ের বেড়ির দিকে তাকাল। হাতকড়ার সাথে সংযুক্ত লোহার রডটাও সে তাকিয়ে দেখল।

আমি একটা বদমায়েশা। সব সরকারই আমাকে জেলে ঢোকায়।

কিন্তু, ইকবাল বেশ ক্রুদ্ধভাবেই তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, কে তোমাকে বদমায়েশ বানিয়েছে? সরকার। সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং রেজিস্টার, জেলার ও পুলিশ রাখে ঐ আইন বলবৎ করার জন্য। কাউকে তাদের পছন্দ না হলে তাদের আইনে সে হয় অসৎ চরিত্রের লোক, অপরাধী। আমি কি করেছি ...

না বাবু সাহেব, সহস্যে জুগ্গাত্ সিং বলল, এটাই আমাদের ভাগ্য। এটা আমাদের কপালে ও হাতের রেখায় লেখা আছে। আমি সব সময় কিছু করতে চেয়েছি। জমি চাষ করার সময় বা ফসল ঘরে তোলার সময় আমি ব্যস্ত থাকি। যখন কোন কাজ থাকে না

তখনও আমি কাজ করতে উদ্‌গ্রীব থাকি। সুতরাং আমি কিছু কাজ করি এবং তা সব সময় হয়ে যায় অপরাধমূলক কাজ।

এ সময় তারা ব্রিজের নিচ দিয়ে পার হয়ে রেষ্ট হাউসের নিকটবর্তী হলো। জুগ্‌গাতু সিং-এর আত্মপ্রসাদের কথা শুনে ইকবালের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একজন গ্রাম্য অসৎ চরিত্রের লোকের সাথে তর্ক করে তিনি সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য সব কথা জমা রাখতে চাইলেন। সব কথা তিনি তাঁকে ইংরেজীতে বলবেন-সে সব কথা তিনি কিভাবে বলবেন সেই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসল।

১.১০ পুলিশ বন্দীদের হাজির করার পর

পুলিশ বন্দীদের হাজির করার পর সাব-ইন্সপেক্টর তাঁদের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখন তাঁর কামরায় ছিলেন। তিনি কাপড় পারছিলেন। হেড কনস্টেবল পুলিশের তত্ত্বাবধানে বন্দীদের রেখে বাংলোয় এলো।

সাধারণ ঐ লোকটি কে যাকে তুমি ধরে এনেছ? কিছুটা চিন্তান্বিত হয়ে সাবইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনার আদেশে আমি তাকে গ্রেফতার করেছি। সে একজন আগন্তুক। শিখ মন্দিরে সে অবস্থান করছিল।

এই উত্তরে সাব-ইন্সপেক্টর বিরক্ত হলেন। তোমার মাথায় বুদ্ধি নেই একথা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। সামান্য একটা কাজ আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি গিয়ে এমন কাজ করেছ যা তোমার নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক। গ্রেফতার করার আগে তুমি তাকে একবার দেখেছি। গতকাল যে লোকটি আমাদের সাথে ট্রেন থেকে নামে সে কি একই ব্যক্তি নয়?

ট্রেন?? নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে হেড কনস্টেবল বলল, আমি তাকে ট্রেনে দেখি নি। স্যার। আমি শুধু আপনার আদেশ পালন করেছি। সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ঐ আগন্তুককে গ্রামে ঘোরাফেরা করতে দেখে আমি গ্রেফতার করেছি।

সাব-ইন্সপেক্টর ক্রোধান্বিত হলেন।।

গাধা।

হেড কনষ্টেবল তার অফিসারের মন্তব্য না শোনার ভান করল।

তুমি কোন এলাকার গাধা, সাব-ইন্সপেক্টর একই কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন, তোমার মাথায় কি কোন বুদ্ধি নেই?

স্যার, আমি কি অন্যায় ...

চুপ কর।

হেড কনষ্টেবল তার নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। সাব-ইন্সপেক্টর তার মেজাজ ঠাণ্ডা করলেন। তাঁকে হুকুম চাঁদ-এর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি তাঁর ওপর ভরসা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বিব্রত করবেন। এটা হুকুম চাঁদ আশা করেন নি নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সাব-ইন্সপেক্টর তারের জাল দেয়া দরজায় উঁকি দিলেন।

ভিতরে আসতে পারি, স্যার?

আসুন, আসুন ইন্সপেক্টর সাহেব, হুকুম চাঁদ বললেন। আনুষ্ঠানিকতার জন্য অপেক্ষা করবেন না।

সাব-ইন্সপেক্টর ভিতরে গিয়ে তাঁকে স্যালুট করলেন।

বলুন, কাজ কতদূর হলো? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন। সদ্য শেভ করা চোয়ালে তিনি ক্রম ঘষছিলেন। ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা মগের তলদেশে সাদা ট্যাবলেটের মতো একটা বস্তু বুদবুদ ছড়াচ্ছিল। তার ঢেউ ওপরে ভেসে উঠছিল।

স্যার, আজ সকালে আমরা দুজন লোককে গ্রেফতার করেছি। একজন জুগ্গা বদমায়েশী। ডাকাতির রাতে সে বাড়ির বাইরে ছিল। তার কাছ থেকে আমরা অবশ্যই কিছু তথ্য পাব। অন্য লোকটি একজন আগন্তুক। গ্রামের সরদার তার সম্পর্কে আমাদের কাছে রিপোর্ট করেছিল। আপনি তাকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হুকুম চাঁদ চিবুকে ক্রম ঘসা বন্ধ করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দ্বিতীয় লোকটির গ্রেফতার করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করার চেষ্টা হচ্ছে।

লোকটি কে?

সাব-ইন্সপেক্টর বাইরে অপেক্ষারত হেড কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে বললেন, শিখ মন্দির থেকে যাকে গ্রেফতার করেছ, তার নাম কি?

ইকবাল।

ইকবাল কি? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেশ জোরে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি এখনই জিজ্ঞাসা করে আসছি। স্যার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে কিছু বলার আগেই হেড কনস্টেবল সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের দিকে দৌড়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করল। টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে তিনি এক চুমুক হুইস্কি গলাধঃকরণ করলেন। সাব-ইন্সপেক্টর অস্বস্তির মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে রইলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হেড কনস্টেবল ফিরে এসে কাশি দিয়ে তার উপস্থিতির কথা জানাল।

স্যার। সে আবার কাশলো। স্যার, সে লিখতে পড়তে পারে। সে শিক্ষিত।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে দরজার দিকে ফিরলেন।

তার কি মা-বাবা আছে? কোন ধর্ম আছে কি নেই? শিক্ষিত!

স্যার। হেড কনস্টেবল তো তো করে বলল, সে আমাদের কাছে তার পিতার নাম বলতে অস্বীকার করেছে। সে বলেছে যে, তার কোন ধর্ম নেই। সে আপনার সাথে কথা চলতে চায়।

তাকে ধরে নিয়ে এসো, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাগে গর গর করতে লাগলেন। উত্তর না দেয়া পর্যন্ত তার পাছায় বেত মার। যাও, ... না, দাঁড়াও। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব এটা দেখবেন।

হুকুম চাঁদের ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয়নি। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে তিনি তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছলেন। কিছুটা আরাম বোধ হলো তাঁর। রাগও কিছুটা কমল।

আপনি আর পুলিশরা আচ্ছা লোক দেখেছি। নাম, পিতার নাম বা কোন জাতির লোক তা না জেনেই আপনার লোক গ্রেফতার করে। সাদা গ্রেফতারী পরোয়ানায় আপনারা আমার সই করিয়ে নিয়েছেন। একদিন হয়ত আপনারা গভর্নরকে গ্রেফতার করে বলবেন, হুকুম চাঁদ আপনাকে ঐ কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে। আপনারাই আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করাবেন।

স্যার, আমি এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছি। লোকটা গতকাল মানো মাজরায় আসে। আমি তার পিতৃ-পরিচয় ও পেশা সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি।

হ্যাঁ যান। খোঁজ নিন। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটাবেন না। হুকুম চাঁদ চিৎকার করে উঠলেন। মেজাজ খারাপ করা বা কর্কশ ব্যবহার করা হুকুম চাঁদের অভ্যাস নয়। সাব-ইন্সপেক্টর চলে গেলে তিনি আয়নায় নিজের জিহবা পরীক্ষা করে। দেখলেন এবং পানি ভর্তি মাগে আর একটা ট্যাবলেট ছেড়ে দিলেন।

সাব-ইন্সপেক্টর ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। প্রাণ ভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলেন। কয়েকবার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ক্রোধ তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। তাঁকে শক্ত পথেই এগুতে হবে এবং সঙ্কল্পহীনতা কাটাতে হবে। তিনি সোজা সার্ভেন্ট কোয়াটারে গেলেন। জুগাত্ সিং-এর দল থেকে একটু দূরে ইকবাল ও তার নিরাপত্তারক্ষীরা দাঁড়িয়ে ছিল। যুবক লোকটি নিজেকে অপমানিত বোধ করছেন বলে সাব-ইন্সপেক্টরের ধারণা হলো। ঐ লোকটির সাথে কথা না বলাই উত্তম বলে তাঁর মনে হলো।

এ লোকটার কাপড়-চোপড় তল্লাশি কর। তাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিবস্ত্র করি। আমি সব কিছু নিজে পরীক্ষা করব।

ইকবালের পরিকল্পিত বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ হলো না। একজন কনস্টেবল তাঁকে প্রায় টেনে হেঁচড়ে একটা কামরার মধ্যে নিয়ে গেল। তাঁর বাধা দান কোন কাজেই এলো না। তিনি তাঁর জামা খুলে পুলিশের কাছে দিলেন। সাব-ইন্সপেক্টর কামরায় ঢুকে জামা পরীক্ষার আগ্রহ না দেখিয়ে নির্দেশ দিলেন,

আপনার পাজামা খুলুন। ইকবাল নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর প্রতিরোধ ক্ষমতার আর কিছুই রইল না।

পাজামার মধ্যে কোন পকেট নেই। ফলে এর মধ্যে কিছু লুকিয়ে রাখার উপায় নেই।

পাজামা খুলুন, তর্ক করবেন না। সাব-ইন্সপেক্টর তার হাতের লাঠি দিয়ে নিজের খাকি জামার ওপর আঘাত করলেন কয়েকবার। তার আদেশ ইকবালকে মানতে হবে, এটাই তিনি তাকে বোঝাতে চাইলেন।

ইকবাল তাঁর পাজামার দড়ি ঢিলা করলেন। তার পায়ের গোড়ালির চারপাশে ঢিলা পাজামা খসে পড়ল। হাতে হাতকড়া ছাড়া তাঁর পরিধানে আর কিছুই রইল না। তিনি পাজামার গণ্ডি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করলেন, যেন সাব-ইন্সপেক্টর তা পরীক্ষা করতে পারে। না, কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাবইন্সপেক্টর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন,

আমার যা দেখার তা দেখে নিয়েছি। আপনি কাপড় পরতে পারেন। আপনি বলেছেন, আপনি একজন সমাজকর্মী। মানো মাজরায় আপনার কাজ কি?

আমার পার্টি আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, ইকবাল তাঁর পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললেন।

কোন পার্টি?

পিপলস পার্টি অব ইন্ডিয়া।

ইন্সপেক্টর সাহেব ইকবালের দিকে তাকিয়ে বিদ্বেষের হাসি হাসলেন। দি পিপলস পার্টি অব ইন্ডিয়া। তিনি কথা কয়টি আস্তে আস্তে বললেন। সব কটি শব্দ উচ্চারণ করলেন পৃথকভাবে। আপনি কি নিশ্চিত যে, ওটা মুসলিম লীগ নয়?

এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ইকবাল ধরতে পারলেন না।

না, আমি কেন মুসলিম লীগের সদস্য হতে যাব? আমি...

ইকবাল তাঁর কথা শেষ করার আগেই ইন্সপেক্টর সাহেব কামরার বাইরে চলে গেলেন। বন্দীকে থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি কনস্টেবলকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার আবিষ্কার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাবার জন্যে বাংলোয় গেলেন। তার ঠোঁটে লেগে রইল আত্মতৃপ্তির হাসি।

স্যার, সব ঠিক আছে। সে বলছে যে, তাকে পিপলস পার্টি পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, সে মুসলিম লীগের সদস্য। দু'টো পার্টি একই রকম। সীমান্তের কাছে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে সে এসেছে। এ কারণে তাকে গ্রেফতার করা অন্যায় হয়নি। তার বিরুদ্ধে আমরা যে কোন অভিযোগ আনতে পারি।

আপনি কিভাবে বুঝলেন সে মুসলিম লীগের সদস্য।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব, আস্থার সাথে মৃদু হাসলেন। আমি তাকে বিবস্ত্র করেছি।

ট্যাবলেটের গুড়ো নিচে জমে ছিল। তা গুলিয়ে দেয়ার জন্য হুকুম চাঁদ গ্লাসটা ঝাঁকিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি তা এক ঢেকে সব গিলে ফেললেন। খালি গ্লাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, গ্রেফতারী পরোয়ানা ঠিক করে পূরণ করে নিন। নাম মোহাম্মদ ইকবাল, পিতার নাম মোহাম্মদ ... কিছু একটা বা পিতার নাম-জানা যায়নি, জাতি মুসলমান, পেশা-মুসলিম লীগ সদস্য।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেল নাটকীয়ভাবে স্যালুট করলেন।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। আধা কাজ করে শেষ করবেন না। আপনার পুলিশ ডায়রিতে লিখুন যে, রামলালের হত্যকারীদের এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে সম্পর্কিত তথ্য শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এ ব্যাপারে জুয়ার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে বলে আপনি মনে করেন?

হ্যাঁ স্যার। ডাকাতরা চলে যাওয়ার সময় তার বাড়ির আঙ্গিনায় কাচের চুড়ি নিক্ষেপ করে। জুগ্গা তাদের সাথে এই ডাকাতিতে অংশ নিতে অস্বীকার করে বলে দৃশ্যত মনে হয়।

ভাল কথা। তার কাছ থেকে শীঘ্র নামগুলো জেনে নিন। প্রয়োজন হলে তাকে প্রহার করবেন।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব হাসলেন। তাকে প্রহার না করেই তার কাছ থেকে চব্বিশ

ঘণ্টার মধ্যে আমি ডাকাতদের নাম সংগ্রহ করব।

ঠিক আছে, আপনি যেভাবে পারেন নামগুলো সংগ্রহ করুন। অধৈর্যভাবে হুকুম চাঁদ বললেন। আজকের দুজন গ্রেফতারের দিগ্বিচ। 9ানা: ডায়রিতে দফাওয়ারীভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। কোন কাজ আনাড়ির মতো করবেন না।

ইন্সপেক্টর সাহেব। আবার স্যালুট করলেন।

সব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করব স্যার।

১.১১ ইকবাল ও জুয়াকে টাঙ্গায় করে

ইকবাল ও জুয়াকে টাঙ্গায় করে চন্দননগর থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। ইকবালকে বেশ সম্মানই দেয়া হলো। তাকে সামনের সিটের মাঝখানে বসানো হলো। কোচোয়ান তার নিজের সিট ছেড়ে ঘোড়ার পাশে কাঠের ওপর বসল। জুগ্গাত্ব সিং বসিল পিছনের সিটে, দুই পুলিশের মাঝখানে। রেল রাস্তার ধার দিয়ে দীর্ঘ এই রাস্তাটি ছিল কাঁচা। এই ভ্রমণে একমাত্র জুগারই কোন কষ্ট হচ্ছিল না। সে পুলিশদের চেনে, পুলিশরাও তাকে চেনে। তাছাড়া এ ধরনের পরিস্থিতি তার কাছে নতুন নয়।

থানায় বোধ হয় এখন অনেক বন্দী আছে? জুগ্গা কথা শুরু করল।

না, একজনও নেই, একজন কনষ্ট্রেবল উত্তর দিল। আমরা দাঙ্গাকারীদের গ্রেফতার করি না। তাদেরকে আমরা কেবল ছত্রভঙ্গ করি। অন্যান্য অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমাদের নেই। গত সাত দিনে এই প্রথম আমরা দুজন লোককে গ্রেফতার করলাম। থানার দু'টো কামরাই খালি। পুরো একটা কামরায় তোমরা একজন থাকতে পারবে।

বাবুজীর এ ব্যবস্থা পছন্দ হবে। তাই না বাবুজী? জুগ্গা জিজ্ঞাসা করল।

ইকবাল এ কথার কোন জবাব দিল না। জবাব না পাওয়ায় জুগ্গা কিছুটা আহত হলো। তবু সে হতোদাম হলো না। সে আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করল।

হিন্দুস্তান-পাকিস্তান নিয়ে যা চলছে তা নিয়ে তোমাদের অনেক কাজ করতে হচ্ছে, তাই না? একজন কনষ্টেবলের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

হ্যাঁ, সব দিকে কেবল খুন। আবার পুলিশ বাহিনীর সদস্যও কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে।

কেন, তারা কি পাকিস্তানে যোগ দিয়েছে?

তারা ওপারে যোগ দিয়েছে কি না। আমরা জানি না। তারা শুধু প্রতিবাদ করছে যে, তারা ওপারে যেতেই চায় না। স্বাধীনতার দিন সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব সব মুসলমান পুলিশকে অস্ত্রহীন করেন। এরপর তারা পালিয়ে গেছে। তাদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল। মুসলমানদের কাজই এ রকম। তাদের বিশ্বাস করা কঠিন।

হ্যাঁ, অন্য কনষ্টেবলটি এ কথার সমর্থন জানিয়ে বলল, মুসলমান পুলিশরা এক পক্ষ সমর্থন করায় দাঙ্গার চেহারা বদলে গেছে। লাহোরের হিন্দু ছেলেরা মুসলমানদের নাজেহাল করতে পারত। কিন্তু পুলিশের জন্য পারেনি। তারা অনেক অত্যাচার করেছে।

তাদের সেনাবাহিনীও ঐ রকম। যে সব এলাকায় শিখ বা গুর্খা সেনাদলের ছাউনিতে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ নেই, সেসব এলাকায় বেলুচ সৈন্যরা লোককে গুলি করে মারছে।

তারা খোদার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। খোদার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না, জুগ্গা বেশ আস্থার সাথেই বলল। সবাই যেন একটু অবাক হলো। এমন কি ইকবালও মাথা ঘুরিয়ে পরখ করে নিল যে, ঐ কথা জুগ্গার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে।

তাই না বাবুজী? আপনি চালাক মানুষ। আপনিই বলুন। খোদার গজব থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারে?

ইকবাল কিছুই বললেন না।

না, কেউ পারে না, জুগ্গা নিজেই উত্তর দিল। মিত সিং আমাকে যা বলেছিল, তার কিছু আপনাকে বলছি। খুব মূল্যবান কথা বাবুজী। ষোলো আনা খাঁটি কথা।

জুগ্গার কথায় ইকবাল কোন আগ্রহ দেখাল না।

জুগ্গা কিন্তু থামল না। ভাইজী আমাকে বলেন : এক ট্রাক ভর্তি বেলুচ সৈন্য অমৃতসর থেকে লাহোর যাচ্ছিল। পাকিস্তান সীমান্তের কাছে এসে তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া শিখদের ওপর বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে। কোন সাইকেল আরোহী বা পায়ে হাটা লোককে দেখলে গাড়ির ড্রাইভার গতি কমিয়ে দেয়। আর দরজার কাছে দাঁড়ানো সৈন্যরা তাদের পিছন দিক থেকে ছুরিকাঘাত করে। এরপর ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়।

এভাবে তারা বহু লোককে মারে। তারা যতই পাকিস্তানের নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছিল। তারা সীমান্তের এক মাইলের মধ্যে এসে জোরে গাড়ী চালাচ্ছিল। তারপর তাদের কি হলো কেউ চিন্তা করতে পার?

কি হলো? একজন কনস্টেবল জিজ্ঞাসা করল। ইকবাল ছাড়া সবাই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এমন কি কোচোয়ানও ঘোড়াকে চাবুক মারা থামিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে রইল।

শুনুন বাবুজী, খুবই দামী কথা। একটা পথের কুকুর রাস্তা পার হওয়ার জন্য দৌড় দিল। যে ড্রাইভারটি এতগুলো লোকের খুনের সাথে জড়িত সেই ড্রাইভারই কুকুরটাকে বাঁচাবার জন্য গাড়ির স্টিয়ারিং ডানদিকে কাটাল। গাড়িটি ধাক্কা খেল একটা গাছের সাথে। ড্রাইভার আর দুজন সৈন্য নিহত হলো সেখানেই। মারাত্মকভাবে জখম হলো অন্য সবাই। এ ঘটনার ব্যাপারে তোমরা কি বলবো?

পুলিশরা গুঞ্জন করে তাদের মতামত জানাল। ইকবাল বিরক্ত হলেন।

এই দুর্ঘটনা কে ঘটাল, কুকুর না খোদা? বেশ উত্তেজিত হয়েই সে জিজ্ঞাসা করল।

নিশ্চয়ই খোদা, একজন পুলিশ উত্তর দিল। যে ড্রাইভার মানুষ মারতে আনন্দ পেয়েছে সে কেন একটা রাস্তার কুকুরকে গাড়ির তলায় চাপা দিতে পারল না?

তোমরাই বল, ইকবাল ঠাণ্ডা মেজাজে বললেন। জুগ্‌গা ছাড়া সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি ঐ কথা বললেন। জুগ্‌গা যে অদম্য তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। জুগ্‌গা টাঙ্গার কোচোয়ানের দিকে তাকাল। কোচোয়ান ঘোড়ার পিঠে আবার চাবুক মারতে শুরু করল।

ভোলা, তোমার কি খোদার ভয় নেই, ঘোড়াটাকে এমন নির্দয়ভাবে মারছ?

ভোলা চাবুক মারা বন্ধ করল। কিন্তু তার চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল। যেন সে প্রকাশ করতে চাইল, এটা তার ঘোড়া-এটা নিয়ে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

ভোলিয়া, ব্যবসা কেমন চলছে এখন? জুগ্‌গা জিজ্ঞাসা করল। তার মনের চাপা ক্ষোভ কিছুটা মিটানোর জন্য।

খোদা দয়ালু, কোচোয়ান তার চাবুক আকাশের দিকে উঁচু করে বলল। তারপর সে যোগ করল, ইন্সপেক্টর সাহেবও খুব দয়ালু। আমরা বেঁচে আছি। কোন রকমে খাবার যোগাড় করছি।

যে সব লোক পাকিস্তান যেতে চাচ্ছে তাদের কাছ থেকে তুমি টাকা কামোচ্ছ না? টাকার জন্য কি জান দেব? ভোলা রাগ করেই জবাব দিল। না, তোমাকে ধন্যবাদ ভাই। তুমি যে পরামর্শ দিলে তা তুমি নিজের জন্যই রাখ। উন্মত্ত লোকগুলো যখন আক্রমণ করে তখন তারা কে হিন্দু আর কে মুসলমান দেখে না। তারা শুধু হত্যা করে। এই তো সেদিন চারজন শিখ সরদার জীপ গাড়িতে চড়ে একদল মুসলমান উদ্বাস্তুকে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সতর্ক না করেই তারা তাদের স্টেনগান থেকে গুলি ছুঁড়ল। চারটে স্টেন গান। একমাত্র খোদাই জানে তারা কয় জনকে হত্যা করেছে। আমার টাঙ্গায় যদি মুসলমান থাকত। আর উন্মত্ত জনতা যদি আক্রমণ চালাত, তাহলে কি হতো? তারা প্রথমে আমাকে খুন করত এবং পরে অন্যদের দেখত।

জীপের তলায় একটা কুকুর গিয়ে তা উল্টে দিল না কেন? ইকবাল রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করল।

সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। খিটখিটে স্বভাবের এই বাবুকে কি বলবে তা কেউ বুঝতে পারল না। জুগ্‌গা সহজভাবে বলল,

বাবুজি, আপনি কি বিশ্বাস করেন না, খারাপ কাজের ফল খারাপ হয়? এটা কর্মের ফল। একথা ভাইজি প্রায়ই বলতেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থে গুরু একই কথা বলেছেন।

হ্যাঁ, ষোল আনা ঠিক কথা, ইকবাল উপহাস করে বললেন।

ঠিক আছে। আপনি যে রকম মনে করেন, হাসতে হাসতে জুগ্‌গা বলল, আপনি সাধারণ লোকের সাথে একমত হবেন না। সে কোচোয়ানের দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমি

শুনেছি, অনেক মহিলাকে ধরে নিয়ে সস্তায় বিক্রি করা হচ্ছে। তুমি নিজের জন্য একটা বউ যোগাড় করে নিতে পারতে।

কেন সর্দার, তুমি তো বিনা পয়সায় একটা মুসলমান মেয়েকে পেয়েছ। আমি কেমন মরদ যে, একটা লুঠের মেয়েকে গ্রহণ করব? ভোলা জবাব দিল।

জুগ্‌গা অবাক হলো। তার রাগ বেড়ে চলল। ভোলার কথায় পুলিশরা চাপা হাসি হাসলেও জুগ্‌গাত্‌ সিং-এর দিকে তাকিয়ে তারা ঘাবড়ে গেল। ভোলা তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল।

কেন জুগিয়া, সে স্বাভাবিকভাবে বলল। তুমি অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা করছি, অথচ কেউ তার জবাব দিলে তুমি রাগ করছ।

আমার হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি না থাকলে তোমার শরীরের সব হাড় টুকরা টুকরা করে দিতাম, জুগ্‌গা বলল ক্রুদ্ধভাবে। তোমার কপাল ভালো যে, আমার হাত থেকে রেহাই পেলে। কিন্তু একথা তোমার মুখ থেকে দ্বিতীয়বার শুনলে আমি তোমার মুখ থেকে জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলব। জুগ্‌গা শব্দ করে থুথু নিক্ষেপ করল।

ভোলা রীতিমত ভয় পেল। রাগ করো না। আমি কি ...

বেজন্মা কোথাকার!

আলোচনার সমাপ্তি ঘটল। এখানেই। টাঙ্গায় সবাই নীরবে বসে রইল। ঘোড়াকে উদ্দেশ করে ভোলা যে সব কথা বলছিল, তা-ই কেবল নিস্তব্ধ নীরবতাকে ভেদ করে বেরিয়ে আসছিল। জুগ্‌গা ডুবে ছিল ক্রুদ্ধ চিন্তায়। সে অবাক হলো যে, তার গোপন অভিসার সাধারণ লোকের অগোচরে নেই। কেউ হয়ত তাকে দেখে ফেলেছে অথবা নূরান হয়ত এ নিয়ে কারও সাথে আলাপ করেছে। গুজবের সূত্রপাত হয়ত ওটাই। চন্দননগরের টাঙ্গা চালক যা জানে, মানো মাজরার সব লোক তা না জানার কোন কারণ নেই। যাদের নিয়ে এই গুজব, তারাই এ সম্পর্কে কিছু জানে না। সম্ভবত গ্রামে একমাত্র ইমাম বখশ ও তার মেয়ে নূরান এই গুজব সম্পর্কে কিছুই জানে না।

চন্দননগরে ঐ দলটি পৌঁছাল দুপুরের পরে। থানা চত্বরের বাইরে টাঙ্গা থামল। শহর থেকে কয়েক ফার্লং দূরে থানার অবস্থান। একটা গেটের নিচে দিয়ে রক্ষীরা বন্দীদের নিয়ে গেল। ঐ গেটের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা-স্বাগতম। তাদের প্রথম নিয়ে যাওয়া হলো রিপোর্টিং রুমে। হেড কনস্টেবল একটা মোটা রেজিস্ট্রার খুলে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় ঐ দিনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করলেন। টেবিলের সামান্য ওপরে দেওয়ালে টাঙ্গানো সম্রাট জর্জ (ষষ্ঠ)-এর ছবি। তার নিচে উরদুতে লেখা ঘুষ গ্রহণ অপরাধ। অন্য দেওয়ালে গান্ধীর একটা রঙিন ছবি, ক্যালেন্ডার থেকে কেটে নেয়া। এর নীচে লেখা একটি আদর্শের কথা সততাই উত্তম নীতি। দেওয়ালে আরও অনেকের ছবি আছে। এরা হলো পলাতক অসৎ চরিত্রের লোক এবং নিখোঁজ ব্যক্তি।

দৈনন্দিন ডায়েরিতে সব কিছু লিপিবদ্ধ করার পর বন্দীদের আঙ্গিনা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সেল-এর কাছে। ঐ থানায় মাত্র দু'টো সেল। এই সেলের আঙ্গিনা পুলিশ ব্যারাকের দিকে।

জুগ্‌গার উপস্থিতিতে থানায় যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল! ও জুগ্‌গা, তুমি আবার এলে। তুমি কি মনে কর, এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি? ব্যারাক থেকে একজন কনস্টেবল বলল।

হ্যাঁ, তাই। পুলিশের কন্যা সন্তানের সংখ্যা দেখে এটা ঠিক করেছি, জুগ্‌গাত্‌ সিং চিৎকার করে জবাব দিল।

বদমায়েশ কোথাকার! তুমি তোমার বদমায়েশি ছাড়লে না। আসুক ইনস্পেক্টর সাহেব। তিনি তোমার এ কথা শুনলে তোমার পাছায় শুকনা ঝালের গুড়া ঢেলে দেবেন।

জামাইয়ের সাথে তোমরা এ কাজ করতে পারবে না।

ইকবালের ব্যাপারে ঘটনা অন্য রকম। ক্ষমা চেয়ে তার হাতকড়া খুলে নেয়া হলো।

তাঁর সেলে একটা চেয়ার, একটা টেবিল ও একটা খাটিয়া দেয়া হলো। হেড কনস্ট্রেবল উর্দু ও ইংরেজী সব সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন যোগাড় করে ইকবালের সেলে পাঠিয়ে দিলেন। পিতলের থালায় ইকবালের খাবার দেয়া হলো। একটা কলসি ও একটা গ্লাস দেয়া হলো তাঁর সেলে। জুল্লার সেলে কোন আসবাব দেয়া হলো না। সত্যি কথা বলতে কি, তার খাবার ছুড়ে দেয়া হলো। রুটি সে হাতে নিয়েই খেল। লোহার বেষ্টনীর মধ্য থেকে সে হাত বাড়িয়ে দিলে একজন কনস্টেবল তাতে পানি ঢেলে দিল। সেই পানি খেয়ে সে তৃষ্ণ মেটাল। জুল্লার বিছানা হলো সিমেন্টের শক্ত মেঝে।

দু’জনের ক্ষেত্রে আচরণের এই বিভিন্নতায় ইকবাল বিস্মিত হলো না। যে দেশ কয়েক শতাব্দী ধরে জাতিভেদ প্রথা গ্রহণ করে নিয়েছে, সে দেশে সাম্যহীনতা একটা জন্মগত ধারণা। জাতিভেদ প্রথা আইন করে তুলে দেয়া হলেও শ্রেণী বৈষম্যের আবরণে ঐ প্রথা চালু থাকবে। পশ্চিমা ভাবধারায় সৃষ্ট দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে সরকারী কর্মকর্তাদের গাড়ি রাখার জায়গাও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে করা হয়। অনেক অফিসে প্রবেশ পথ শুধু উচ্চপদস্থ কর্মকতাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। প্রক্ষালণ কক্ষও তেমনিভাবে সিনিয়ার অফিসার, জুনিয়ার অফিসার, ক্লার্ক, স্টেনোগ্রাফার বা অন্যান্য পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত। শ্রেণীভিত্তিক এই মানসিক প্রস্তুতির কারণে একই অপরাধে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্তদের মর্যাদা দান বেখাপ্পা মনে হয় না। ইকবালকে দেয়া হলো প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা। আর জুগ্গাকে দেয়া হলো সবচেয়ে নিচের তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদা।

দুপুরের খাবারের পর ইকবাল চারপায়ের ওপর শুয়ে পড়লেন। জুগ্গার সেল থেকে নাক ডাকার শব্দ পেলেন। কিন্তু তিনি নিজে ঘুমাতে পারলেন না। তাঁর মনে বিক্ষোভের ঝড় বইতে লাগল। তাঁর মনটা যেন কোন ঘড়ির সূক্ষ্ম স্পিং-এর মতো, যা একবার স্পর্শ করলে কয়েক ঘণ্টা ধরে কম্পিত হতে থাকে। তিনি উঠে বসলেন। হেড কনস্টেবল যে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন রেখে গেছেন তা নাড়াচাড়া করলেন। সব পত্রিকাই যেন একই রকম। একই সংবাদ, একই বিবৃতি, একই সম্পাদকীয়। কেবল শিরোনামের শব্দের বিভিন্নতা ছাড়া সব কিছুই যেন একই লোকের লেখা বলে মনে হয়, এমন কি ছবিগুলোও একই রকম। হতাশ হয়ে তিনি পাত্রপাস্ত্রীর বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করলেন। এতে অনেক সময় চিত্তবিনোদনকারী কিছু থাকে। কিন্তু পাঞ্জাবের যুবকরাও যেন সংবাদপত্রের সংবাদের মতো একঘেয়েমিপূর্ণ। তারা ভাবী স্ত্রীর যে গুণ কামনা করে তা বৈচিত্র্যহীন। সবাই চায় কুমারী মেয়ে। যারা একটু উদার, তাদের অবশ্য বিধবাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই। তবে শর্ত হলো, নিঃসন্তান হতে হবে। প্রত্যেকে এমন মেয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেয় যে হবে লম্বা ও আকর্ষণীয় অথবা গৃহকর্মে নিপুণ। যারা একটু আধুনিক ও উদার, তাদের অবশ্য

জাতি বা যৌতুক কোন প্রতিবন্ধক নয়। ভাবী স্ত্রীর ফটো অনেকে চায় না। সৌন্দর্য বলতে তারা ফর্সা দেহকেই বোঝায়। অনেকে আবার ঠিকুজিসহ যোগাযোগ করতে বলে। জ্যোতিষী সামঞ্জস্য দেখে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করে। ইকবাল পত্রিকাগুলো ছুড়ে ফেললেন। সংবাদপত্রের মতো খারাপ আর কিছু নেই। অজন্তা গুহার প্রাচীর চিত্র নিয়ে একটা নিবন্ধ অবশ্যই থাকতে হবে। ইন্ডিয়ান ব্যালো নিয়ে কিছু একটা লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটা কিছু থাকা দরকার। প্রেম চাঁদের গল্প নিয়ে একটা নিবন্ধ। সিনেমা তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একাধিক লেখা। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ইকবাল আবার শুয়ে পড়লেন। সব কিছুতে তিনি হতাশা বোধ করলেন। তিন দিন তিনি ভালমতো ঘুমাতে পারেন নি। এটাকে আত্মত্যাগ বলে অভিহিত করা যায় কি না ভাবলেন। এমন চিন্তা অবাস্তব কিছু নয়। পাটিকে খবর পাঠানোর একটা উপায় তিনি অবশ্যই বের করবেন। তারপর সম্ভবত... তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন তাঁর গ্রেফতারের খবর ব্যানার হেড লাইনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মুক্তির খবরও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যে একজন বিজয়ী নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন-একথাও ঐ রিপোটে লেখা হয়েছে।

১.১২ সন্ধ্যার সময় একজন পুলিশ

সন্ধ্যার সময় একজন পুলিশ একটা চেয়ার নিয়ে ইকবালের কামরায় এলো।

এ সেলে কি আরও একজন আসছে? ইকবাল আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

না বাবুজি। ইন্সপেক্টর সাহেব। তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান। তিনি এখনই আসছেন।

ইকবাল কোন জবাব দিলেন না। চেয়ারটা ঠিক আছে কি না পুলিশটা পরখ করে দেখল। তারপর সে চলে গেল। বারান্দায় কারও কথার আওয়াজ পাওয়া গেল। এরপরেই ইন্সপেক্টর সাহেবেকে দেখা গেল।

ভিতরে আসতে পারি?

ইকবাল মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন।

ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন।

আমরা আপনার ভৃত্য, মিঃ ইকবাল। আপনি আমাদের আদেশ করবেন। আর আমরা তা পালন করব, ইন্সপেক্টর সাহেব মৃদু হেসে বললেন। অবস্থা অনুসারে গলার স্বর ও আচরণ পরিবর্তন করতে পারায় তিনি গর্ব অনুভব করলেন। এটাই কূটনীতি।

খুনের অভিযোগে আপনারা যাকে গ্রেফতার করেছেন তার সাথে এমন সদয় ব্যবহার করবেন। এটা আমার জানা ছিল না। খুনের অভিযোগে আপনারা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, তাই না? গতকাল পুলিশরা যে ট্রেনে মানো মাজরায় আসে, আমিও সেই ট্রেনে এসেছিলাম। একথা পুলিশ আপনাকে বলেনি বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

আমরা কোন অভিযোগ আনিনি। সেটা আদালতের ব্যাপার। সন্দেহবশত আমরা আপনাকে আটক করেছি। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীকে সীমান্ত এলাকায় থাকার অনুমতি আমরা দিতে পারি না। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব তখনও হাসছিলেন। আপনি যেখানকার লোক সেই পাকিস্তানে গিয়ে আপনি আন্দোলন করছেন না কেন?

এ কথায় ইকবাল খুবই রেগে গেলেন। কিন্তু তাঁর কথায় রাগের প্রকাশ না ঘটার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন।।

ইন্সপেক্টর সাহেব, পাকিস্তানের লোক বলতে আপনি সত্যি কি বোঝাতে চাইছেন??

আপনি মুসলমান। আপনি পাকিস্তানে চলে যান।

এটা নির্জলা মিথ্যা কথা, ইকবাল রাগে ফেটে পড়লেন। আপনি জানেন এটা মিথ্যা। আপনার নির্বুদ্ধিতা ঢাকা দেয়ার জন্য আপনি আমার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা খাড়া করেছেন।

ইন্সপেক্টর সাহেব উত্তরে বেশ কটু কথাই শোনালেন।

মিঃ ইকবাল, আপনার মুখ সামলে কথা বলা উচিত। আমি আপনার বাপের কামাই খাই না যে, আপনার কথায় আমি স্বীকার করে নেব যে, ঐ অভিযোগ মিথ্যা। আপনার নাম ইকবাল এবং আপনার খৎনা আছে। আমি নিজে আপনাকে পরীক্ষা করেছি। তাছাড়া মানো মাজরায় আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে আপনি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। অভিযোগ করার জন্য এটাই যথেষ্ট।

আদালতের জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। সংবাদপত্রের জন্যও এটা কোন বিষয় নয়। আমি মুসলমান নই-তাছাড়া এটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। আমি কেন মানো মাজরায় এসেছি তা আপনাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনারা যদি আমাকে ছেড়ে না দেন তাহলে আমি হেবিয়াস করপসের আবেদন করব এবং আদালতকে বলব, আপনারা কেমন কর্তব্য পালন করেন।

হেবিয়াস করপাস আবেদন? ইন্সপেক্টর সাহেব সহস্যে উচ্চারণ করলেন। ইকবাল সাহেব, আপনি বোধ হয়। অনেক দিন বিদেশে কাটিয়েছেন। এখনও আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। এখানে থাকলে আপনি সব কিছু বুঝতে পারবেন।

ইন্সপেক্টর সাহেব আকস্মিকভাবে সেল ত্যাগ করলেন। তাঁর সেলের লোহার গেটে

তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। পাশের সেলের দরজাটি ইন্সপেক্টর সাহেব খুললেন। এই সেলেই রয়েছে জুগ্গা।

শুভ দিন, ইন্সপেক্টর সাহেব।

ইন্সপেক্টর সাহেব ঐ অভিবাদনের জবাব দিলেন না।

তুমি কি তোমার বদমায়েশি আর কোনদিন ছাড়বে না।

হুজুর, আপনার যা খুশি তাই বলুন। কিন্তু এবার আমি নির্দোষ। গুরুর নামে শপথ করে বলছি, আমি নির্দোষ।

জুগ্গা মেঝোয় বসে আর ইন্সপেক্টর সাহেব দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডাকাতির রাতে তুমি কোথায় ছিলে?

ঐ ডাকাতির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, মূল প্রশ্ন এড়িয়ে জুয়া জবাব দিল। ডাকাতির রাতে তুমি কোথায় ছিলে? একই প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন ইন্সপেক্টর সাহেব।

জুগ্গা মেঝের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, আমি ক্ষেতে গিয়েছিলাম। ঐ রাতে পানি দেয়ার পালা ছিল আমার।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব বুঝলেন যে, সে মিথ্যা বলছে। পয়োনালীর লোককে এটা জিজ্ঞাসা করে নেয়া যাবে। তুমি যে গ্রামের বাইরে যাচ্ছ, এ কথা কি সরদারকে জানিয়েছিল?

জুগ্গা তার পা দু'টো সরিয়ে মেঝের দিকেই চেয়ে রইল।

তোমার মা বলল যে, তুমি ক্ষেতে গিয়েছিলে শুয়োর তাড়াতে। জুগ্গা পুনরায় তার পা সরিয়ে রাখল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে আবার বলল, এ ডাকাতির সাথে আমি জড়িত নই। আমি নির্দোষ।

ডাকাত কারা?

হুজুর, আমি কি করে জানব কারা ডাকাতি করেছে? ঐ সময় আমি গ্রামের বাইরে ছিলাম। তা না হলে মানো মাজরায় কেউ এসে ডাকাতি ও খুন করতে সাহস করত বলে আপনি মনে করেন?

কারা ডাকাতি করেছে? ভয় প্রদর্শন করে ইন্সপেক্টর সাহেব একই প্রশ্ন করলেন। আমি জানি তুমি তাদের চেনা। তারাও তোমাকে চেনে। তোমার জন্য তারা কাচের চুড়ি উপহার দিয়ে গেছে।

জুগ্গা উত্তর দিল না। পাছায় বেত না পড়লে বা মলদ্বরে লাল শুকনো ঝাল না ঢোকালে কি কথা বলবে না তুমি?

জুগ্গা আঁতকে উঠল। ইন্সপেক্টর সাহেব কি বোঝাতে চাইছেন তা সে জানে। একবার তার অভিজ্ঞতা হয়েছে। খাটিয়ার পায়ার নিচে হাত-পা রেখে তার ওপর ছয়-সাত জন পুলিশ বসে। অণ্ডকোষ মুড়িয়ে ও পিষে দেয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি যন্ত্রণাকাতর হয়ে জ্ঞান না হারায়। মলদ্বার দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে গুড়ো শুকনো ঝাল গলিয়ে দেয়া হয়। এর করুণ অনুভূতি কয়েক দিন পর্যন্ত থাকে। এর ওপর পানি বা খাবার দেয়া হয় না। ঝালযুক্ত খাবার ও অত্যধিক ঠাণ্ডা পানি লোহার গেটের বাইরে এমন জায়গায় রাখা হয় যা তার নাগালের বাইরে। এই স্মৃতির কথা স্মরণ করে সে আঁতকে উঠল।

না, সে বলল, খোদার দোহাই, না। সে মেঝের ওপর শুয়ে দু'হাত দিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরল। হুজুর দয়া করুন। এ ধরনের নম্রতা প্রকাশ করতে নিজের কাছেই তার লজ্জা করছিল। কিন্তু সে জানে যে, ঐ ধরনের শাস্তি সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নির্দোষ। গুরুর নামে শপথ করে বলছি, ঐ ডাকাতির সাথে আমি জড়িত ছিলাম না।

দীর্ঘদেহী ও বিরাট বপুর অধিকারী জুগ্গা তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেবের পা জড়িয়ে আছে, এ কথা ভাবতেই তাঁর গর্ব হলো। দৈহিক নির্যাতন সহ্য করে কেউ কথা বলেনি, এমন কাউকে তিনি দেখেন নি। এজন্য প্রয়োজন দৈহিক নির্যাতনের পদ্ধতি

সতর্কতার সাথে ঠিক করা। কেউ ক্ষুধায় কাতর হয়। ইকবালের মতো লোক পুলিশের সামনে বিবস্ত্র হতে চায় না। কেউ হয়ত হাত বাঁধা অবস্থায় মুখের কাছে মশার গুন গুন শব্দ শুনতে পারে না। কেউ অনিদ্রা সহ্য করতে পারে না। এসব শাস্তি পেলে সবাই প্রকাশ করে গোপন কথা।

ডাকাতদের নাম বলার জন্য আমি তোমাকে দু'দিনের সময় দিলাম। ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন। অন্যথায় ভেড়ার লেজের মতো না হওয়া পর্যন্ত তোমার পাছায় বেতমারা হবে।

ইন্সপেক্টর সাহেব জুগার হাত থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর এই আগমন ব্যর্থ হলো। তাঁকে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। দুই বিপরীতধর্ম লোককে নিয়ে কাজ করা সত্যি হতাশাব্যঞ্জক।

২.১ কলিযুগ

কলিযুগ

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মানো মাজরার দৈনন্দিন জীবনধারায় সময়সূচীর পরিবর্তন দেখা গেল। ট্রেনের যাতায়াত অনিয়মিত হলো, আবার অনেক ট্রেন রাতে যাতায়াত শুরু করল। অনেক সময় মনে হতো ঘড়ির এলার্ম যেন অসময়ে বাজছে! ঘড়িতে চাবি দেয়ার কথাও যেন আর কারও মনে থাকছে না। প্রথমে ডেকে দেয়ার জন্য ইমাম বখশ অপেক্ষা করে থাকেন মিত সিং-এর আহবানের জন্য। আবার ঘুম থেকে ওঠার জন্য মিত সিং অপক্ষো করে থাকেন মুয়াজ্জিনের আজানের অপেক্ষায়। সাধারণ লোকের ঘুম থেকে উঠতেই দেরি হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে না যে, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং মেইল ট্রেন হয়ত আর চলবে না। কখন খেতে হবে শিশুরা তা ভুলে গিয়ে যখন তখন খাবার খেতে চাইল। সন্ধ্যার দিকে সবাই সূর্য ডোবার আগে ঘরে ফিরে আসে এবং এক্সপ্রেস ট্রেন, যদি কখনও আসে, আসার আগেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে। মাল ট্রেনের যাতায়াত বন্ধ হয়েছে। ফলে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত আর হচ্ছে না। কিন্তু গভীর রাতে বা খুব ভোরে ভূতুড়ে ট্রেনের যাতায়াতে মানো মাজরার লোকের স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটতে শুরু করল।

এখানেই শেষ নয়। গ্রামের জীবনযাত্রায় আরও পরিবর্তন ঘটেছে। এক ইউনিট শিখ সৈন্য রেল স্টেশনের কাছে তাঁবু ফেলেছে। ব্রিজের কাছে সিগন্যাল খুঁটির পাশে তারা বালির ব্যাগ দিয়ে ছয় ফুট উচু নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে চতুর্দিক তাক করে মেশিনগান বসিয়েছে। সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছে স্টেশনে। গ্রামের লোকদের রেলিং-এর ভিতরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। দিল্লী থেকে আগত সব ট্রেন এখানে থামে। এসব ট্রেনের চালক ও গার্ড বদল করে ট্রেন পাকিস্তানের দিকে যায়। পাকিস্তান থেকে আগত ট্রেনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে।

একদিন সকালে পাকিস্তান থেকে একটা ট্রেন এসে মানো মাজরা স্টেশনে থামল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো, শান্তির সময় যে ধরনের ট্রেন যাতায়াত করত, এটাও সেই ধরনের ট্রেন। ছাদের ওপর কেউ বসে নেই। দুই বগির মধ্যে ফাঁকা জায়গায় কেউ বসে বা দাঁড়িয়ে নেই। পা-দানিতে দাঁড়িয়ে কেউ ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে না। কেমন যেন নতুন ধরনের ট্রেন! ট্রেনটা দেখলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। ভূতের মতো। প্লাটফরমে দাঁড়ানোর পর ট্রেনের শেষ দিক থেকে একজন গার্ড নেমে এসে সোজা স্টেশন মাস্টারের কামরার দিকে গেল। দুজন লোক সৈন্যদের ক্যাম্পে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে কথা বলল। এরপর সৈন্যদের ডাকা হলো এবং স্টেশনের আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল এমন লোকদের মানো মাজরায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। একজন লোককে মোটর সাইকেলে করে চন্দননগরে পাঠানো হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সাব- ইন্সপেক্টর সাহেব পঞ্চাশ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে স্টেশনে এলেন। তাদের আসার পর পরই হুকুম চাঁদ তাঁর আমেরিকান গাড়ি নিয়ে স্টেশনে হাজির হলেন।

দিনের বেলায় একটা ভূতুড়ে ট্রেনের আগমনকে কেন্দ্র করে মানো মাজরায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হলো। গ্রামের লোকেরা তাদের ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল স্টেশনে কি হচ্ছে। তারা শুধু দেখতে পেল স্টেশনের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত ভূতুড়ে ট্রেনের ছাদের কালো অংশ। স্টেশন বিল্ডিং ও রেলিং-এর জন্য ট্রেনের কিছু অংশ দেখা গেল না। মাঝে মাঝে দেখা গেল একজন সৈন্য বা পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছে আবার ভিতরে ঢুকছে।

বিকেলের দিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কিছু লোক ঐ ট্রেনটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারা সব পিপুল গাছের তলায় জমায়েত হলো এবং একে একে সবাই গুরুদুয়ারায় গিয়ে উপস্থিত হলো। মহিলারা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়েছিল কিছু সংবাদ সংগ্রহের আশায়। তারা যে সব কথা শুনেছে সেই সময় তারা তা বলেও এসেছিল। অতঃপর তারা সব জমায়েত হলো গ্রামের সর্দারের বাড়িতে। কিন্তু ট্রেন নিয়ে কোন সঠিক তথ্য জানতে না

পেরে তারা যে যার বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বাড়ির পুরুষদের আগমন অপেক্ষায়। তাদের কাছ থেকে যদি কিছু জানা যায়, এই আশায়।

মানো মাজরায় কোন অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে এ ধরনের চাঞ্চল্য দেখা যায়। মেয়েরা গিয়েছিল গ্রামের সর্দারের বাড়িতে। আর পুরুষরা গিয়েছিল গুরুদুয়ারায়। গ্রামে কোন স্বীকৃত নেতা ছিল না। গ্রামের সর্দার বানতা সিং ছিলেন একজন রাজস্ব সংগ্রাহক-ল্যামবরদার। কয়েক শতাব্দী ধরে এই পদটি তার পরিবারের লোকেরাই পেয়ে আসছে। অন্যের তুলনায় তার বেশি জমিজমাও নেই। অন্য কোন দিক থেকে সে কারও চেয়ে বড়ও নয়। এ পদের জন্য তার কোন গর্বও ছিল না। গ্রামের অন্য চাষীর মতো সে একজন পরিশ্রমী চাষী মাত্র। কিন্তু যেহেতু সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিশের লোক যে কোন বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করে, সেহেতু তার একটা সরকারী মর্যাদা আছে। এজন্য কেউ তার নাম ধরে ডাকে না। তার পিতা, দাদা, পরদাদা বা তার ওপরের দাদাকে লোকে যেমন লামবারদারা সাহেব বলে ডাকত, তাকে লোকে তেমনি সম্বোধন করে।

গ্রামের এই বৈঠকে মুখ খুললেন মসজিদের ইমাম বখশ ও ভাই মিত সিং! ইমাম বখশ একজন তাঁতী। পাঞ্জাবে তাঁতীদের নিয়ে ঠাট্টা করা হয়। তাদের মেয়েলি ও ভীতু স্বভাবের লোক বলে বিবেচনা করা হয় এবং বলা হয় তারা অসতী স্ত্রীর স্বামী। এদের মেয়েরা পরপুরুষের সাথে মেলামেশায় অভ্যস্ত। কিন্তু ইমাম বখাশের বয়স ও ধর্মপরায়ণতার কারণে সবাই তাকে সম্মান করে। তাঁর পরিবারে একাধিক দুঃখজনক ঘটনার কারণে সবাই প্রথমে তাঁকে সমবেদনা জানোত, এখন ভালবাসে। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মারা যায়। তাঁর চোখ কোন সময় ভাল ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তা এমনই খারাপ হয়ে যায় যে, সে তাঁত বুনতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সে পরিণত হয় ভিক্ষুকে। ছোট মেয়ে নূরানই তাঁকে দেখাশোনা করে। মসজিদেই সে দিনরাত পড়ে থাকে। আর মুসলমান ছেলেমেয়েদের কোরআন পড়া শেখায়। কোরআনের আয়াত লিখে সে গ্রামের লোকদের তাবিজ বানিয়ে দেয়। নানা রোগের জন্য পানিপীড়া দেয়। গ্রামের লোকেরা তাঁকে যে আটা, শাক-সবজি, খাবার, পুরান কাপড় দেয় তাতেই তাঁর ও তাঁর মেয়ের চলে। ইমাম বখশ খুব সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান ও প্রবাদ জানেন। গ্রামের চাষীরা এসব তাঁর কাছ থেকে শুনতে খুবই ভালবাসে। তাঁর চেহারা এমন কমনীয় যে, লোকে তাঁকে সম্মান করে। লম্বা পাতলা গড়ন। টাক মাথা। সাদা দাঁড়ি পরিপাটি করে ছাঁটা। মাঝে মাঝে তিনি তাতে মেহেদী রং লাগায়। চোখের ছানিতে একটা রহস্যময় দার্শনিকের অভিব্যক্তি ধরা পড়ে। ষাট বছর বয়স হলেও তাঁকে শক্ত সমর্থ দেখায়। সব কিছু মিলিয়ে তিনি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁর ধার্মিকতার সুনাম সবার কাছেই। গ্রামের লোকদের কাছে তাঁর পরিচিতি ইমাম বখশ বা মসজিদের মোল্লা নয়। চাচা হিসাবেই তিনি সবার কাছে পরিচিত।

মিত সিং-এর প্রতি লোকের অতটা শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল না। তিনি ছিলেন। একজন কৃষক। কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তিনি ধর্মকে বেছে নিয়েছেন। তার সামান্য কিছু জমি ছিল। তা তিনি বর্গা দেন। জমির সামান্য আয় এবং গুরুদুয়ারায় প্রাপ্ত নৈবদ্য দিয়ে তাঁর আরামেই চলে। তাঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে নেই। তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নন, বা ধর্মালোচনায় তার গভীর পাণ্ডিত্য নেই। তার চেহারাও তাঁর পেশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বেটে, মোটা ও লোমযুক্ত তাঁর দেহ। তাঁর বয়স ইমাম বখশর মতোই। কিন্তু ইমাম বখশের দাড়িতে যে পবিত্রতার ভাব দেখা যায়, মিত সিং-এর দাড়ি দেখতে তা মনে হয় না। মিত সিং-এর দাড়ি কালো, মাঝে মাঝে পাকা দাড়ি দেখা যায়। অপরিচ্ছন্নভাবেই তিনি থাকেন। তিনি যখন পবিত্র গ্রন্থ পড়েন তখনই মাথায় পাগড়ি বাঁধেন। অন্য সময় তিনি তাঁর লম্বা চুলে গিরে দিয়েই চলাফেরা করেন। তাঁর প্রায় অর্ধেক চুল ঘাড়ের ওপরই পড়ে থাকে। জামা তিনি প্রায় পরেনই না। তাঁর একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র হলো এক জোড়া হাফ প্যান্ট, তাও আবার তেল চিটাচিট ময়লা। কিন্তু মিত সিং শান্তিপ্রিয় মানুষ। ইমাম বখশের প্রতি তার যে ভালবাসা আছে তা আমলিন হয়নি কোন কারণে। ইমাম বখশ কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব দিলে তিনি তা

নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের বলার জন্য ব্যাকুল হন। তাঁদের আলোচনায় বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

গুরুদুয়ারায় অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকের পরিবেশ ছিল হতাশাজনক। সাধারণ লোকের বলার বিশেষ কিছু ছিল না। যারা কিছু বলছিল, তাদের কথার ধরন ছিল ভবিষ্যদ্বক্তার মতো। ইমাম বখশই আলোচনার সূত্রপাত করলেন, আল্লাহ দয়া করুন। আমাদের এখন দুঃসময়।

কয়েকজন লোক দুঃখের নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, হ্যাঁ এখন দুঃসময়।

মিত সিং আলোচনায় যোগ দিলেন। হাঁ। চাচা। এটা কলিযুগ, অন্ধকার যুগ।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। অস্বস্তির মধ্যে অনেকে নিজের নিতম্ব চুলকাতে লাগল। কেউ কেউ হাই তুলে মুখ বন্ধ করে খোদার কাছে প্রার্থনা জানাল, ইয়া আল্লাহু, ওয়া গুরু ওয়া গুরু।

সরদার সাহেব, ইমাম বখশ আবার শুরু করলেন, কি ঘটছে। আপনার তো জানা উচিত। ডেপুটি সাহেব আপনাকে ডেকে পাঠালেন না কেন?

আমি কি করে জানব চাচা? তিনি যখন ডাকেন তখনই আমি যাই। তিনি এখন স্টেশনে। সেখানে তো কাউকে যেতে দিচ্ছে না।

একজন যুবক গ্রামবাসী চীৎকার করে উল্লাসের ভঙ্গিতে বলল, আমরা এখনই মরে যাচ্ছি না। কি ঘটছে তা শীগগির আমরা জানতে পারব। এটা একটা ট্রেন ছাড়া তো আর কিছু না। এর মধ্যে হয় সরকারী মাল আর না হয় অস্ত্র আছে। এজন্য তারা পাহারা দিচ্ছে। তোমরা কি শোননি যে, অনেকের সব কিছু লুঠ হয়েছে?

চুপ করা, যুবকটির শাশ্রুমণ্ডিত পিতা ক্রুদ্ধভাবে তাকে তিরস্কার করল। যেখানে প্রবীণরা আছে, সেখানে তোমার কথা বলার প্রয়োজন কি?

আমি শুধু...

বাস্, আর কোন কথা নয়। দৃঢ়ভাবেই যুবকটির পিতা বলল। কিছু সময় আর কেউ কথা বলল না।

ইমাম বখশ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ধীর কণ্ঠে বললেন, আমি শুনেছি, ট্রেনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

উপস্থিত সকলের কাছে দুর্ঘটনা শব্দটি উৎকণ্ঠার উদ্রেক করল। হ্যাঁ, অনেক দুর্ঘটনার কথা আমিও শুনেছি, মিত সিং তাঁর কথার সমর্থন করলেন।

ইমাম বখশ যে বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, সেই বিষয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা কেবল খোদার দয়া প্রার্থনা করতে পারি।

খোদার দয়া প্রার্থনায় মিত সিং পিছনে পড়ে রইলেন এমন চিন্তা না করেই তিনি বললেন, ও গুরু, ও গুরু।

তারা সব চুপচাপ বসে রইল। মাঝে মাঝে ইয়া আল্লাহ, ও গুরু শব্দে নীরবতা ভঙ্গ হলো। তাই জমায়েতের বাইরে যে সব লোক ছিল, তারা মেঝের ওপরই ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একজন পুলিশ গুরুদুয়ারার সামনে এসে উপস্থিত হলো। সরদার ও অন্য চারজন লোক তাকে দেখে দাঁড়াল। যারা ঘুমিয়ে ছিল তাদের খোঁচা দিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করা হলো। যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল তারা চোখ মেলে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, কি ব্যাপার? কি হলো? অতঃপর তারা তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ি বেঁধে নিল।

গ্রামের সর্দার কে?

বানতা সিং দরজার কাছে এলেন। পুলিশ তাঁকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কিছু বলল। বানতা সিং ফিরে আসতেই পুলিশটি জোরে জোরে বলল, তাড়াতাড়ি, আধা ঘন্টার মধ্যেই। স্টেশনের মাঠে দু'টো আর্মি ট্রাক আছে। আমি ওখানেই থাকব।

পুলিশটা বেশ দ্রুততার সঙ্গেই স্থান ত্যাগ করল।

গ্রামের লোকেরা বানতা সিংকে ঘিরে ধরল। গোপন তথ্য জানতে পারায় তাঁকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে হলো। তাঁর কথায় কর্তৃত্বের ভাবও ফুটে উঠল।

তোমাদের ঘরে যে কাঠ ও বাড়তি কেরোসিন তেল আছে তা নিয়ে স্টেশনের কাছে ট্রাকের কাছে যাও। কাঠ ও তেলের জন্য তোমাদের টাকা দেয়া হবে।

গ্রামবাসী অপেক্ষা করে রইল কেন তারা ঐ কাজ করবে তা জানার জন্য। বানতা সিং কড়া সুরেই আদেশ দিলেন, তোমরা কি কালা? আমার কথা তোমরা শোন নি? না তোমরা চাও যে, তোমাদের না যাওয়ার জন্য পুলিশ তোমাদের পাছায় চাবুক মারুক? যাও, তাড়াতাড়ি কর।

গ্রামবাসীরা পরস্পরের সাথে ফিস ফিস করে কথা বলতে বলতে গ্রামের ছোট গলি পথের দিকে চলে গেল। সরদার নিজেও তাঁর বাড়ির দিকে ছুটলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা কাঠের বোঝা ও কেরোসিনের বোতল নিয়ে স্টেশনের পাশে এসে জমায়েত হতে শুরু করল। পাশাপাশি দু'টো বড় সামরিক ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কাঁচা দেয়ালের ধারে লাইন করে পেট্রোলের খালি টিন রাখা ছিল। সেখানে একজন শিখ সৈন্য স্টেনগান হাতে পাহারারত ছিল। অন্য একজন শিখ সামরিক অফিসার একটা ট্রাকের পিছন দিকে বসে পা দোলাচ্ছিলেন। তার দাড়ি পরিপাটি করে পাকানো। অন্য ট্রাকে কাঠ বোঝাই করা তিনি লক্ষ্য করছিলেন। গ্রামবাসীর সম্ভাষণে তিনি মাঝে মাঝে মাথা নত করছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সরদার। তিনি কে কতটা কাঠ এনেছে তা লিখে রাখছিলেন। ট্রাকে কাঠ ও খালি টিনে কেরোসিন তেল ঢালার পর গ্রামবাসীরা ঐ অফিসারের কাছ থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

ইমাম বখশ তাঁর মাথায় করে যে কাঠ এনেছিলেন তা ট্রাকে তুলে দিলেন। যে কেরোসিন তেল এনেছিলেন তা সরদারের হাতে দিলেন। মাথার পাগড়ি ঠিক করে বেঁধে নিয়ে তিনি উচ্চ স্বরে বললেন, সালাম সরদার সাহেব।

অফিসারটি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঈমাম বখশ পুনরায় বললেন, সবকিছু ঠিক আছে তো সরদার সাহেব?

অফিসারটি তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রুক্ষ মেজাজে বললেন, এখন যান। দেখছেন না আমি ব্যস্ত আছি।

ইমাম বখশ তখনও তাঁর পাগড়ি ঠিক করছিলেন। অফিসারের কথা শুনে তিনি মৃদু পায়ে গ্রামবাসীর দলে মিশে গেলেন।

দু'টো ট্রাক ভর্তি হওয়ার পর অফিসারটি বানতা সিংকে পরদিন সকালে টাকা নেয়ার জন্য ক্যাম্পে আসতে বললেন। ট্রাক দু'টো ধুলো উড়িয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

আগ্রহী গ্রামবাসীরা সরদারকে ঘিরে ধরল। তিনি অনুভব করলেন যে, ইমাম বখশকে যে অপমান করা হয়েছে তার জন্য তিনি কিছুটা দায়ী। তার নিচুপতার কারণে গ্রামবাসীরা অধৈর্য হয়ে পড়ল।

সরদার সাহেব, আপনি আমাদের কিছু বলছেন না কেন? আপনি কি মনে করেন যে, আপনি বড় একটা কিছু হয়ে গেছেন এবং সেজন্য আমাদের সাথে কথা বলছেন না, মিত সিং রাগের সাথেই বললেন।

না ভাই না। আমি কিছু জানলে তোমাদের কাছে বলব না কেন? তোমরা শিশুর মতো কথা বলছি। সৈন্য ও পুলিশের সাথে আমি কি করে তর্ক করব? তারা আমাকে কিছুই বলেনি। তোমরা দেখলে না, ঐ শুয়োরের বাচ্চাটা কিভাবে চাচার সাথে কথা বলল? প্রত্যেকের সম্মান তার নিজের হাতে। পাগড়ি খুলে দিয়ে আমি কেন নিজেকে অপমানিত করব?

ইমাম বখশ তাঁর বক্তব্যের সমর্থন করলেন, সরদার ঠিকই বলেছে। তোমার কথা বলার সময় কেউ যদি চিৎকার করে তাহলে চুপ থাকাই ভাল। চল বাড়ি ফিরে যাই। তোমাদের বাড়ির ছাদ থেকেই তোমরা দেখতে পাবে তারা কি করছে।

গ্রামবাসীরা তাদের নিজ নিজ ঘরে গিয়ে ছাদের ওপরে উঠে কিছু দেখার চেষ্টা করল। সেখান থেকেই স্টেশনের কাছে ক্যাম্পের ধারে ট্রাক দু'টো দেখা গেল। সেখান

থেকে ট্রাক দু'টো রেল লাইনের পাশ দিয়ে পূর্বদিকে গেল। ট্রেনের সিগনাল খুঁটি ছাড়িয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ট্রাক দু'টো রেল রাস্ত পার হয়ে আবার বাঁদিকে মোড় নিল। অতঃপর স্টেশনের দিকে এসে ট্রাক দু'টো ভূতুড়ে ট্রেনের পাশে হারিয়ে গেল।

সারা বিকাল ধরে গ্রামবাসীরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে এ ওকে জিজ্ঞস করল কেউ কিছু দেখতে পেয়েছে কিনা। এই উত্তেজনার মাঝে তারা তাদের দুপুরের খাবার তৈরি করতেও ভুলে গেল। মায়েরা তাদের শিশুদের আগের দিনের বাসি জিনিস খাওয়াল। ঘরের মাঝে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে মেয়ের ভুলে গেল। পুরুষরা ভুলে গেল তাদের গৃহপালিত পশুকে খাবার দিতে, এমন কি সুন্ধ্যা এগিয়ে এলেও তাদের দুধ দোহনের কথা স্মরণ হলো না। সত্যি সত্যি যখন ব্রিজের খিলানের নিচে সূর্য ডুবে গেল তখনই তাদের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন না করার কথা স্মরণ হলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসলেই শিশুরা খাবার খাওয়ার বায়না ধরবে। কিন্তু স্টেশনের দিকে তখনও দাঁড়িয়ে আছে মহিলারা। যদি কিছু দেখা যায়, এই আশায়। গোয়ালে গরু ও মহিষের ডাক শোনা গেল মাঝে মাঝে। কিন্তু পুরুষরা তখনও ছাদে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই আশা করছিল কিছু একটা ঘটার।

শেষে সূর্য ডুবে গেল ব্রিজের ওপারে। আকাশের সাদা মেঘ তামা, কমলা ও পাটল বর্ণ ধারণ করল। সন্ধ্যা গোধূলি এবং গোধূলি অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে আকাশের ঐ সব রং একটা ধূসর আভায় আচ্ছাদিত হলো। স্টেশনকে মনে হলো একটা কালো দেয়াল। ক্লান্ত হয়ে পুরুষ ও মেয়ের ছাদ থেকে ঘরের আঙ্গিনায় নেমে এলো। অন্যকেও তারা ছাদ থেকে নেমে আসার পরামর্শ দিল। নিজে বঞ্চিত থেকে অন্য কেউ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করুক, এটা কেউ চাইল না।

উত্তর দিকের আকাশে নীলাভ ধূসর আভা ক্রমেই কমলা রং ধারণ করল। ঐ কমলা রঙয়ের আভা প্রথমে তামাটে এবং পরে উজ্জ্বল পাটল বর্ণ ধারণ করল। অন্ধকার আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা উর্ধ্বমুখী দেখা গেল। গ্রামের ওপর দিয়ে মৃদু বায়ু বয়ে যেতে লাগল। এই বায়ুতে প্রথম ভেসে এলো কেরোসিন পোড়ার গন্ধ, তারপর কাঠ পোড়ার গন্ধ এবং সব শেষে ভেসে এলো মূর্ছা যাওয়ার মতো কটু মানুষ পোড়ার গন্ধ।

সমস্ত গ্রামটা মৃত্যুর নীরবতার মতো যেন নীরব হয়ে গেল। কেউ কাউকে কি ঘটছে তা জিজ্ঞাসা করল না। তারা সবাই বুঝতে পেরেছে। এ ধরনের ঘটনা তাদের কারও অজানা নেই। ট্রেনটা পাকিস্তান থেকে এসেছে, এ কথার মধ্যেই সবার অবগতির গূঢ় অর্থ নিহিত ছিল।

মানো মাজরার ইতিহাসে ঐ সন্ধ্যায় প্রথমবারের মতো খোদার প্রশংসা ধ্বনি ইমাম বখশের কণ্ঠে আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হলো না।

২.২ দুঃখজনক ঘটনার ছায়া

দিনের ঐ দুঃখজনক ঘটনার ছায়া রেক্ট হাউসেও রেখাপাত করল। সকাল থেকেই মিঃ হুকুম চাঁদ বাইরে ছিলেন। দুপুরের দিকে তাঁর আরদালি যখন ষ্টেশন থেকে রেক্ট হাউসে এসেছিল। চা-এর ফ্ল্যাক্স ও স্যাণ্ডুইস নিতে, তখন সে ষ্টশনে দাঁড়ানো ট্রেনের কথা বেয়ারা ও সুইপারকে বলেছিল। সন্ধ্যার দিকে তারা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা দূরে গাছের ওপরে অগ্নিশিখা দেখেছিল। ঐ অগ্নিশিখার আবছা! আভা ডাকবাংলোর খাকী রঙের দেয়ালেও দেখা গিয়েছিল।

দিনের কাজে হুকুম চাঁদ খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এই ক্লান্তি দৈহিক ছিল না। অসংখ্য লাশের দৃশ্য দেখে তিনি যেন বোবা হয়ে যান। কয়েক ঘণ্টা তাঁর সব অনুভূতি যেন একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেছে। তিনি দেখলেন, একের পর এক লাশ। পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা। ট্রেন থেকে তাদের বের করে নেয়া হচ্ছে কোন রকম সতর্কতা অবলম্বন না করেই, যেন বিছানাপত্র নামানো হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে তিনি নিজেকে হতভাগ্য মনে করতে শুরু করলেন। দুঃখিতও হলেন। গাড়ি থেকে নামার পর তাঁকে মনে হলো তিনি বিষাদগ্রস্ত ও উদভ্রান্ত। বেয়ারা, সুইপার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা তখনও ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখছিল। ছাদ থেকে নেমে বেয়ারা দরজা না খোলা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হলো। তাঁর গোসলের পানি দেয়া হয়নি। হুকুম চাঁদ নিজেকে অবহেলিত মনে করলেন। তাঁকে আরও বেশি হতাশাগ্রস্ত মনে হলো। চাকর-বাকরের সামনেই তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। একজন তাঁর জুতা খুলে দিয়ে পা টিপতে লাগল। অন্য একজন বালতিতে করে পানি এনে বাথটাব, ভরে দিল। আকস্মিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিছানা থেকে উঠে গোসলখানায় গেলেন।

গোসল ও কাপড় বদলের পর হুকুম চাঁদ যেন নতুন করে শক্তি ফিরে পেলেন। পাখীর মৃদু বাতাস বেশ ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক মনে হলো তাঁর। তিনি চোখের ওপর হাত রেখে আবার শুয়ে পড়লেন। বন্ধ চোখের সামনে ভেসে আসতে লাগিল ঐ দিনকার ঘটনার চিত্র একের পর এক। চোখ রগড়ে তিনি ঐ ঘটনার চিত্র মুছে ফেলতে চাইলেন। মানুষের চেহারা তাঁর দৃষ্টিতে প্রথমে কালো এবং পরে লাল হলো। কিন্তু চেহারাগুলো মিলিয়ে গেল না, তারা আবার ভেসে এলো তাঁর দৃষ্টিতে। একজন লোক নাড়ী-ভূড়ি ধরে আছে দু'হাত দিয়ে। তার চোখের ভাষায় ফুটে উঠেছে, দেখ, আমি কি পেয়েছি! ট্রেনের কামরার এক কোণে কয়েকজন মহিলা ও শিশু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে। ভয়ে ভীত চিহ্ন তাদের চেখের দৃষ্টিতে। তাদের মুখ খোলা। মনে হলো, তাদের প্রবল চিৎকার তখনই থেমে গেছে। অনেকের দেহে কোন আঁচড়ের দাগও নেই। কামরার আর এক পাশে বেশ কয়েকটা লাশ জানালার ধার ঘেষে পড়ে রয়েছে। তাদের চোখেও বিভীষিকার চিহ্ন। খোলা জানোলা দিয়ে হয়ত তাদের ওপরে এসে পড়েছে গুলি, বর্শা বা বড় পেরেক। ট্রেনের প্রক্ষালন কক্ষে বেশ কয়েকজন সবল যুবকের মৃতদেহ। তারা হয়ত নিরাপদ আশ্রয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। গলিত লাশ, প্রস্রাব-পায়খানার গন্ধে বমির উদ্রেক করে। এই চিন্তা হুকুম চাঁদের হওয়ায় তাঁরও বমির ভাব হলো।

তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ কৃষকের ছবি। তাকে মৃত বলেই মনে হচ্ছিল না। সে বিছানাপত্র রাখার র্যাকের ওপর শুয়েছিল। নিচে কি ঘটছে তা যেন সে গভীর মনোযোগের সাথে দেখছিল। তার কান থেকে দাড়ি পর্যন্ত জমাট বাঁধা রক্তের ধারার চিহ্ন দেখা গেল। হুকুম চাঁদ তার ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, বাবা, বাবা তাঁর ধারণা ছিল সে বেঁচে আছে। সে বেঁচেই ছিল। তার শীতল হাত অদ্ভুতভাবে এগিয়ে এসে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ডান পা জড়িয়ে ধরল। হুকুম চাঁদের দেহ থেকে যেন ঠাণ্ডা ঘাম বেরিয়ে এলো। তিনি চিৎকার করতে চাইলেন। পারলেন না। শুধু মুখ খুলতে সক্ষম হলেন। হাতটা পায়ের পাতা থেকে গোড়ালি এবং গোড়ালি থেকে হাঁটুতে এসে থামল। হাতটা জড়িয়ে ধরে আছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পা। হুকুম চাঁদ আবার চিৎকার করতে চাইলেন।

তাঁর চিৎকার গলায় এসে আটকে গেল। হাতটা ক্রমেই ওপরের দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁর মাংসল উরুর কাছে এসেই হাতটা হঠাৎ ঢিলে হয়ে পড়ল।

হুকুম চাঁদ গোঙাতে লাগলেন। তাঁর দেহটা যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো। তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তার দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তাঁর চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা গেল।

তাঁর পাশে একজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকেও ভীতিবিহ্বল মনে হলো।

আমি মনে করলাম সাহেব খুব ক্লান্ত, এ সময় তার পা টিপে দেয়া দরকার।

হুকুম চাঁদ কথা বলতে পারলেন না। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে বালিশের ওপর শুয়ে পড়লেন। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, হায় রাম, হায় রাম। তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেল এবং তিনি আরও ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেকে খুব দুর্বল ও নির্বোধ মনে করলেন। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, একটা শান্ত সমাহিত ভাব তার মধ্যে বিরাজ করছে।

হুইস্কি নিয়ে এসো।

বেয়ারা একটা ট্রের ওপর হুইস্কি, সোডা ও একটা গ্লাস নিয়ে এলো। মধুর রঙের মতো ঐ তরল পদার্থ দিয়ে হুকুম চাঁদ গ্লাসের চার ভাগের এক ভাগ ভরে দিলেন। গ্লাসের বাকি খালি অংশটা বেয়ারা সোড়া পানি দিয়ে ভরে দিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রায় এক চুমুকেই গ্লাসের অর্ধেকটা পান করে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। পেটে হুইস্কি পড়ার পর তাঁর শ্রান্ত স্নায়ুতন্ত্র যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। বেয়ারাটা আবার তাঁর পা টিপতে শুরু করল। তিনি কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে দেহটাকে একেবারে শিথিল করে দিলেন। তাঁর ক্লান্তি আনন্দঘন হয়ে উঠল। সুইপারটা বিভিন্ন কামরায় আলো জ্বলিয়ে দিল। হুকুম চাঁদের বিছানার পাশেই টেবিলের ওপর সে একটা ল্যাম্প রেখে দিল। একটা পতঙ্গ ল্যাম্পের কাচের চারদিকে ঘুরপাক দিয়ে কড়ি কাঠের দিকে উড়ে গেল। কয়েকটা টিকটিকি দেয়ালের অপর পাশ থেকে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে এলো। পতঙ্গটি টিকটিকির নাগালের বাইরে দেয়ালে আঘাত খেয়ে আবার চিমনির কাছে ফিরে এলো। টিকটিকিগুলো তাদের উজ্জ্বল কালো চোখ দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করল। পতঙ্গটি বার বার ওঠানামা করতে লাগল। হুকুম চাঁদ জানতেন যে, পতঙ্গটি কড়ি কাঠের কোন এক স্থানে এক সেকেন্ডের জন্য বসলেও টিকটিকিগুলো তাদের ছোট কুমিরের মতো চোয়ালের মধ্যে তাকে পুরে নেবে। সম্ভবত সেটাই তার পরিণতি। প্রত্যেকের পরিণতিই এই রকম। কেউ হাসপাতালে, কেউ বা ট্রেনে, আবার কেউ বা সরীসৃপের মুখে এই পরিণতির শিকার হয়। যেখানেই সে মরুক না কেন, পরিণতি সবার ক্ষেত্রে একই রকম। কেউ আবার বিছানায় থেকেও মৃত্যুবরণ করতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এবং চোখের পাতায় পোকা ওঠানামা ও মুখের ওপর টিকটিকি তাদের পাতলা চটচটে পেট নিয়ে ঘোরাফেরা না করা পর্যন্ত টেরই পাওয়া যায় না যে, সে মারা গেছে। হুকুম চাঁদ তাঁর দু'হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঘষে নিলেন। নিজের মন থেকে কে কবে পালাতে পেরেছে। তিনি গ্লাসের বাকি অংশ এক ঢেকে গিলে রূপান্তরিত হলেন অন্য এক মানুষে।

হুকুম চাঁদের কাছে মৃত্যু একটা বৃদ্ধ সংস্কার হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছে সব সময়। একটা মৃত সন্তান জন্ম দেয়ার পর তিনি তাঁর চাচিকে মারা যেতে দেখেছেন। তাঁর চাচির পুরো শরীরটাই যেন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে তাকে দেখা যায় মতিভ্রম অবস্থায়। তার পায়ের কাছে বিছানার পাশের দিকে লক্ষ্য করে তাকে পাগলের মতো হাত নাড়াতে দেখা গেছে। যেন মৃত্যুকে সে দূরে সরে যেতে বলছিল। মৃত্যুর আগে সে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। মৃত্যুর পর দেখা গেল তার দৃষ্টি দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ। এ দৃশ্য হুকুম চাঁদের মন থেকে কোনদিন মুছে যায়নি। যুবক বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে শবদাহ। মাঠে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছেন। তিনি দেখেছেন, ঐ মাঠে অমসৃণ বাঁশের খাটিয়ায় করে বিলাপ করতে করতে যুবক ও বৃদ্ধিকে আনতে। তারপর তাদের জেগেছে। মৃত্যুর তাৎক্ষণিক ভয়কে তিনি জয় করতে পারলেও

মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি যে মৃত্যু, এই ভাবনা তাঁর মনে স্থায়ী হয়ে আছে। এই ভাবনাই তাঁকে করে তুলেছে। দয়ালু, পরোপকারী ও সহনশীল। প্রতিকূল পরিবেশে প্রফুল্ল থাকার শিক্ষাও তিনি এই ভাবনা থেকে পেয়েছেন। শান্ত চিত্তে তিনি সন্তানের মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর অশিক্ষিত অনাকর্ষণীয় স্ত্রীকেও গ্রহণ করেছেন কোন অভিযোগ ছাড়াই। সব কিছুই তিনি মনে করেছেন যে, মানুষের মৃত্যুই হলো একমাত্র পরম ও চরম সত্য। অন্য সব কিছু, যেমন ভালবাসা, উচ্চাশা, গর্ব, সব ধরনের মূল্যবোধ ইত্যাদিকে গ্রহণ করা উচিত জীবনকে উপভোগ করার জন্য। এসব তিনি করেছেন স্পষ্ট চেতনা নিয়ে। তিনি উপহার গ্রহণ করেন এবং বন্ধুদের বিপদে তাদের সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি দুনীতিপরায়ণ নন। তিনি মাঝে মাঝে পার্টিতে যোগ দেন, গান ও নাচের আয়োজন করেন। কোন কোন সময় যৌন মিলনের আয়োজনও করেন। কিন্তু তিনি কামুক বা নীতিহীন নন। এসব কিছুর পরিণতি কি? এটাই হুকুম চীদের জীবন দর্শন এবং এটা নিয়েই তিনি সুন্দরভাবে বেঁচে আছেন।

কিন্তু ট্রেন ভর্তি লাশ। অদৃষ্টবাদী হুকুম চাঁদের জন্য এটা সহ্যের বাইরে। মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা তার সাথে তিনি বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক খুঁজে পেলেন না। যে প্রচণ্ডতা নিয়ে এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে তা স্মরণ করে তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হলেন। তার চাচির জিহবা কামড়ানো এবং মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ, শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে এলো ভয়ঙ্কর ভীতির ইঙ্গিত নিয়ে। হুইস্কির উত্তেজক ক্রিয়া তাঁকে এই ভয় থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক হলো না।

কামরাটি হঠাৎ করে গাড়ির হেড লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে পুনরায় আগের মতো অন্ধকার হয়ে গেল। গাড়িটাকে সম্ভবত গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হলো। হুকুম চাঁদ রাতের আগমনে বেশ সচেতন হয়ে উঠলেন। চাকর-বাকর সবাই শীঘ্র তাদের কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাথে রাতে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবে। বাংলোয় তিনি একাই থাকবেন। শূন্য কামরায় আরও থাকবে তাঁর সৃষ্ট মানুষের অপচ্ছায়া। না! না! তিনি তাঁর বেয়ারাকে ধারে কাছে কোথাও শুতে বলবেন। বারান্দায় থাকতে বলবেন? এতে তারা কি ধারণা করবে। তিনি ভয় পেয়েছেন? তিনি তাদের বলবেন যে, রাতে হয়ত তাদের প্রয়োজন হতে পারে। তাই তাদের ধারে কাছে থাকা দরকার। এতে তাদের ধারণার পরিবর্তন হতে পারে।

বেয়ারা!

সাহেব, তার দিয়ে তৈরী দরজা ঠেলে বেয়ারা এসে উপস্থিত হলো।

আজ রাতে আমার শোয়ার বিছানা কোথায় করলে?

সাহেবের বিছানা এখনও করা হয়নি। বেশ মেঘ আছে আকাশে, রাতে বৃষ্টিও হতে পারে। হুজুর কি বারান্দায় শোবেন আজ?

না, আজ আমি কামরায় শোব। ঘর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ছেলেটা এক-দুই ঘণ্টা পাখা টানবে। আরদালিদের বারান্দায় ঘুমাতে বল। রাতে তাদের জরুরী কাজে প্রয়োজন হতে পারে। হুকুম চাঁদ তাদের দিকে না তাকিয়েই কথা শেষ করলেন।

আচ্ছা সাহেব। তারা শুতে যাওয়ার আগেই আমি তাদের বলে দেব। এখন কি রাতের খাবার এনে দেব?

হুকুম চাঁদ খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

না। আমি রাতে খাব না। শুধু আরদালিদের বলে দাও তারা যেন রাতে বারান্দায় ঘুমায়। ওখানে ড্রাইভারকেও থাকতে বলে। বারান্দায় যদি জায়গা না হয় তাহলে তাদের পাশের কামরায় ঘুমাতে বলবে।

বেয়ারা বাইরে চলে গেলে হুকুম চাঁদ নিজেকে কিছুটা হালকা মনে করলেন। তিনি যে ভয় পেয়েছেন একথা কাউকে তিনি আঁচ করতে দেননি। তাঁর চারপাশে কথাবার্তা শুনতে পেলেন। তারা বারান্দায় স্থান নির্বাচন নিয়ে তর্ক করছে, দরজার কাছে বিছানা পাতা, পাশের কামরা থেকে ল্যাম্প আনা, খটিয়া পাতার জন্য অন্য আসবাব সরানো ইত্যাদি কর্মচাঞ্চল্য

হুকুম চাঁদকে আশ্বস্ত করল।

ঘরের মধ্যে আবার গাড়ির হেড লাইটের আলো চমকে উঠল। বারান্দার পাশেই গাড়ি থেমে গেল। হুকুম চাঁদ পুরুষ ও মহিলার গলা শুনতে পেলেন। এরপরই তিনি শুনতে পেলেন দরজায় ঘন্টাধ্বনি। তিনি বিছানার ওপর বসে তারের দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন সেই গায়িকার দলকে। একজন বৃদ্ধ মহিলা এবং অপরজন এক তরুণী। তাদের কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন।

বেয়ারা।

হুজুর।

ড্রাইভারকে বলো, সে যেন গায়িকার দলকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। চাকরবাকরদের বলো তাদের কোয়ার্টারে ঘুমাতে। দরকার হলে তাদের ডেকে পাঠাব।

এভাবে ধরা পড়ার জন্য হুকুম চাঁদ নিজেকে নির্বোধ ভাবলেন। চাকররা এ ঘটনায় নিশ্চয় হাসাহাসি করবে। কিন্তু এতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। তিনি গ্লাসে নিজেই কিছুটা হুইস্কি ঢেলে নিলেন।

বেয়ারা আসার আগেই তারা বাল্লান্দা ত্যাগ করতে শুরু করল। অন্য কামরার ল্যাম্পটাও সরিয়ে দেয়া হলো। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ির হেড লাইটও জ্বালালো। কিন্তু পরীক্ষণেই সুইচ অফ করে দিল। বৃদ্ধা মহিলাটি গাড়িতে না উঠে বেয়ারার সাথে তর্ক করতে শুরু করল। মহিলার গলা ক্রমেই বেড়ে চলল এবং তা যুক্তির সীমানা অতিক্রম করল। ঘরে গিয়ে সে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেই উদ্দেশ করে বলল:

খোদাবন্দ, আপনার জয় হোক!

হুকুম চাঁদ তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। যাও, তিনি চিৎকার করে বললেন। গত দিনের দেনা তোমাকে শোধ করতে হবে। যাও! বেয়ারা, ওকে তাড়িয়ে দাও!

মহিলার কণ্ঠ আর শোনা গেল না। সে দ্রুত গাড়ির মধ্যে এসে উঠল। গাড়ি যাত্রা শুরু করল। হুকুম চাঁদের বিছানার কাছে রইল কেবল একটা ল্যাম্প। তিনি উঠে ল্যাম্প ও টেবিলটা নিয়ে দরজার কোণায় রাখলেন। কয়েকটা পতঙ্গ ল্যাম্পের চিমনির চারপাশে ঘুরপাক খেল, কয়েকবার দেয়ালেও আঘাত খেলা। দেয়ালের ওপর থেকে টিকটিকি দেয়াল বেয়ে নেমে এলো ল্যাম্পের কাছে। একটা টিকটিকি গোপনে কিছু না জানার ভান করে লুকিয়ে ছিল। সুযোগ বুঝে সে পতঙ্গটাকে গালের মধ্যে পুরে নিল অতি সহজে। হুকুম চাঁদ পুরো ঘটনাটা দেখলেন উদাসীনভাবে।

দরজাটা মৃদুভাবে খুলে গেলো এবং বন্ধ হলো। একটা ছোট কালো মূর্তি কামরার মধ্যে প্রবেশ করল। মেয়েটির শাড়িতে রূপোর কাজ ছিল। ল্যাম্পের আলোয় তা ঝিকমিক করে উঠল এবং দেয়ালের ওপর একাধিক আলোর চিহ্ন দেখা গেল। হুকুম চাঁদ ফিরে তাকে দেখলেন। মেয়েটি তাঁর বড় বড় কালো চোখ দিয়ে তাঁকেই দেখছিল। তার নাকে একটা মুক্তা ছিল। সেটাও ঝিকমিক করে উঠল। সে খুব ভীত হয়ে পড়েছে মনে হলো।

এসেছ, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার হাত ধরে ডাকলেন। নিজের পাশে তার বসারও জায়গা করে দিলেন।

তাঁর হাত দিয়ে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তার উরু ও পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং অফুটন্ত স্তন নিয়ে খেলা করলেন। মেয়েটির কোন আবেগ দেখা গেল না। শক্ত হয়েই সে বসে রইল। হুকুম চাঁদ মেয়েটিকে একটু সরিয়ে দিয়ে ঘুম চোখে অস্পষ্টভাবে বললেন, এসো, শুয়ে পড়ি। ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে মেয়েটি সোজাভাবে শুয়ে পড়ল। শাড়ির ঝিকিমিকি আলো তার মুখেও প্রতিবিম্বিত হলো। শুদ্ধ মাটিতে পানি ছিটালে যে গন্ধ পাওয়া যায় তেমনি একটা সুগন্ধের পারফিউম সে ব্যবহার করেছিল। তার নিঃশ্বাসে ছিল এলাচির গন্ধ, বক্ষে মধু! হুকুম চাঁদ তার দেহের সাথে নিজেকে শিশুর মতো আটকিয়ে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলেন।

২.৩ বর্ষাকালের শুরু

বর্ষাকালের শুরু কথাটার অন্য শব্দ বৃষ্টি নয়। এর মূল আরবী শব্দের অর্থ ঋতু বা কাল। সেই হিসাবে বলা যায় গরমকাল, শীতকাল। কিন্তু গরমকালের পর দক্ষিণপশ্চিম বায়ু শুরু হলে যে মৌসুমের সৃষ্টি হয়। সেই মৌসুমকে বলা যায় বর্ষা ঋতু। শীতকালেও সাধারণত বৃষ্টি হয়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ঠাণ্ডা বৃষ্টির ধারা দেখা যায়। এতে মানুষ ঠাণ্ডা অনুভব করে এবং শীতে কাঁপতে থাকে। শস্যের জন্য শীতকাল উত্তম হলেও মানুষ এর সমাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে। সৌভাগ্যবশত এর স্থিতিকাল বেশি দিন থাকে না।

গ্রীষ্মকালের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পৃথক। এর আগে কয়েক মাস ধরে সব কিছু এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, বৃষ্টি আসলে গভীরভাবে এবং আরাম করে তা পান করে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে সূর্য ক্রমশ উত্তপ্ত হয় এবং বসন্তকাল বর্ষাকালের পথকে প্রশস্ত করে দেয়। ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়ে। সেখানে সৃষ্টি হয় ফুল গাছের। প্রথমে জঙ্গলে দেখা যায় কমলা রঙের আভাযুক্ত বৃষ্টি, কোরাল গাছের সিঁদুরে রং এবং বীজ থেকে উত্থিত সাদা শ্যামল পাতা। তারপর শ্যামল পাতার ওপর লাল রঙের পোকা, আড়ম্বরপূর্ণ গোলমোহর গাছ ও সোনালী জলপ্রপাতের মতো নরম সোদাল ফুলের গাছের সমারোহ। এসব গাছের ফুল একদিন ঝরে পড়ে। পাতাও ঝরে পড়ে। পাতা-ফুলহীন এসব গাছের ডালপালা আকাশের দিকে উত্থিত থেকে যেন পানির প্রত্যাশা করে। কিন্তু পানি পাওয়া যায় না। অতি ভোরেই সূর্য যেন পূর্ব আকাশে উঠে মাটি চুষে নেয়ার আগেই ভোরের শিশির বিন্দুকে শুকিয়ে নেয়। মেঘশূন্য ধূসর আকাশে সারা দিন ধরে সূর্য তার প্রখর কিরণ ছড়িয়ে দেয়। ফলে শুকিয়ে যায় কুয়া, স্রোতধারা ও হ্রদ। ঘাস ও ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল সূর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হয় এবং এক সময় তাতে আগুন ধরে যায়। এ আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং শুষ্ক বন পুড়ে ছাই হয়ে যায় দেশলাইয়ের কাঠির মতো।

দিনের পর দিন অবিরামভাবে সব কিছু ঝলসিয়ে দেয়ার ব্রত নিয়ে সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে। মাটিতে ফাটল দেখা দেয়। বড় বড় ফাটল হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন পানির প্রত্যাশা করে। কিন্তু পানি নেই কোথাও। শুধু দেখা যায় দুপুরে মরীচিকোসম হ্রদের ওপর কুজুটিকার ঝিকিমিকি আভা-এক দিক থেকে অন্য দিকে দ্রুত পালিয়ে যায়। গরিব গ্রামবাসীরা তাদের মৃতপ্রায় তৃষ্ণার্ত পশুগুলোকে বাইরে নিয়ে যায় পানি খাওয়ানোর জন্য। ধনী লোকেরা চোখে সানগ্লাস পরে। তারা প্রখর সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আঁশযুক্ত চিকের পিছনে আশ্রয় নেয়। পরিবেশকে ঠাণ্ড রাখার জন্য ঐ চিকে তাদের ভৃত্যরা পানি ঢেলে দেয়।

সূর্যের সাথে মৃদু বায়ুর যেন একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বাতাস গরম না হওয়া পর্যন্ত সূর্য তাতে তাপ দেয় এবং উত্তপ্ত বাতাসকে সূর্য পাঠিয়ে দেয় নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে। প্রশ্বর উত্তপ্ত আবহাওয়ায় এই লুহাওয়া কেমন যেন একটা আনন্দঘন অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়। এই গরমে ঘামাচি হয়। দেহ অলস হয়ে পড়ে এবং ঘুমে চোখ বুজে আসে। এমন সময় স্ট্রোকও হতে পারে। আর তা হলে এমন নিঃশব্দে জীবন প্রদীপ নিভে যায়। যেমন কীটা গাছে আটকানো একটা নরম আঁশ মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ে নিচে পড়ে যায়।

এরপর মিথ্যা প্রত্যাশার কাল। বাতাস কিছুটা ঠাণ্ডা হয়। লুহাওয়া অনুভূত হয় না। দক্ষিণ সীমান্ত বলয়ে দেখা যায় একটা কালো পাহাড় সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। মাথার ওপর শত শত ঘুড়ি ও কাককে উড়তে দেখা যায়। বৃষ্টি আসছে কি..? না, এটা ধূলিঝড়। আকাশ থেকে যেন বালি পড়তে থাকে। পঙ্গপালের দুর্ভেদ্য পাহাড় যেন সূর্যকে ঢেকে ফেলে। গাছে ও ক্ষেতে যা কিছু আছে, সব কিছুই তারা ধ্বংস করে দেয়। এর পরেই আসে ঘূর্ণিঝড়। একটা আঘাতেই বন্ধ দরজা ও জানালা খুলে যায়। বাতাসের ঘূর্ণায়মান গতির কারণে দরজা-জানালা বন্ধ হয়, আবার খুলে যায়। জানালা-দরজার কাঁচ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। খড় বা টিনের চাল নিমেষে কাগজের টুকরার মতো আকাশে উড়ে যায়। গাছ শিকড় সমেত উপড়ে পড়ে ইলেকট্রিক লাইনের তারের ওপর। ছেড়া তারে ছোঁয়া লাগার

কারণে মানুষ মারা যায়। বাড়িতে আগুনও লেগে যায়। এক বাড়ির আগুন ছড়িয়ে অন্য বাড়িতে লাগে। সব কিছু ঘটে যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী- এই শব্দ কটা উচ্চারণ করার আগেই সব ঘটনা শেষ হয়ে যায়। আকাশে ভাসমান ধুলো আস্তে আস্তে বই, আসবাবপত্র ও খাদ্যের ওপর পড়ে। চোখ, কান, গলা ও নাকের মধ্যেও ধুলো ঢুকে যায়।

বৃষ্টির আশা ত্যাগ না করা পর্যন্ত এ ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলল। তাদের মোহমুক্তি ঘটল। তারা তৃষ্ণার্ত, ঘর্মাক্ত ও বিষন্ন হয়ে পড়ল। তাদের ঘাড়ের ওপর ঘামাচিকে মনে হয় শিরিশ কাগজের মতো। এ সময় তাদের সান্ত্বনা পাওয়ার মতো আরও একটা ঘটনা ঘটল। সর্বত্র বিরাজ করল বিস্ময়কর নীরবতা। এ সময় শোনা গেল এক ধরনের পাখির অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ডাক। জঙ্গলের শীতল বাসা থেকে এ পাখি এখন সূর্যের আলোয় এলো কেন? ক্লান্ত দৃষ্টিতে লোকে জীবনহীন আকাশের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, ঐ পাখির সাথে তার একটা সাথীও আছে। পাখি দু'টো দেখতে সাদা-কালো বুলবুল পাখির মতো, তাদের আছে উদ্ধত কুঁটি ও লম্বা লেজ। লোমশ ভরা উদ্ধত কুঁটির এই কোকিল উড়ে এসেছে সুদূর আফ্রিকা থেকে, বর্ষা আসার আগেই। কিছুটা কি ঠাণ্ডা বাতাস অনুভূত হচ্ছে না? বৃষ্টি ভেজা সঁ্যাতসেতে মাটির গন্ধ কি পাওয়া যাচ্ছে না? মেঘের গর্জনে কি পাখির ডাক মিলিয়ে যাচ্ছে না? আকাশের অবস্থা দেখতে লোকেরা দৌড়ে ছাদে চলে গেল। একই ধরনের কালো মেঘ পূর্ব দিক থেকেও ভেসে আসতে দেখা গেল। এক ঝাক বক মেঘের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। এক ঝলক বিদ্যুতের চমকে দিনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। কালো মেঘের একটা আস্তরণ সূর্যের নিচ দিয়ে ভেসে গেল। ঘন ঐ মেঘের ছায়া বেশ স্পষ্টভাবেই এসে পড়ল মাটির ওপর। আর একবার বিদ্যুতের ঝালকানি এবং তার পরেই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পানি শুকনো মাটিতে পড়েই শুকিয়ে গেল। শুকনো মাটিতে বৃষ্টি পড়ার পর বৃষ্টিভেজা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। আর একবার বিদ্যুতের ঝলক এবং ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো মেঘের ডাক। অবশেষে বৃষ্টি এলো। যেন বিস্তীর্ণ জলরাশি, ঢেউয়ের পরে ঢেউ। লোকগুলো মেঘের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রবল বৃষ্টির ফোঁটায় সারা দেহকে ভিজিয়ে নিল। স্কুল ও অফিস বন্ধ হলো। সব কাজ থেমে গেল। পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা পাগলের মতো রাস্তায় ছোটাছুটি করল। হাত তুলে হো হো শব্দ করে আনন্দ প্রকাশ করল।

বর্ষাকালের বৃষ্টি সাধারণ বৃষ্টির মতো নয় যে, এলো আর গেল। একবার বৃষ্টি শুরু হলে তা দুমাস বা তার বেশি সময় ধরে থাকে। বর্ষার বৃষ্টি সাদরে গৃহীত হয়। দলে দলে লোক বনভোজনের জন্য বেরিয়ে পড়ে, আমগাছের নিচে পাথর ও পাতার ওপর খড়কুটো বিছিয়ে দেয়। গাছের ডালে চড়ে মহিলা ও শিশুরা দোল খায়। সারাটা দিন খেলা করে, গান গেয়ে কাটিয়ে দেয়। ময়ূরাগুলো পেখম তুলে সদর্পে তার সঙ্গীদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। ওদের তীক্ষ্ণ চিৎকার বনে প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পর উৎসাহের এই প্রাবল্যে ভাটা পড়ে। বিস্তীর্ণ এলাকা কাদা ও জলাভূমিতে পরিণত হয়। কুয়ো ও জলাশয় পানিতে পূর্ণ হয়ে ছাপিয়ে পড়ে। শহর এলাকার নর্দমা বন্ধ হয়ে পানির স্রোত উপচে পড়ে রাস্তার ওপর। গ্রামে মাটির দেয়াল দেয়া কুঁড়েঘর পানিতে গুলো গিয়ে ঘরের চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘরের বাসিন্দাদের ওপর। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তাপে বরফ গলা শুরু হলেও বর্ষার সময় নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা ঘটায়। রাস্তা, রেললাইন, পুল পানির নিচে চলে যায়। নদী তীরের ঘর-বাড়ি নদীতেই বিলীন হয়ে যায়।

বর্ষার মৌসুমে জীবন-মৃত্যুর প্রবাহও বৃদ্ধি পায়। প্রায় এক রাতেই জমিতে ঘাস গজায়, পাতাহীন গাছ ধারণ করে সবুজ রং। সাপ, বিছা, কাঁকড়া এমনিতেই জন্মে যায়। কেঁচো, গুবরে পোকা এবং ছোট ছোট ব্যাঙ মাটিতে ছড়িয়ে থাকে এলোমেলোভাবে। রাতে অসংখ্য পতঙ্গ আলোর চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। খাবার জিনিস ও পানিতে তাদের উপস্থিতি দেখা যায়। পেট না ভরা পর্যন্ত টিকটিকি নানা ধরনের পতঙ্গ গিলতে থাকে এবং এক সময় তা সিলিং থেকে মেঝোয় পড়ে যায়। ঘরের মধ্যে মশার গুন গুন ধ্বনি মানুষকে পাগল করে

দেয়। এসব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লোকে কীটনাশক ছিটায়। ফলে মৃত পতঙ্গের স্তুপ পড়ে যায় মেঝের ওপর। পরদিন সন্ধ্যায় আলোর চারপাশে একই ধরনের পতঙ্গের উপস্থিতি দেখা যায়। আগুনের শিখায় ভোরা মৃত্যুকে বরণ করে।

বর্ষাকালে কোন আগাম নোটিস না দিয়েই বৃষ্টি শুরু হয় এবং তা আবার থেমে যায়। আকাশে মেঘ উড়ে বেড়ায়। হিমালয়ে যাওয়ার আগে ঐ মেঘ সমতল ভূমিতে খুশিমতো বৃষ্টি ঝরায়। পর্বতে ওঠার সময় মেঘ শীতল হওয়ার পূর্বে শেষতম পানির বিন্দুটিও ধারায় ফেলে দেয়। বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গর্জন অবশ্য কখনও শেষ হয় না। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় আগস্টের শেষে বা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে। এরপর বর্ষাবিদায় নেয় শরৎ মৌসুমের জন্য।

অবিরাম মেঘের গর্জনে হুকুম চাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি চোখ খুললেন। কামরার মধ্যে দেখলেন ধূসর আলো। ঘরের কোণায় একটা ল্যাম্প জ্বলছিল মিট মিট করে। চিমনি থেকে যে আলো বিজুরিত হচ্ছিল তা পুরো ঘরকে আলোকিত করার মতো যথেষ্ট ছিল না। একবার বিদ্যুতের ঝলকানি এবং ভার পরে মেঘের গর্জন শোনা গেল। ঘরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল ঠাণ্ড ও ভেজা বাতাস। বাতাসের ঝাপটায় আলোর শিখা কেঁপে উঠে নিভে গেল। ছন্দায়িত শব্দে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে লাগল। অবিরামভাবে।

বৃষ্টি। অবশেষে সত্যি বৃষ্টি এলো। ভাবলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। বর্ষার এ মৌসুমে বৃষ্টি হয় নি। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে কিন্তু তা ছিল অনেক ওপরে। তাও আবার জমাট বাঁধা মেঘ নয়। ফলে তা সহজেই বাতাসে উড়ে গেছে। তৃষ্ণার্তা পৃথিবী আরও তৃষ্ণার্ত হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি শুরু হওয়ার অর্থ বৃষ্টি খুব দেরিতে হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই এই বৃষ্টিকে সবাই স্বাগত জানিয়েছে। এই বৃষ্টির সুবাস ভাল, এর শব্দ ভাল, একে দেখতেও ভাল এবং সর্বোপরি এর উপকারিতা অনেক ভাল। কিন্তু সত্যি কি ভাই? হুকুম চাঁদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেল। মৃতদেহগুলো! হাজারখানেক মৃতদেহ পোড়ানোর শব্দ ও আগুনের ধোঁয়া বৃষ্টির পানিতে নিভে গেল। তাঁর কাছ থেকে মাত্র শত গজ দূরেই রয়েছে মৃতদেহগুলো। তাঁর কপালে ঘাম দেখা দিল। তিনি শীত অনুভব করলেন। ভয়ও পেলেন। বিছানার অপর পারে গিয়ে দেখলেন, মেয়েটিও নেই। বাংলোয় তিনি একই ছিলেন। বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি নিয়ে ডায়ালের ওপর গোল করে হাত রাখলেন। রেডিয়াম দেয়া ঘড়ির কাটায় তখন সাড়ে ছটা বাজার নির্দেশ করছে। তিনি অনেক সময় বিশ্রাম নিয়েছেন। বেশ আগেই সকাল হয়েছে। আকাশ হয়ত মেঘে ঢাকা, তাই অনুমান করা যায়নি। বারান্দায় কে যেন একজন কেশে উঠল। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসলেন।

তাঁর মাথা ব্যথা করছিল। চোখ বন্ধ করে তিনি দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলেন। আস্তে আস্তে মাথা ব্যথার উপশম হলো। তিনি হুইস্কি পান করেছিলেন অনেক, কিন্তু খাবার কিছুই খাননি। কয়েক মিনিট পরে চোখ খুলে তিনি কামরার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন ঐ মেয়েটিকে। সে চলে যায়নি। হাতলযুক্ত বড় বেতের চেয়ারটায় সে ঘুমিয়ে রয়েছে, তার গায়ে জড়ানো জরি দেয়া কালো শাড়ি। হুকুম চাঁদ নিজের কাছেই অপরাধী বোধ করলেন। মেয়েটি দু'টো রাত এখানেই আছে এবং দু'টো রোতই সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ঐ বেতের চেয়ারটায়। প্রায় মড়ার মতো পড়ে আছে সে। শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে বুকটা ওঠানামা করছে। তাঁর মনে হলো তিনি বৃদ্ধ এবং অপবিত্র। এই বালিকার সাথে তিনি কিভাবে ঐসব কাজ করতে পেরেছেন ঃ তাঁর মেয়ে বেঁচে থাকলে সেও প্রায় ঐ বয়সের হতো। স্বীয় অপরাধের জন্য তাঁর অনুশোচনা হলো। তিনি এ কথা জানেন যে, তাঁর এই অনুশোচনা ও উত্তম সিদ্ধান্ত বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সম্ভবত তিনি আবার মন্দ পান করবেন, ঐ মেয়েকেই তিনি কাছে ডাকবেন, তার সাথেই রাত কাটাবেন এবং সেজন্য আবার দুঃখ প্রকাশ করবেন। এটাই জীবন এবং এটাই হতাশা।

তিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপর রাখা এ্যাটাচি কেসটা খুললেন।

এ্যাটাচি কেসের ঢাকনার ভিতর দিকে লাগানো আয়নায় তিনি নিজেকে ভাল করে দেখলেন। দুচোখের কোণায় তিনি দেখলেন হলদে রঙের পিচুটি। মাথার চুলের গোড়া সাদা ও বেগুনি রং ধারণ করেছে। শৌভ না করা থুতনির নিচে দেখা গেল মাংসের কয়েকটি ভাঁজ। সত্যি তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, দেখতেও তেমন সুশ্রী নন। তিনি। জিহ্বা বের করে দেখলেন। জিহ্বার মাঝ থেকে ওপরের দিকে দেখা গেল ফ্যাকাশে হলুদ রঙের আভা। জিহ্বার অগ্রভাগ থেকে কয়েক ফোঁটা পানি টেবিলের ওপর এসে পড়ল। তিনি নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধও অনুভব করলেন। মেয়েটির নাসিকা গর্জনও শুনলেন তিনি। তার নাসিকা গর্জনে বিস্ময়ের কিছু নেই। সারা রাত সে একটা চেয়ারে ঘুমিয়েছে, চেয়ারটা আরামদায়কও নয়। যকৃতের জন্য উপকারী লবণ জাতীয় ওষুধের একটা বোতল বের করে হুকুম চাঁদ বড় চা চামচের কয়েক চামচ, ওষুধ একটা গ্লাসে ঢাললেন। থার্মোফ্লাস্কের মুখ খুলে গ্লাসে পানি ঢাললেন। গ্লাসে পানি ঢালার সাথে সাথে বুদ্ধদে গ্লাস ভরে উপচে তা টেবিলের ওপর পড়ল। বুদুন্দ পানিতে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন এবং তারপর পুরো গ্লাসের ওষুধ পান করলেন। কিছু সময় ধরে তিনি মাথা কাত করে দাড়িয়ে রইলেন। টেবিলের ওপর হাত দু'টো ফেলে রাখলেন আলতোভাবে।

লবণাক্ত ঐ ওষুধ পান করে তিনি বেশ আরাম বোধ করলেন। বড় রকমের একটা ঢেঁকুর তোলার পর তাঁর আরামের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। মাথা ধরা ও ঘাড়ের ওপর চিন চিনা করে যে ব্যথা করছিল তাও আস্তে আস্তে সেরে গেল। এখন দরকার কয়েক কাপ গরম চা। তারপর তিনি তাঁর পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে পারবেন। হুকুম চাদ বাথরুমে গিয়ে খোলা দরজার দিকে মুখ বাড়িয়ে বেয়ারার উদ্দেশে বললেন:

শোভিংয়ের পানি নিয়ে এসো। এখানেই নিয়ে এসো।

বেয়ারা আসলে হুকুম চাদ চায়েন্ন ট্রে ও শোভ করার জন্য গরম পানির মগটা বেড়ারুমে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। নিজে এক কাপ চা ঢাললেন এবং শেভিং করার জিনিসপত্র বের করলেন। তিনি থুতনিতে শোভিংক্রিম ঘষে শেড় করার সময় দুএক চুমুক চা পান করলেন। চায়ের কাপে চামচের শব্দ মেয়েটির ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটোল না। মুখটা সামান্য হয় করে সে ঘুমিয়ে রইল। তাকে প্রায় মড়ার মতোই দেখাচ্ছিল। শুধু নিশ্বাস নেয়ার সময় বুকটা উঁচু হচ্ছিল সামান্য। মনে হচ্ছিল তার স্তন দু'টো বডিসের খালি অংশ পূরণ করার লক্ষ্যে ওপরের দিকে উঠছিল। কিন্তু বৃথা তার ঐ চেষ্টা। তার সারা মুখে চুল এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। প্রজাপতির মতো দেখতে একটা চুলের ক্লিপ পড়ে রয়েছে চেয়ারের পায়ার কাছে। তার শাড়ির ভাঁজ এলোমেলো, শাড়িতে লাগানো চুমকি ছড়িয়ে রয়েছে মেঝের ওপর। হুকুম চাঁদ যখন চায়ে চুমুক দিতে দিতে শেভ করছিলেন, তখন মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। ঐ মেয়ের জন্য নিজেকে তৈরি করা ছাড়া তিনি আর কিছু চিন্তা করতে পারছিলেন না। মেয়েটি যদি চায় তিনি তার সাথে ঘুমিয়ে থাকুন তাহলে তিনি তাই করবেন। এই চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলন। মেয়েটির যোগ্য করে তুলতে তাকে আকুণ্ঠ পান করতে হবে।

বারান্দায় কাশি ও পায়ের শব্দে হুকুম চাঁদের চিন্তা ভঙ্গ হলো। ঐ কাশি ছিল হুকুম চাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং ঐ কাজটা করলেন একজন সাবইন্সপেক্টর। হুকুম চাদ, চাপান শেষ করে কাপড় নিয়ে ঢুকলেন বাথরুমে, পোশাক পরিবর্তনের জন্য। কিছুক্ষণ পর বাথরুমের অন্য দরজা দিয়ে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব, খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি তাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে স্যালুট করলেন।

স্যার, এই বৃষ্টির মধ্যে, আপনি কি বাইরে হাঁটতে বেরুচ্ছেন?

না না। আমি সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ঐ দিকটা একবার ঘুরে এলাম। বেশ সকালেই আপনি এলেন। আমার মনে হয় সব কিছুই ঠিক আছে।

এ সময় বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। কোথাও শান্তি নেই। একটার পর একটা গণ্ডগোল লেগেই আছে...।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হঠাৎ করে মনে পড়ল ঐ মৃতদেহগুলোর কথা।

রাতে কি বৃষ্টি হয়েছিল? রেল স্টেশনের পাশে সব কাজ কি ঠিকমত হয়েছে?

সকালে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময় আমি ওখানে ছিলাম। সব কিছু পুড়ে যেতে বেশি কিছু বাকি নেই। ছাইয়ের একটা বড় টিবি দেখা যায়, ওতে কিছু হাড় পুড়তে এখনও বাকি আছে। এখানে ওখানে কিছু মাথার খুলি ছড়িয়ে আছে। এসব নিয়ে এখন কি করা যায় বুঝতে পারছি না। গ্রামের মাতব্বরকে অবশ্য নির্দেশ দিয়েছি কাউকে যেন ব্রিজ বা স্টেশনের কাছে যেতে না দেয়া হয়।

কতগুলো মৃতদেহ পুড়িয়েছেন? আপনি কি গুণে দেখেছেন?

না স্যার। শিখ অফিসারটি বলছিল এক হাজারের বেশি মৃতদেহ ছিল। আমার মনে হয়, একটা বগিতে যে কজন লোক বসতে পারে তার ভিত্তিতে সে ঐ হিসাব করেছে। ট্রেনের ছাদ, পাদানি ও দুই বগির মাঝে যারা ছিল তাদের সংখ্যা চার-পাঁচ শ হবে বলে সে বলেছে। আক্রমণের সময় তারা পড়ে গেছে বলে তার ধারণা। ছাদে শুকনো রক্তের দাগ আছে।

হরে রাম, হরে রাম। পনেরো শ নির্দোষ লোক। কলিযুগ আর কাকে বলে? দেশে একটা দুঃখজনক অধ্যায়ের সূচনা হলো। সীমান্তের এটা মাত্র একটা স্থান। অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটছে বলে আমার ধারণা। আমার বিশ্বাস, আমাদের লোকেরাও এ ধরনের কাজ করছে। আশপাশের গ্রামের মুসলমানদের অবস্থা কেমন?

ঐ কথা আমি আপনাকে জানাতে এসেছি স্যার। কয়েকটা গ্রামের মুসলমানরা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে যেতে শুরু করেছে। চন্দননগর থেকে কিছু মুসলমানকে সরানো হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র বেলুচি ও পাঠান সৈন্য ভর্তি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লরি তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানো মাজরা গ্রামের মুসলমানরা এখনও গ্রামে। আছে। আজ সকালে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একদল শিখ সীমান্তের নদী অতিক্রম করে গ্রামে এসে পৌঁছেছে। তাদের গুরুদুয়ারায় আশ্রয় দেয়া হয়েছে বলে গ্রামের সর্দার আমাকে জানিয়েছে।

ওদের এখানে থামতে দেয়া হলো কেন? হুকুম চাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো ভাল করেই জানেন যে, আগত উদ্বাস্তুদের অবশ্যই জলন্ধর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে। এটা খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। ওরা মানো মাজরায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিতে পারে।

না স্যার। অবস্থা এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আছে। ঐ উদ্বাস্তুরা পাকিস্তানে খুব বেশি কিছু হারায় নি এবং বাহ্যত তারা পথে হয়রানির শিকার হয়নি। মানো মাজরার মুসলমানরা গুরুদুয়ারায় তাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছে। যাদের আত্মীয়স্বজন গণহত্যার শিকার হয়েছে তাদের কেউ এলে পরিস্থিতি অবশ্য ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়াবে। সীমান্তের নদী হেঁটে পার হয়ে উদ্বাস্তু আসতে পারে, একথা আমার মাথায় আসেনি। সাধারণত বর্ষার সময় নদী প্রায় এক মাইল চওড়া হয়ে যায়। নভেম্বরডিসেম্বর মাসের আগে কেউ হেঁটে নদী পার হওয়ার চিন্তা করে না। এ বছর বৃষ্টি প্রায় হয়নি। নদীর কয়েকটা পয়েন্ট থেকে হেঁটে পার হওয়া যায়। নদী-সীমান্ত পাহারা দেয়ার মতো যথেষ্ট পুলিশ আমার কাছে নেই।

হুকুম চাঁদ ডাকবাংলোর সামনে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। ছোট ডোবাগুলো বৃষ্টির পানিতে ভরে গেছে। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ধূসর হয়ে আছে।

ঠিক আছে। বৃষ্টি হতে থাকলে নদীর পানি বেড়ে যাবে এবং লোকে আর নদী অতিক্রম করতে পারবে না। ব্রিজের কাছে বসেই শরণার্থীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ কলা যাদি।

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি এবং তার পরেই মেঘের ডাক। বৃষ্টির ধারাও যেন বেড়ে গেল। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছিটেফোঁটা বারান্দায় এসে পড়ল।

এই এলাকা থেকে মুসলমানদের অবশ্যই সরিয়ে নিতে হবে। তারা এটা পছন্দ করুক বা না করুক। যত শীগগির এ কাজ করা যায় ততই মঙ্গল।

আলোচনায় ছেদ পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা বললেন না। দুজনেই বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হুকুম চাঁদ আবার কথা বলতে শুরু করলেন।

ঝড় শুরু হলে তা না থামা পর্যন্ত মাথা নত করে থাকাই শ্রেয়। মাঠের ঘাসগুলো দেখুন। মৃদুমন্দ বাতাসে এর ডগা হেলে পড়ছে বাতাসের গতির দিকে। কিন্তু এর গোড়া শক্ত হয়ে আছে গর্বিতভাবে। কিন্তু যখন ঝড় আসে তখন সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়, বাতাসের গতির সাথে ঘাসের পাতাগুলোও ছড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক। একটু থেমে তিনি বললেন, জ্ঞানী লোকেরা স্রোতকে অনুসরণ করে সাঁতার দিয়ে কূলে ওঠে।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব বেশ মনোযোগ দিয়ে ঐ কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু তাঁর সমস্যার সাথে ঐ কথার কোন তাৎপর্য আছে কিনা বুঝতে পারলেন না। তিনি যে কিছু বুঝতে পারেন নি সে কথা হুকুম চাঁদও তার শূন্য চাহনি দেখে বুঝে নিলেন। কথাগুলো তাঁর কাছে আরও সরলভাবে ব্যক্ত করা দরকার।

রামলালের খুন সম্পর্কে আপনি কি করেছেন? এজন্য আর কাউকে গ্রেফতার করেছেন?

হ্যাঁ স্যার। জুগ্‌গা বদমায়েশ গতকাল কয়েকজনের নাম বলেছে। এরা সবাই এক সময় তার দলের লোক ছিল। এরা হলো মাল্লি এবং আরও চারজন। এরা সবাই নদী থেকে প্রায় দুমাইল দূরে কাপুর গ্রামের বাসিন্দা। তবে জুগ্‌গা তাদের সাথে ছিল না। ওদের গ্রেফতার করার জন্য আজ সকালেই আমি কয়েকজন কনষ্টেবলকে পাঠিয়েছি।

হুকুম চাঁদ তাঁর কথা শুনলেন বলে মনে হলো না। বহু... বহু দূরে যেন তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল।

জুগ্‌গা ও অন্য লোকটার প্রতি আমরা অন্যায় করেছি। ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, একজন মুসলমান তাঁতীর মেয়ের সাথে জুগ্‌গার একটা সম্পর্ক আছে, এ কথা আগে আপনাকে বলেছি। প্রায় রাতেই সে ঐ মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ডাকাতির পর মাল্লি জুয়ার বাড়ির আঙ্গিনায় ঐ চুড়ি ফেলে যায়।

হুকুম চাঁদ তখনও ছিলেন অন্যমনস্ক।

স্যার, আপনি যদি মত দেন তাহলে আমরা জুগ্‌গা ও ইকবালকে ছেড়ে দিতে পারি মাল্লি ও তার সঙ্গীদের পাওয়ার পর।

মাল্লি ও তার সঙ্গীরা মুসলমান না শিখ? হুকুম চাঁদ অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ওরা সবাই শিখ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুনরায় চিন্তামগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মনে মনে বললেন, ওরা যদি মুসলমান হতো তাহলে সুবিধা হতো সব দিক থেকে। লীগপন্থী ঐ লোকটা এবং ওদের দিয়ে মানো মাজরার শিখদের বোঝানো যেত তারা যেন গ্রামের মুসলমানদের চলে যেতে দেয়।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনায় বিরতি। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের মনেও ঐ ধরনের একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। তিনি কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন। হুকুম চাঁদ কোন চান্স নিতে চাইলেন না।

শুনুন। তিনি বললেন, মাল্লি ও তার সঙ্গীদের ধরার প্রয়োজন নেই। খাতায় তাদের নামও তুলবেন না। তবে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবেন। প্রয়োজন হলে আমরা তাদের গ্রেফতার করব। ঐ বদমায়েশ বা অন্য লোকটাকে এখন ছেড়ে দেবেন না। ওদের প্রয়োজন হতে পারে।

ইন্সপেক্টর সাহেব স্যালুট করলেন।

দাঁড়ান, আমি এখনও কথা শেষ করিনি। হুকুম চাঁদ তাঁর হাত তুলে ইশারা করলেন। প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আপনি মুসলমান উদ্বাস্তু শিবিরের কমান্ডারের কাছে খবর পাঠাবেন, মানো মাজরার মুসলমানদের সরিয়ে নেয়ার জন্য তিনি যেন ট্রাক পাঠিয়ে দেন।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব। আর একবার স্যালুট করলেন। একটা জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হুকুম চাঁদ যে একজন বিশ্বস্ত লোকের ওপর ভার দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বর্ষাতি চাপিয়ে দিলেন গায়ে।

এই বৃষ্টির মধ্যে আমি আপনাকে যেতে দিতাম না। কিন্তু বিষয়টা এমনই জরুরী যে, আপনার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মাঠের দিকে তাকিয়ে হুকুম চাঁদ বললেন।

আমি জানি স্যার। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব। আবার স্যালুট করলেন। আমি এখনই কাজ শুরু করছি। তিনি তাঁর সাইকেলে উঠে কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন।

আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে হুকুম চাঁদ তাকিয়ে রইলেন। তখনও বৃষ্টি ঝরছিল আকাশ থেকে বিরামহীনভাবে। ঠিক বা ভুল সিদ্ধান্ত কোন সময় তাঁকে ভারাক্রান্ত করেনি। তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট-কোন মিশনারি কাজ তার নয়। প্রতিদিনের সমস্যার উত্তর তাকে খুঁজতে হয়। অজানা পরিপূর্ণ উত্তরের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়োজন তাঁর নেই। কি হতে পারে এমন ধরনের চিন্তার ঘটনা তার জানা নেই। কি ঘটছে। এটাই তিনি জানেন। জীবনকে তিনি নিয়েছেন স্বাভাবিকভাবে। একে নিজের মতো করে নিতে বা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তিনি চান না। ইতিহাসের বিবর্তনে মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক অবদান রেখেছে। তার বিশ্বাস, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে মানুষের সৎ প্রচেষ্টা থাকা দরকার। এসব তাৎক্ষণিক প্রয়োজন বলতে তিনি বোঝেন, বিপদে পড়লে কিভাবে জীবন রক্ষা করতে হয়, সামাজিক কাঠামো সংরক্ষণ, সমাজের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ইত্যাদি। তার তাৎক্ষণিক কাজ হলো মুসলমানদের জীবন রক্ষা করা। যেভাবেই হোক তিনি সে কাজ করবেন। তাছাড়া এ যাবত তিনি কোন কাজই রাগের মাথায় করেন নি। তাঁর স্বাক্ষরে যে দুজন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের অন্য কোন কারণেও গ্রেফতার করা যেত। একজন আন্দোলনকারী এবং অন্যজন অসৎ চরিত্রের লোক। সঙ্কটের সময় তাদের আটকে রাখাই শ্রেয়। কোন বড় কাজে যদি তার সামান্য ভুল হয় তাহলে সেই ভুলকে ভুল বলা ঠিক হবে না। হুকুম চাদ আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁর পরিকল্পনা মোতাবেক যদি সব কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়! সাল কিছুর নির্দেশ যদি তিনি নিজে দিতে পারতেন, তাহলে কোন অঘটন ঘটত না। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁর মনের কথা সব সময় বুঝতে পারে না বলেই তাঁকে মাঝে মাঝে জটিল অবস্থায় পড়তে হয়।

২.৪ বাথরুমের দরজা বন্ধ ও খোলার শব্দ

ঘরের মধ্য থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ ও খোলার শব্দ পাওয়া গেল। হুকুম চাঁদ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বেয়ারাকে নাশতা আনার নির্দেশ দিলেন।

মেয়েটি খাটের ধারে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। হুকুম চাঁদ ঘরে ঢুকলে মেয়েটি দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলখানি মাথায় তুলে দিল। তিনি চেয়ারে বসলে মেয়েটি মেঝের দিকে তাকিয়ে আবার খাটের কোণায় বসল। একটা নিঝুম নীরবতা বিরাজ করল কিছুক্ষণ। তারপর হুকুম চাঁদ কিছুটা সাহস দেখালেন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বললেন,

তোমার নিশ্চয়ই ক্ষুধা পেয়েছে। আমি চায়ের কথা বলেছি।

মেয়েটি তার কালো ডাগর চোখ দু'টো হুকুম চাঁদের ওপর নিক্ষেপ করে বলল, আমি বাড়ি যেতে চাই।

আগে কিছু খেয়ে নাও। ড্রাইভারকে আমি বলে দেব তোমাকে বাড়িতে রেখে আসতে। তুমি কোথায় থাক?

চন্দননগর। ইন্সপেক্টর সাহেবের থানা ওখানেই।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। হুকুম চাঁদ তাঁর গলা পরিষ্কার করে বললেন, তোমার নাম কি?

হাসিনা, হাসিনা বেগম।

হাসিনা। তুমি সত্যি সুন্দরী। তোমার মা তোমাকে সুন্দর নামই রেখেছে। ঐ বৃদ্ধা মহিলা কি তোমার মা?

এই প্রথমবার মেয়েটি মৃদু হাসল। এ রকম প্রশংসা তার আগে কেউ করেনি। স্যার নিজেই তার প্রশংসা করেছেন এবং তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

না স্যার। উনি আমার দাদি। আমার জন্মের পরেই আমার মা মারা যায়।

তোমার বয়স কত? আমি জানিনে। ষোলো বা সতেরো হতে পারে। আবার আঠারোও হতে পারে। আমি শিক্ষিত হয়ে জন্মাইনি। তাই আমার জন্ম তারিখ আমি লিখে রাখতে পারিনি।

মেয়েটি তার নিজের রসিকতায় মৃদু হাসল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও হাসলেন। বেয়ারা একটা ট্রেতে ডিম, রুটি ও চা নিয়ে এলো।

চায়ের কাপ গুছিয়ে দেয়ার জন্য মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। রুটিতে মাখন লাগিয়ে দিল। একটা ছোট প্লেটে রুটি রেখে সে হুকুম চাঁদের সামনে টেবিলের ওপর প্লেটটি রাখল।

আমি কিছু খাব না। আমি চা পান করেছি।

মেয়েটি ছিনাল মেয়ের মতো ভণিতা করে বলল, আপনি কিছু না খেলে আমিও কিছু খাব না।

যে ছুরি দিয়ে সে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছিল তা টেবিলের ওপর রেখে সে বিছানার ওপর বসল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেশ খুশি হলেন।

আমার কথায় রাগ করো না, তিনি বললেন। তিনি মেয়েটির কাছে গিয়ে তার কাঁধের ওপর হাত রাখলেন।

তোমাকে অবশ্যই কিছু খেতে হবে। কাল রাতে তুমি কিছুই খাওনি।

মেয়েটি তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি খেলে আমি খাব। আপনি না খেলে আমি খাব না।

ঠিক আছে। তুমি যখন অনুরোধ করছি তখন আমি খাব। হুকুম চাঁদ মেয়েটির কোমর ধরে তাকে উঠিয়ে টেবিলের ধারে তাঁর নিজের কাছে এনে বসালেন। আমরা দুজনেই খাব। এসো, আমার কাছে বসো।

মেয়েটি তার জড়তা কাটিয়ে উঠে হুকুম চাঁদের কোলে এসে বসল। মাখন লাগানো রুটি তাঁর মুখে তুলে দিল। গালভর্তি রুটি মুখে হুকুম চাঁদ যখন থাক থাক যথেষ্ট হয়েছে

বলে মাথা নাড়ালেন, তখন সে হাসল। গোঁফে আটকে থাকা মাখনও সে সযত্নে মুছে দিল।

এ পেশায় তুমি কতদিন আছ?

এটা কি ধরনের অবিবেচকের প্রশ্ন। কেন, জন্মাবার পর থেকেই। আমার মা গায়িকা, তার মাও গায়িকা ছিল। তাঁর মা-ও…

আমি গান গাওয়ার কথা বলছি না। অন্য বিষয়ের কথা বলছি, হুকুম চাঁদ ব্যাখ্যা করে বললেন। অতঃপর তিনি যেন উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন।

অন্য বিষয় বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন? ঔদ্ধত্যের সাথেই বলল মেয়েটি। টাকার জন্য আমরা কখনও অন্য কোন কাজে যাই না। আমি গান গাই ও নাচি। নাচ ও গান বলতে কি বোঝায় তা আপনি জানেন বোধ হয়। আপনি অন্য বিষয় জানতে চান। এক বোতল হুইস্কি আর অন্য বিষয়। ব্যস!

কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে হুকুম চাঁদ কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। না, না… আমি অন্য কিছু করি না।

মেয়েটি হাসল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গালে হাত লাগিয়ে বলল, বেচারা ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার কুমতলব আছে, কিন্তু আপনি ক্লান্ত। আপনার নাক ডাকছে রেল ইঞ্জিনের মতো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাক ডাকার অনুকরণ করে সে হাসিতে ফেটে পড়ল।

মেয়েটির চুলে হাত বুলাচ্ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তাঁর নিজের মেয়ে বেঁচে থাকলে তাঁর বয়সও ষোলো, সতেরো বা আঠারো হতো। এজন্য অবশ্য তাঁর মনে কোন অপরাধবোধ নেই। তাঁর এই সময় কাটানো শুধু পরিতৃপ্তির অস্পষ্ট অনুভূতির জন্যই। মেয়েটির সাথে তিনি ঘুমাতে চান না, তার সাথে যৌন মিলনও তাঁর কাম্য নয়, এমন কি তিনি তাকে স্পর্শ করতে বা তার ঠোঁটে চুমুও খেতে চান না। তিনি চান মেয়েটি তাঁর কোলে বসে বুকে মাথা রেখে ঘুমাক।

আবার আপনি চিন্তা করছেন।

মেয়েটি মাথা চুলকাতে চুলকাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উদ্দেশ্যে বলল, এক কাপ চা নিয়ে সে পিরচের ওপর কিছুটা ঢালল।

চানিন। চিন্তামুক্ত হন।

চা ভর্তি পিরিচটা সে তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

না, না। আমি চা খেয়েছি। তুমি খাও।

ঠিক আছে। আমি চা খাচ্ছি। আপনি আপনার চিন্তা নিয়ে থাকুন। মেয়েটি শব্দ করে চা খেতে শুরু করল। হাসিনা। তিনি নামটি বার বার বলতে চাইলেন। হাসিনা।

বলুন। হাসিনা তো শুধু আমার নাম। আপনি আর কিছু বলছেন না কেন?

হুকুম চাঁদ তার হাত থেকে খালি পিরিচটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। মেয়েটিকে তিনি আরও কাছে টেনে নিলেন, তার মাথাটা নিজের মাথার কাছে নিয়ে এলেন। মেয়েটির মাথার চুলে তিনি হাত বুলাতে লাগলেন।

তুমি কি মুসলমান?

হ্যাঁ। আমি মুসলমান। এ ছাড়া হাসিনা বেগম আর কি হতে পারে? এক দাড়িওয়ালা শিখ?

চন্দননগর থেকে মুসলমানদের সরানো হয়েছে বলে আমি জানি। তুমি ওখানে কিভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছ?

অনেকে অবশ্য চলে গেছে। ইন্সপেক্টর সাহেব আমাদের চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু না বলা পর্যন্ত থাকতে বলেছেন। গায়িকারা অবশ্য হিন্দু বা মুসলমান নয়। সব ধর্মের লোকই আমার কাছে গান শুনতে আসে।

চন্দননগরে আর কোন মুসলমান আছে?

হ্যাঁ … আছে, ইতস্তত করে বলল হাসিনা। আপনি তাদের বলতে পারেন মুসলমান, হিন্দু বা শিখ বা অন্য কিছু পুরুষ বা মহিলা। ওখানে এখনও একদল হিজড়া আছে।

কথাগুলো বলার সময় তার মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা দেখা দিল।

হুকুম চাঁদ তাঁর হাত দু'টো চোখের ওপর রাখলেন।

বেচারা হাসিনা বিহ্বল হয়ে পড়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি হাসব না। তুমি হিন্দু বা মুসলমান নও। কিন্তু হিজড়া যেমন হিন্দু বা মুসলমান নয়, ঠিক তেমনটি তুমি নও।

আমাকে পরিহাস করবেন না।

আমি তোমাকে পরিহাস করছি না। চোখের ওপর থেকে হাত দু'টো সরিয়ে নিলেন হুকুম চাঁদ। হাসিনার মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা আরও বেশি করে দেখা গেল। আমাকে বল, হিজড়াদের কেন সরিয়ে দেওয়া হলো না।

আমি জানি। আপনি আমাকে উপহাস করবেন না- কথা দিলে আমি বলব।

কথা দিলাম।

মেয়েটি উদ্দীপিত হলো।

হিন্দু আধ্যুষিত এলাকায় এক বাড়িতে একটা শিশুর জন্ম হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সত্ত্বেও হিজড়ারা ঐ বাড়িতে গান গাওয়ার জন্য যায়। হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের লোক তাদের পাকড়াও করে। মুসলমান বলে তারা ওদের মেরে ফেলতে চায়। আমি অবশ্য শিখদের পছন্দ করি না। মেয়েটি ইচ্ছাকৃতভাবেই কথা থামিয়ে দিল।

তারপর কি হলো? বেশ আগ্রহ নিয়েই হুকুম চাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়েটি হাসল। হিজড়ারা যেভাবে আঙ্গুল ফাঁক করে হাতে তালি দেয়, সেভাবেই সে হাতে তালি দিল।

তারা ঢোল বাজিয়ে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে গান ধরল। তারা এত দ্রুত পাক দিতে শুরু করল যে, তাদের পরনের নিম্নাঙ্গের কাপড় বাতাসে উড়ে তাদের সাথেই ঘুরল। তারপর তারা নাচ থামিয়ে উন্মত্ত লোকদের নেতাদের কাছে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আমাদের সব কিছু দেখেছ। এখন বল, আমরা হিন্দু না মুসলমান?

তাদের কথায় উপস্থিত সবাই উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু শিখরা হাসল না।

হুকুম চাঁদও হাসলেন।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। শিখরা তাদের কৃপাণ নিয়ে এসে ভয় দেখাল, আজ তোমাদের আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের অবশ্যই চন্দননগর ছেড়ে চলে যেতে হবে। না হলে তোমাদের আমরা মেরে ফেলব। একজন হিজড়া তখন হাতে তালি মেরে একজন শিখের দাড়িতে আঙ্গুল বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন? তোমরা কি সবাই আমাদের মতো হয়ে সন্তানহীন থাকবে? এ কথায় শিখরাও হেসে ওঠে।

ভাল কথা, হুকুম চাঁদ বললেন। কিন্তু এসব ঝামেলার সময় তুমি খুব সাবধানে থাকবে। কয়েকদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে না।

আমি আতঙ্কিত নই। আমরা বহু লোককে খুব ভাল করে জানি। তাছাড়া আমাকে রক্ষা করার জন্য এত বড় একজন ক্ষমতাবান ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। আপনি যতদিন আছেন। ততদিন আমার মাথার একটা চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

হুকুম চাঁদ মেয়েটির মাথার চুলে হাত বুলাতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না। মেয়েটি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, আপনি কি চান আমি পাকিস্তানে চলে যাই?

হুকুম চাঁদ তাকে আরও কাছে টেনে নিলেন। তাঁর দেহে জ্বর জ্বর ভাবের উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। হাসিনা। গলা পরিষ্কার করে তিনি আবার বললেন, হাসিনা। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

হাসিনা, হাসিনা, হাসিনা। আমি কি কালা? আপনি কিছু বলছেন না কেন?

আজ তুমি এখানে থাকবে। থাকবে তো? তুমি এখান থেকে এখনই চলে যেতে চেয়ো না।

আপনি শুধু একথাই বলতে চান? আপনি যদি আপনার গাড়ি না দেন, তাহলে এই

বৃষ্টিতে পাঁচ মাইল পথ কিভাবে যাব? কিন্তু আপনি যদি আমাকে আরও এক রাত থাকতে এবং গান গাইতে বলেন, তাহলে আমাকে মোটা অংকের টাকা দিতে হবে।

হুকুম চাঁদ আশ্বস্ত হলেন। টাকা কি? কৃত্রিম প্রেম নিবেদন করে তিনি বললেন, তোমার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

২.৫ ইকবালকে তাঁর সেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছিল

এক সপ্তাহ ধরে ইকবালকে তাঁর সেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল স্তুপীকৃত খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন। তাঁর সেলে আলোর ব্যবস্থা ছিল না, তাঁকে কোন বাতিও সরবরাহ করা হয়নি। অসহ্য গরমের মধ্যে তাঁকে শুয়ে রাতের শব্দ শুনতে হয়-নাক ডাকা, মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ এবং গভীর রাতে প্রচণ্ড নাক ডাকার শব্দ। বৃষ্টি শুরু হলে থানাকে মনে হয় আগের চেয়ে আরও বেশি নীরব। ক্রমাগত বৃষ্টি পতন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দেখা যায় রিপোর্টিং রুম ও ব্যারাকের মধ্যে একজন কনস্টেবলকে দৌড়ে যেতে। একঘেয়েমিপূর্ণ বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ ও মেঘের ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। পাশের সেলে আছে জুগ্‌গা। কিন্তু তার দেখা পাওয়া যায় কদাচিৎ। প্রথম ঘণ্টাখানেক পরেই তারা তাকে ফিরিয়ে আনে। জুগ্‌গাকে নিয়ে কনস্টেবলরা কি করে তা ইকবাল জানতে পারেন নি। তিনিও জিজ্ঞাসা করেন নি। আর জুড়াও তাঁকে কিছু বলেনি। তবে পুলিশের সাথে তার রসিকতা আরও কদর্য এবং তাদের সাথে তার যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

একদিন সকালে পাঁচজন লোককে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে এলো। তাদের দেখামাত্রই জুগ্‌গার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে তাদের গালি-গালাজ করল। জুল্লার আচরণের প্রতিবাদ করে তারা রিপোর্টিং রুমের বারান্দা ত্যাগ করতে অস্বীকার করল। নতুন এই বন্দী কারা, তা নিয়ে ইকবালের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাদের কথাবার্তা শুনে ইকবালের মনে হলো, তারা সবাই মাতলামি, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে। থানার কয়েক গজ দূরেই চন্দননগর। সেখানেও মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ইকবাল আগুনের লেলিহান শিখা দেখেছে, শুনেছে মানুষের আর্ত চিৎকার। কিন্তু পুলিশ সেখানে কাউকে গ্রেফতার করেনি। বন্দীরা নিশ্চয়ই সাধারণের চেয়ে ব্যতিক্রম। নতুন বন্দীদের তিনি যখন চেনার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় তাঁর সেলের তালা খুলে দেয়া হলো। জুয়া ও একজন কনস্টেবল তাঁর সেলে প্রবেশ করল। জুগ্‌গার মেজাজ বেশ ভালই দেখা গেল।

সুপ্রভাত বাবুজি, সে বলল, আমি আপনার ভৃত্য হতে চলেছি। আমি আপনার কাছ থেকে শিখতে পারব।

ইকবাল সাহেব কনস্টেবলটি জুগ্‌গার কথার জের টেনে তালা বন্ধ করতে করতে বলল, সোজা ও সরল পথে কিভাবে চলতে হয় তা এই বদমায়েশটাকে শিখিয়ে দিন।

ওর কথা ছেড়ে দিন, জুগ্‌গা বলল, বাবুজি জানে যে, তোমার সরকারই আমাকে বদমায়েশ বানিয়েছে। তাই নয়। কি, বাবুজি?

ইকবাল ওর কথার উত্তর দিলেন না। তিনি বাড়তি একটা চেয়ারের ওপর পা রেখে কাগজের স্তুপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জুগ্‌গা চেয়ার থেকে তাঁর পা দু'টো সরিয়ে তার বড় দু'টো হাত দিয়ে টিপতে শুরু করল।

বাবুজি, অবশেষে আমার কিসমত খুলে গেছে। আপনি যদি আমাকে কিছুটা ইংরেজী শিখিয়ে দেন, তাহলে আমি আপনার সেবা করব। মাত্র কয়েকটা বাক্য শিখিয়ে দিন, ঐ দিয়েই আমি গিট মিট করতে পারব।

পাশের সেলে কার জায়গা হলো?

জুগ্‌গা ইকবাল সাহেবের পা টিপতে টিপতে বলল, আমি জানিনে। ওরা বলল, ওরা রামলালের খুনীদের গ্রেফতার করেছে।

আমার ধারণা ছিল, ঐ খুনের জন্য। ওরা তোমাকেই ধরেছে, ইকবাল বললেন।

আমাকেও ধরেছে, জুগ্‌গা হাসলো। তার সাদা সমান্তরাল দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। সোনা দিয়ে বাঁধানো একটা দাঁতের অংশও দেখা গেল। মানো মাজরায় কোন অঘটন ঘটলে ওরা আমাকেই ধরে। আপনি তো জানেন আমি একটা বদমায়েশ।

তুমি কি রাম লালকে খুন করনি?

জুগ্‌গা পা টেপা বন্ধ করল। দু'হাত দিয়ে সে নিজের কান দু'টো ধরে জিহবায়

কামড় দিল। তৌবা; তৌবা! নিজের গ্রামের মহাজনকে খুন? যে মুরগি ডিম দেয় তাকে কে মারে বাবুজি? তাছাড়া আমার পিতা যখন জেলে ছিল তখন রামলাল উকিলকে টাকা দিয়েছিল। আমি জারজ ছেলের মতো কাজ করিনে।

আমার মনে হয় ওরা এখন তোমাকে ছেড়ে দেবে।

পুলিশ হলো দেশের রাজা। দয়া হলে তারা আমাকে ছেড়ে দেবে। আবার যদি আটকে রাখতে চায় তাহলে লাইসেন্স ছাড়া বর্শা রাখার দায়ে বা অনুমতি ছাড়া গ্রামের বাইরে যাওয়ার কারণে অথবা শুধু কিছুর কারণে ওরা আমাকে আটকে রাখবে।

কিন্তু তুমি তো ঐ রাতে গ্রামের বাইরে ছিলো। ছিলে না?

জুগ্‌গা মেঝের ওপর বসল। ইকবালের পা দু'টো নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে পায়ের পাতার নিচের অংশে হাত বুলাতে লাগল।

আমি গ্রামের বাইরে ছিলাম, সে উত্তর দিল। তার চোখে দুষ্টমিভরা চাহনি খেলে গেল। আমি কাউকে খুন করতে যাইনি। আমি নিজেই খুন হয়েছি।

ইকবাল তার ঐ বক্তব্যের সাথে পরিচিত। ফলে তিনি ঐ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য জুগ্‌গাকে উৎসাহিত করলেন না। কিন্তু আলোচনা যখন একবার শুরু হয়েছে তখন জুগ্‌গাকে আর ফেরানো সম্ভব বলে মনে হলো না। আরও আগ্রহভরে জুগ্‌গা তাঁর পা টিপতে শুরু করল।

আপনি তো অনেক বছর বিলেতে কাটিয়েছেন, জুগ্গ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, অনেক বছর, ইকবাল বললেন। যা ঘটতে যাচ্ছে এমন একটা অবশ্যম্ভাবী। বক্তব্য এড়াতে তিনি বৃথাই চেষ্টা করলেন।

তাহলে বাবুজি, জুগ্‌গা আরও আস্তে জিজ্ঞাসা করল, আপনি অনেক মেম সাহেবের সাথে রাত কাটিয়েছেন। তাই না?

ইকবাল অস্বস্তি বোধ করলেন। যৌন বিষয়ক আলোচনা থেকে ভারতীয়দের বেশি সময় সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এটা তাদের মনের সাথে পুরোপুরি মিশে আছে। এটা তাদের কলা, সাহিত্য ও ধর্মে প্রকাশমান। সাইনবোর্ডগুলোতে কামোদ্দীপক বস্তু ও হস্তমৈথুনজনিত কুফল থেকে রক্ষার উপায় সম্বলিত বিজ্ঞাপন দৃশ্যমান। আদালত ও বাজার এলাকায় দেখা যায় হকাররা বিক্রি করছে নির্জীব পুরুষাঙ্গকে সতেজ, মোটা ও লম্বা করার জন্য গিরগিটির চামড়া থেকে নিঃসৃত তেল। নিঃসন্তান মহিলাকে সন্তান ধারণের এবং ছেলে হওয়ার জন্য ওষুধের আবিষ্কারক হাতুড়ে চিকিৎসকের দাবি সম্বলিত বিজ্ঞাপনও দেখা যায়। প্রায় সব সময়ই মানুষ এসব শোনে। যৌনাচার বিকৃতি ভারতীয়দের কাছে যতটা স্বাভাবিক অন্যদের কাছে ততটা নয়। শালা (স্ত্রীর ভাই) [আমি তোমার বোনের সাথে ঘুমাতে চাই] এবং শ্বশুর (আমি তোমার মেয়ের সাথে ঘুমাতে চাই) কথাগুলো আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে বলা হলে যেমন আদরের হয়, তেমনি শত্রুদের উদ্দেশ করে বলা হলে তা হয় রাগের প্রকাশ। রাজনীতি, দর্শন খেলাধুলা নিয়ে যতই আলোচনা হোক না কেন, ঐ আলোচনা যৌন আলোচনায় এসে থামবে। চাপা হাসি ও হাততালির মাধ্যমে সবাই উপভোগ করে শেষোক্ত এই আলোচনা।

হ্যাঁ কাটিয়েছি, সাধারণভাবে ইকবাল বললেন, বহু মেম সাহেবের সাথে।

বাঃ বাঃ, জুগ্‌গা যেন চিৎকার করে উঠল। ইকবালের পা টেপায় তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়ে গেল। বাঃ বাবুজি, বাঃ।। আপনি নিশ্চয়ই দারুণ আনন্দ উপভোগ করেছেন। মেম সাহেবরা হলো বেহেশতের হুরির মতো। সাদা, নরম, একদম সিল্কের মতো। আমাদের এখানে যারা আছে তারা হলো কালো মোষ।

মহিলা মহিলাই, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সাদা চামড়ার মহিলাদের উত্তেজনা কম। তুমি কি বিয়ে করেছ?

না বাবুজি। একটা বদমায়েশের কাছে কে তার মেয়েকে দেবে? যেখানে পাই সেখানেই আমি যৌন ক্ষুধা মেটাই।

সব সময় পাও নাকি?

মাঝে মাঝে ...। মামলার শুনানির দিন পিরোজপুর গিয়ে যদি উকিল ও তার কেরানিদের কাছ থেকে টাকা বাঁচাতে পারি। তাহলে আমার সময় কাটে খুব আনন্দে। সারা রাতের মতো আমি আগে ভাগেই ওদের সাথে কথা বলে নেই। অন্য লোকের মতো। ওরা আমাকেও সমান চোখে দেখে। ওদের ধারণা, দুবার বা সবচেয়ে বেশি হলে তিনবার। জুগ্গা তার মোচে তা দিয়ে বলল, কিন্তু জুগ্গাত্ সিং যখন ওদের কাছে যায় ওরা হায় হায় করে চিৎকার করে, নিজের কান ধরে বলে, তৌবা তৌবা। ভগবানের নামে দোহাই দিয়ে ওদের ছেড়ে আসার কথা বলে এবং টাকাও ফেরত দিয়ে দেয়।

ইকবাল জানে এটা মিথ্যা কথা। প্রায় সব যুবক ঐ ধরনের কথা বলে।

বিয়ে করলে তুমি তোমার বউকে তোমার প্রতিযোগী হিসাবে পাবে, ইকবাল বললেন, সে সময় তুমি তোমার কান ধরে তৌবা তৌবা বলবে।

বিয়েতে কোন মজা নেই বাবুজি। মজা করার সময় বা জায়গা কোথায়? গরমের দিনে সবাই বাইরে খোলা জায়গায় ঘুমায়। চুপি চুপি সামান্য সময়ের জন্য বউয়ের কাছে যাওয়া যায়। কেউ দেখে ফেলে এই আশঙ্কা সব সময় থাকে। শীতকালে পুরুষ ও মহিলারা আলাদাভাবে ঘুমায়। রাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই একই সময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ভান করে বাইরে এসে মিলতে হয়।

বিয়ে না করেও তুমি এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানো দেখছি।

জুগ্গা হাসল। আমি আমার চোখ বন্ধ করে থাকি না। তাছাড়া বিয়ে না করলেও আমাকে একজন বিবাহিত লোকের মতোই কাজ করতে হয়।

তুমিও আয়োজন করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও?

জুগ্গা বেশ জোরে হাসল। হ্যাঁ বাবুজি। এ কাজ আমি করি। ঐ কারণেই আজ আমি হাজতে। কিন্তু আমি মনে মনে বলি; ঐ রাতে যদি আমি বাইরে না যেতাম, তাহলে আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ আমার হতো না বাবুজি। আপনার কাছ থেকে আমার ইংরেজী শেখার সুযোগও হতো না। গুড মর্নিং-এর মতো কিছু গিট-মিট আমাকে শিখিয়ে দিন। দেবেন না বাবুজি?

ইংরেজী শিখে তুমি কি করবে? ইকবাল জিজ্ঞাসা করলেন। সাহেবরা দেশ থেকে চলে গেছে। তোমার উচিত মাতৃভাষা শেখা।

এই উপদেশে জুগ্গা খুশি হলো না। তার কাছে শিক্ষা মানে ইংরেজী শেখা। যেসব কেরানী ও পত্রলেখক উর্দু বা শুরুমুখী ভাষায় লেখে তারা লেখাপড়া জানে, কিন্তু শিক্ষিত নয়।

ওটা আমি যে কোন লোকের কাছ থেকে শিখতে পারব। ভাই মিত সিং আমাকে গুরুমুখী শিখিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। কিন্তু আমি এখনও ওটা শুরু করিনি। বাবুজি, আপনি কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন? আপনি নিশ্চয়ই দশ ক্লাস পাস করেছেন?

হ্যাঁ, দশ ক্লাস আমি পাস করেছি। আমি আসলে পাস করেছি। ষোল ক্লাস।

ষোল! বাহ বাহ। ষোল ক্লাস পাস করা কোন লোকের দেখা আমি পাইনি। আমাদের গ্রামে শুধু রামলালই পাস করেছিলেন চার ক্লাস। এখন সে মৃত। এখন একমাত্র মিত সিং-ই কেবল পড়তে পারে। প্রতিবেশী কয়েকটি গ্রামে কোন ভাই নেই। আমাদের ইন্সপেক্টর সাহেব সাত আর ডেপুটি সাহেব দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। ষোল! বাপরে। আপনার নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধি।

অতি প্রশংসায় ইকবাল অস্বস্তিবোধ করলেন।

তুমি কিছু লিখতে বা পড়তে পার, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি? না, আমার চাচার ছেলে স্কুলে সামান্য যা কিছু শিখেছিল, সে আমাকে তাই শেখায়। ওটা ছিল আধা ইংরেজী, আধা হিন্দুস্থানী:

পিজন মানে – কবুতর
ফ্লাই মানে – উড়ান

লুক মানে – দেখো
স্কাই মানে – আসমান।

আপনি এসব জানেন?

না। সে তোমাকে কোন অক্ষর শেখায় নি?

এবিসি? সে নিজেই এটা জানত না। আমি যা জানি, সে তাই-ই জানত:

এ বি সি তুমি কোথায়?
এডওয়ার্ড মারা গেছে,
আমি দুঃখ করতে চাই।

আপনি নিশ্চয়ই এটা জানেন?

না, আমি এটাও জানিনে।

ভাল কথা, আপনি আমাকে ইংরেজীতে কিছু বলুন।

ইকবাল খুশি হলেন। গুড মর্নিং, গুড নাইট কিভাবে বলতে হয় ইকবাল তাকে শিখালেন। মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি মূল কাজের ইংরেজী জুগ্‌গা জানতে চাইলে ইকবাল ধৈর্যহীন হয়ে পড়লেন। ঠিক ঐ সময় নতুন গ্রেফতারকৃত পাঁচজন লোককে পাশের সেলে আনা হলো। এ দৃশ্য দেখে জুগ্‌গার হাস্যোজ্জ্বল মুখটা আকস্মিকভাবে অন্তর্হিত হলো।

২.৬ বৃষ্টির ধারা কমে গিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি

বেলা এগারোটার দিকে বৃষ্টির ধারা কমে গিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। দিনটিও আলোকোজ্জ্বল হলো আগের চেয়ে। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব তার সাইকেলের সিটে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মেঘের ফাঁক দিয়ে দূরে নীলাকাশ দেখা গেল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ল। জাফরানী রঙের আলোকচ্ছটার খিলান বর্ষণসিক্ত মাটির ওপর যেন ঢেউ খেলতে লাগল। দিগন্ত আকাশে রামধনু দেখা গেল। মনে হলো, সমস্ত চন্দননগর শহরটা যেন বিবিধ রঙ দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়া হয়েছে।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব বেশ দ্রুত সাইকেল চালালেন। তাঁর হেড কনষ্টেবল মাল্লির গ্রেফতার সম্পর্কে থানা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই তিনি থানার পৌঁছাতে চান। থানা ডায়রির পাতা ছিড়ে ফেলা এবং উকিলের নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া খুবই অস্বস্তিকর। হেড কনস্টেবল লোকটা বেশ অভিজ্ঞ। কিন্তু ইকবাল ও জুয়ার গ্রেফতারের পর ঐ লোকটার ওপর ইন্সপেক্টর সাহেবের আস্থা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। রুটিন মাফিক ছাড়া অন্য কোন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার কাজে তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। বন্দীদের কোথায় আটকে রাখতে হবে, সে কি তা জানে? সে ছিল একজন চাষী। সে কারণেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যাপারে তার একটা ভীতি আছে। ইকবালকে বিরক্ত করার সাহস তার নেই (ওর সেলে সে একটা চারপাই, একটা টেবিল ও একটা চেয়ার রেখেছে)। সে যদি জুগ্‌গা ও মাল্লিকে ইতোমধ্যে অন্য একটা সেলে রেখে দিয়ে থাকে তাহলে ওরা দুজন হত্যা ও ডাকাতি নিয়ে আলোচনা করে একে অপরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেবে।

সাইকেল চালিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেব যখন থানায় ঢুকলেন, তখন থানার বারান্দা বেঞ্চিতে বসা, কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানোল। একজন তাঁর সাইকেল ধরল, একজন তাঁকে তাঁর রেইন কোট খুলতে সাহায্য করল। বর্ষার মধ্যে বাইরে যেতে হওয়ায় ইন্সপেক্টর সাহেবের মুখ দিয়ে কয়েকটা কথা বেরিয়ে এলো।

ডিউটি, ইন্সপেক্টর সাহেব গভীরভাবে বললেন, ডিউটি। বৃষ্টি কোন বাধা নয়। এমন কি ভূমিকম্প হলেও প্রথমে ডিউটি করতে হবে। হেড কনস্টেবল ফিরে এসেছে?

হ্যাঁ স্যার। কয়েক মিনিট আগে তিনি মাল্লির দলের লোকদেরকে ধরে এনেছেন। তিনি তাঁর বাসায় গেছেন চা খেতে।

দৈনন্দিন ডায়রিতে তিনি ওদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন?

না স্যার। তিনি বললেন, আপনার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব আশ্বস্ত হলেন। তিনি রিপোর্ট রুমে গিয়ে পাগড়িটা বুলিয়ে রেখে একটা চেয়ারে বসলেন। টেবিলে সব ধরনের রেজিস্টার সাজানো ছিল। বিভিন্ন কলামবিশিষ্ট হলুদ পাতাযুক্ত একটা বড় রেজিস্টার টেবিলের ওপরে খোলা ছিল। মানো মাজরা ব্লেষ্ট হাউজ থেকে ঐ দিন সকালে ফিরে আসার কথা লেখা আছে ঐ অন্তর্ভুক্তিতে।

উত্তম, দু'হাত ঘষে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। উরুতে চাপড় দিলেন দু'হাত দিয়ে, দু'হাত কপালে ঠেকালেন এবং চুলে হাত বুলালেন। ঠিক আছে, তিনি যেন নিজেকেই বললেন ঠিক আছে।

একজন কনষ্টেবল তার জন্য এক কাপ চা নিয়ে এলো চামচ দিয়ে নাড়াতে নাড়াতে।

আপনার কাপড়-চোপড় নিশ্চয় ভিজে গেছে। কনষ্টেবিলটি ঐ কথা বলতে বলতে কাপটি টেবিলের ওপর রাখল। চা-এ শেষবারের মতো একটা নাড়া দিয়ে।

কনষ্টেবলের দিকে না তাকিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেব চায়ের কাপটি তুলে নিলেন।

জুগ্‌গা যে সেলে আছে, সেই সেলে কি মাল্লির দলকে আটকে রেখেছ?

তৌবা! তৌবা! কনষ্টেবলটি তার দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে বলল। স্যার, থানায় একটা খুন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমরা যখন মাল্লিকে এখানে আনি, জুগ্‌গা ওকে দেখে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। এমন গালিগালাজ আমি আর কখনও শুনিনি। মা, বোন, মেয়ে—কাউকে

সে রেহাই দিয়ে কথা বলেনি। ওরা ঘাবড়ে না। যাওয়া পর্যন্ত সে এমনভাবে লোহার দরজা ঝাঁকাতে থাকে যে, আমরা মনে করলাম, কব্জা থেকে না দরজাই খুলে যায়। ঐ সেলে মাল্লিকে রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর মাল্লিও ঐ সেলে যেত না। সিংহের খাঁচায় মেষ শাবক কি যেতে চায়?

ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, জুগ্‌গার কথায় মাল্লি গালিগালাজ করেনি?

না। তাকে ভীতিসন্ত্রস্ত মনে হচ্ছিল। মানো মাজরা ডাকাতির ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই, এ কথাই সে বার বার বলছিল। অথচ জুগ্‌গা তাকে বলে যে, সে তাকে নিজের চোখে দেখেছে। একবার সে বাইরে বেরুতে পারলে সবার সাথেই হিসাব মিটিয়ে নেবে এবং তাদের মা, বোন ও মেয়েদের দেখে নেবে। জবাবে মাল্লি তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে আর এখন জুল্লাকে ভয় পায় না। কারণ জুগ্‌গা এখন ঐ তাঁতী মেয়েটার সাথে ঘুমানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। ঐ সময় জুয়া আচরণ করে পশুর মতো। মাল্লির কথায় জুগ্‌গার চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠে। মুখে হাত রেখে সে গোংক্লাতে থাকে। বুক চাপড়ায় কয়েকবার। লোহার দরজায় বার বার আঘাত করে সে ঘোষণা করে যে, সে মাল্লির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করে ফেলবে। মানুষকে এমনভাবে রাগতে আমি কখনও দেখিনি। আমরা কোন কুঁকি নিতে সাহস পাইনি। তাই জুগ্‌গার রাগ না কমা পর্যন্ত আমরা মাল্লিকে রিপোটিং রুমেই রেখে দেই। এরপর আমরা জুগ্‌গাকে বাবুর সেলে পাঠিয়ে মাল্লির দলকে জুগ্‌গার সেলে ঢুকিয়ে দেই।

বেশ ভালই তামাশা হয়েছে দেখছি, বিকৃত হাসি দিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, আরও তামাশা দেখতে পাব আমরা। মাল্লির লোকজনকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

কনষ্টেবলটি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সাবইন্সপেক্টর সাহেব রাজকীয় কায়দায় হাত নাড়িয়ে তাকে নিবৃত্ত করলেন।

নীতি, তুমি জান! আমি যতদিন চাকরি করছি ততদিন চাকরি করলে তুমি বুঝতে পারবে। যাও, গিয়ে দেখা হেড কনস্টেবলের চা খাওয়া হয়েছে কিনা। বলবে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

কিছুক্ষণ বাদেই হেড কনস্টেবল এসে উপস্থিত হলো। ঢেকুর তুলে সে তার পরিতৃপ্তির কথা প্রকাশ করল। তার যোগ্যতা নিয়ে কারও প্রশংসার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে সে সহ্য করতে পারে না। ইন্সপেক্টর সাহেব তার বিনম্র হাসিকে উপেক্ষা করে তাকে দরজা বন্ধ করে বসতে বললেন। হেড কনষ্টেবলের প্রকাশভঙ্গি পরিতৃপ্তি থেকে উদ্বিগ্নতায় এসে উপনীত হলো। সে দরজা বন্ধ করে টেবিলের অপর দিকে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, স্যার কি আদেশ?

বসুন বসুন, সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন শান্তভাবে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই।

হেড কনষ্টেবল বসল। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব কাঠ পেন্সিলের সূচালো অংশটা সন্তর্পণে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘুরাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ ঘোরানোর পর পেন্সিলটা বের করে তিনি সঁচালো অংশে লেগে থাকা বাদামী রঙের খৈল পরখ করতে লাগলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তিনি ম্যাচ বাক্সের ওপর কয়েকবার টোকা দিয়ে জ্বালালেন। বেশ শব্দ করেই তিনি সিগারেটে টান দিলেন। নাক দিয়ে নিঃসৃত ধোঁয়া টেবিলের ওপর আঘাত পেয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

হেড কনস্টেবল সাহেব, জিহ্বায় লেগে থাকা তামাকের ছোট একটা টুকরা সরিয়ে তিনি বললেন, আজ অনেক কাজ করতে হবে। সব কোজ আপনি নিজে করবেন, এটাই আমার ইচ্ছা।

বেশ গুরুত্ব দিয়েই হেড কনস্টেবল বলল, জি স্যার।

মাল্লি ও তার দলের লোকদের মানো মাজরায় নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তাদের এমন এক জায়গায় ছেড়ে দিন যেন গ্রামের লোক দেখতে পায় যে, তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মন্দিরের কাছেই তাদের ছেড়ে দেয়া সম্ভবত উত্তম হবে। গ্রামের লোকদের কাছে

এমনি এমনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা সুনতানা বা তাদের লোকদের কাউকে দেখেছে। কিনা। কেন? সে সম্পর্কে তাদের কিছু বলবেন না। এমনি এমনি জিজ্ঞাসা করবেন।

কিন্তু স্যার, সুলতানা ও তার দলবল তো পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। সবাই তো একথা জানে।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব পেন্সিলের সূচাগ্র পুনরায় ক্যানের মধ্যে ঢুকিয়ে খৈল বের করে টেবিলের ওপর ঘষে দিলেন। সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে অবজ্ঞা ভরে ঠোঁট উল্টালেন। এরপর দ্রুত ধোঁয়া ছাড়লেন এক রাশ। টেবিলের ওপর রক্ষিত রেজিস্টারে বাধা পেয়ে ঐ ধোঁয়া গিয়ে লাগল হেড কনস্টেবলের মুখে।

আমি জানি না যে, সুলতানা পাকিস্তানে চলে গেছে। ধরে নিলাম, মানো মাজরায় ডাকাতির পর সে চলে গেছে। কখন সে চলে গেছে তা গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চাওয়া তো দোষের কিছু নয়। না দোষ আছে কিছু?

হেড কনস্টেবলের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হলো।

আমি বুঝেছি স্যার। আর কোন আদেশ?

হ্যাঁ। গ্রামবাসীদের আরও জিজ্ঞাসা করবেন, মুসলিম লীগ কামী ইকবাল যখন মানো মাজরায় ছিলেন, তখন কোন অঘটন সম্পর্কে তারা কিছু জানে কিনা।

হেড কনষ্টেবলকে আর একবার বিমর্ষ দেখাল।

স্যার, বাবুর নাম তো ইকবাল সিং। তিনি শিখ। তিনি বসবাস করতেন ইংল্যান্ডে এবং এ কারণে তার চুল ছোট করে কাটা।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব হেড কনস্টেবলের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ইকবাল নামের অনেকেই আছেন। আমি বলছি মোহাম্মদ ইকবালের কথা, আর আপনি ভাবছেন ইকবাল সিং-এর কথা। মোহাম্মদ ইকবাল মুসলিম লীগের কর্মী হতে পারে।

বুঝতে পেরেছি। স্যার, একই কথা পুনরুক্তি করল হেড কনস্টেবল। কিন্তু সতি্যু সত্যি সে কিছুই বুঝতে পারেনি। সে ধারণা করল, নির্দিষ্ট সময়ে সে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবে। আপনার আদেশ পালিত হবে স্যার।

আরও একটা বিষয়, চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, একজন কনস্টেবলকে বলবেন, আমার কাছ তাহকে একটা চিঠি নিয়ে মুসলমান উদ্বাস্তু ক্যাম্পের কমান্ডারকে দিতে। আগামীকাল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুসলমান গ্রাম থেকে মুসলমানদের সরিয়ে নেয়ার সময় মানো মাজরায় কিছু কনষ্টেবল পাঠাতে হবে। একথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন।

হেড কনস্টেবল অনুধাবন করল যে, এ কথার অর্থ পরিকল্পনা মোতাবেক তাঁর কাজে সাহায্য করতে হবে। এজন্য সে মানসিক প্রস্তুতি নিল, দ্বিতীয়বার তাঁকে সালাম দিল এবং সালামের সমর্থনে বুটের আওয়াজ শোনা গেল। হ্যাঁ স্যার, সে একথা বলে স্থান ত্যাগ করল।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব তার পাগড়ি মাথায় পরলেন। খোলা এক দরজার কাছে গিয়ে তিনি রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মের দিকে তাকালেন। প্লাটফর্মের দেয়ালে যে লতা বেয়ে বেয়ে ওপরের দিকে উঠছিল, তা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গেছে। পড়ে থাকা পাতাগুলো সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। বাঁ দিকে পুলিশদের থাকার জায়গা। ওখানে দেখা গেল, চারপাই-এর ওপর পরিচ্ছন্নভাবে বিছানাপত্র গুটানো। পুলিশদের থাকার জায়গার ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে থানার দু'টো কামরা। অতি সাধারণ দু'টো কামরা। কামরা দু'টোর সামনে ইটের দেয়ালের পরিবর্তে আছে লোহার রেলিং। থানার বারান্দা থেকে কামরা দুটিতে কি আছে তা সব দেখা যায়। কাছের কামরাটিতে দেখা গেল, ইকবাল একটি চেয়ারে বসে, তার পা দু'টো চারপাই-এর ওপর। ম্যাগাজিন পড়ছেন তিনি। মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একাধিক পত্রিকা। জুগ্‌গা সিং বসে আছে মেঝের ওপর। হাত দু'টো রেলিং-এর মাঝে।

অলসভাবে সে তাকিয়ে আছে পুলিশদের কোয়াটারের দিকে। অন্য সেলটিতে মাল্লি ও তার লোকজন এলোমেলোভাবে বসে গল্প করছে। হেড কনষ্টেবল ও তিনজন পুলিশকে রাইফেল ও হাতকড়া নিয়ে আসতে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। পাশের সেলে পুলিশের আগমন জ্বল্পা লক্ষ্যই করল না। সে মনে করল, মাল্লিকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনানির জন্য।

জুগ্‌গাত্‌ সিং-এর আক্রমণাত্মক চেহারা দেখে মাল্লি ভয় পেয়ে যায়। জুগ্‌গাকে দেখে সে এতটাই ঘাবড়ে যায় যে, গোলমালের ভয়ে সে যে কোন শর্তে শান্তি স্থাপনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। সে জানে, ঐ জেলায় জুগ্‌গার মতো ভয়ঙ্কর লোক আর কেউ নেই। কিন্তু জুগ্‌গার গালাগালি তাকেও অসহিষ্ণু করে তোলে। মাল্লি তার নিজের দলের নেতা। সে মনে করে যে, জুগার ঐ অপমানের জবাবে তার কিছু করা দরকার, অন্তত নিজের লোকদের কাছে তার মান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে। যদি সে অনুমান করতে পারত যে, তার বন্ধুত্বসুলভ আচরণে জুগ্‌গা একই আচরণ করবে, তাহলে সে মানহানিকর মন্তব্য থেকে বিরত থাকত। সে অপেক্ষায় রইল, আবার একটা সুযোগের আশায়। তখন প্রচণ্ডতার জবাব প্রচণ্ডতার মাধ্যমেই দেয়া যাবে। লোহার দরজা তাদের শান্ত করল। তাছাড়া রাইফেল হাতে পুলিশও তো ছিল।

পুলিশরা মাল্লি, ও তার দলের লোকদের হাতকড়া লাগিয়ে একটা লম্বা শিকলের সাথে সংযুক্ত করল। শিকলের এক প্রান্ত রইল। একজন কনষ্টেবলের কোমরবন্ধের সাথে। হেড কনষ্টেবল তাদের অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দিল। দুজন কনস্টেবল রাইফেল হাতে পিছনে রইল। তারা যখন সেলের বাইরে এলো, জুগ্‌গা একবার মাল্লির দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর সে কোন কথা না বলেই অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

তুমি পুরানো বন্ধুত্বের কথা ভুলে গিয়েছ, মেকি বন্ধুত্বসুলভ কণ্ঠে মাল্লি বলল, এমন কি তুমি আমাদের দিকে ফিরেও তাকালে না। আমরা তোমার আসার অপেক্ষায় রইলাম।

ওর সাথীরা হাসল। ওকে থাকতে দাও, ও ওখানে থাকুক।

জুগ্‌গা বসে রইল নিথর পাথরের মতো। ওর দৃষ্টি মেঝের ওপর নিবদ্ধ।

তুমি এত রাগ করেছ কেন বন্ধু! কিসের দুঃখ তোমার? কারও ভালবাসা কি তোমার দিলকে উত্থালপাথাল করছে?

এসো এসো, চলে এসো, পুলিশ বলল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তারাও দৃশ্যটা। উপভোগ করছিল।

আমাদের পুরানো বন্ধুকে কি আমরা শুভ বিদায় বলে যেতে পারব না? শুভ বিদায় সর্দার জুগ্ঘা সিংজি। তোমার কি কারও কাছে কোন সংবাদ দেয়ার আছে? তাঁতীর ঐ মেয়েটার কাছে ভালবাসার কোন কথা?

লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে জুয়া এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে কিছুই শুনতে পায়নি। ক্রোধে তার চেহারা রক্তিম হয়ে উঠল। দেহের সব রক্ত যেন তার মুখে এসে জমা হলো। লোহার দরজার মধ্যে তার হাতের পেশী দৃঢ় হলো।

মাল্লি তার বন্ধুদের দিকে তাকাল। ওরা তখন মুচকি হাসছিল। সর্দার জুয়াত্‌ সিংকে আজ কিছুটা উতলা মনে হচ্ছে। আমাদের বিদায়ের জবাব সে আজ দেবে না। এজন্য অবশ্য আমরা কিছু মনে করি না। তার প্রতি রইল আমাদের শুভবিদায় বার্তা।

মাল্লি দু'হাত করজোড়ে লোহার দরজার কাছে মাথা নোয়াল। চিৎকার করে সে বলতে শুরু করল, শুভ বিদায় ...।

আকস্মিকভাবে জুগ্ঘ তার একটা হাত লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে মাল্লির পাগড়ির পিছনের অংশের চুল ধরল। মাল্লির পাগড়ি খুলে পড়ল। শিকারী কুকুর যেমন এক খণ্ড কম্বলকে একদিক থেকে অন্যদিকে নাড়া দেয়, তেমনিভাবে সে মাল্লির মাথাটা বার বার সামনে পিছনে করে লোহার রডের সাথে ঠকতে লাগল। প্রতিটি আঘাতের সাথে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকল অশ্রাব্য গালি, এবার তোকে মাকে... এবার তোর বোনকে... এবার তোর মেয়েকে... এবার তোর মাকে আবার... এবার তোর বোনকে আবার...।

ইকবাল সব কিছুই প্রত্যক্ষ করছিলেন চেয়ারে বসে। ঘটনার প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করে তিনি চেয়ার ছেড়ে দরজার ধারে এসে পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা চুপ করে আছ কেন? দেখছি না লোকটাকে ও মেরে ফেলবে?

পুলিশ গর্জে উঠল। একজন তার রাইফেলের বট দিয়ে জুগ্গার মুখে গুতো মারল। কিন্তু মুখ সরিয়ে জুগ্গা আঘাত থেকে রক্ষা পেল। মাল্লির সারা মাথা তখন রক্তে ভরা। তার মাথার খুলি ও কপাল থেতলে গেছে। সে আর্তচিৎকার করছিল। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব একদম সেলের কাছে গিয়ে তাঁর দম্ভের প্রতীক লাঠি দিয়ে জুগ্গার হাতে আঘাত করলেন একাধিকবার। কিন্তু জুগ্গা মাল্লির মাথা ছাড়ল না। এবার তিনি কোমরবন্ধ থেকে রিভলবার বের করে জুগ্গার দিকে তাক করে বললেন, শুয়োর কোথাকার! হাত ছাড় নইলে গুলি করব।

দু'হাত দিয়ে মাল্লির মাথা উঁচু করে জুগ্গা ওর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। সেই সাথে জুড়ে দিল কিছু অশ্রাব্য গালি। এরপর জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে সে মাল্লিকে ছেড়ে দিল। মাল্লি মাটিতে পড়ে গেল। তার চুলে ঢেকে গেল মুখ ও কাঁধ। তার সাথীরা তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল, রক্ত মুছে দিল, পাগড়ি দিয়ে মুখ মুছে দিল। শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে মাল্লি অভিশাপ দিল, তোর মায়ের মৃত্যু হোক, তুই একটা শুয়োরের বাচ্চা...তোকে আমি দেখে নেব ...। মাল্লি ও দলের লোকেরা এগিয়ে গেল। বেশ দূর থেকে তখনও মাল্লির কান্নার শব্দ শোনা গেল।

রেগে যাওয়ার আগে জুগ্গা যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে এলো।

ইন্সপেক্টর সাহেবের লাঠির আঘাতের চিহ্ন সে হাতের উল্টো দিকে দেখতে লাগল।

ইকবাল আগের মতো তখনও চিৎকার করছিলেন। জুগ্গা ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, চুপ করুন। বাবু! আমি আপনার কি করেছি যে, আপনি এত কথা বলছেন।

ইকবালের সাথে এত কর্কশভাবে জুগ্গা আগে আর কখনও কথা বলেনি। এতে ইকবালও কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টর সাহেব, এখন তো পাশের সেলটা খালি। ওখানে কি আমাকে রাখা যায়?

তিনি অনুনয় করে বললেন।

ইন্সপেক্টর সাহেব মুচকি হোসলেন।

নিশ্চয়ই ইকবাল সাহেব। আপনার সুবিধার জন্য যা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব তাই করব। টেবিল-চেয়ার দেয়া হবে। সম্ভব হলে একটা বৈদ্যুতিক পাখাও।

৩.১ মানো মাজরা

যখন জানা গেল যে, ট্রেন ভর্তি করে লাশ আনা হয়েছে, তখন গ্রামটিতে বিষন্ন নীরবতা নেমে এলো। গ্রামের অনেকে তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখল, অনেকে সারা রাত জেগে চাপা স্বরে আলাপ-আলোচনা করল। সবাই প্রতিবেশীকে শত্রু মনে করল এবং আত্মরক্ষার জন্য বন্ধু খোঁজার ও জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। তারা কেউ লক্ষ্য করল না, মেঘের খণ্ডে নক্ষত্র হারিয়ে গেছে আকাশে। ভ্যাপসা শীতল বায়ুর গন্ধও তারা অনুভব করল না। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে যখন তারা দেখল বৃষ্টি ঝরিছে, তখনও তাদের চিন্তায় দুটি বিষয় স্থান পেল। একটি ট্রেন এবং অপরটি মৃতদেহ পোড়ানো। গ্রামের প্রায় সব লোকই তাদের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ক্টেশনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ট্রেনটি যেমন রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে তা এসে উপস্থিত হয়েছে। স্টেশনে লোকজন নেই। সৈন্যদের তাঁবু বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। কোথাও কোথাও দেবে গেছে। শিখাহীন আগুন বা ধোঁয়া কিছুই দেখা যায়। না। সত্যি কথা বলতে কি, ওখানে জীবন বা মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবুও লোক দেখতে লাগল। সম্ভবত অনেক লাশ নিয়ে আরও একটা ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষায়!

বিকালের দিকে মেঘ সরে গেল পশ্চিমাকাশে। বৃষ্টি শেষে চারদিক বেশ পরিস্কার হয়ে গেল। আশপাশের সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সাহস করল। উদ্দেশ্য, অন্যের সাথে আলাপ করে আরও কিছু যদি জানা যায়। পরে তারা স্ব স্ব গৃহের ছাদে উঠে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বৃষ্টি থেমে গেলেও স্টেশন, প্লাটফর্ম বা যাত্রী ছাউনি বা সেনা ক্যাম্পে কাউকে দেখা গেল না। স্টেশন বিল্ডিংয়ের ছাদের কোণায় বেশ কয়েকটি শকুনি বসে আছে। ষ্টেশন চত্বরের ওপরে একাধিক চিল চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে।

পুলিশ ও বন্দীদের নিয়ে হেড কনষ্টেবল গ্রাম থেকে বেশ দূরে একটা স্থান নির্বাচিত করল। গ্রামবাসীরা সংবাদ পেয়ে একে অপরকে বলল এবং অতি দ্রুত সারা গ্রামে ঐ খবর ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামের সর্দারকে ডাকা হলো।

হেড কনস্টেবল তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হলে অনেক লোক জড়ো হলো। মন্দিরের কাছে পিপল গাছের নিচে দেখতে দেখতে বহু লোকের সমাগম হলো।

গ্রামের লোকদের সামনেই হেড কনস্টেবল বন্দীদের হাতকড়া খুলে দিল। একটা সাদা কাগজে তাদের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হলো। সপ্তাহে দুবার তাদের থানায় রিপোর্ট করার কথা বলা হলো। গ্রামবাসীরা বিমর্ষ চিত্তে ঐ দৃশ্য দেখল। তারা নিশ্চিত যে, গ্রামের ঐ ডাকাতির সাথে জুগ্‌গা বদমায়েশ ও আগভুক ইকবালের কোন সম্পর্ক নেই। তারা আরও নিশ্চিত ছিল যে, মাল্লির লোকদের গ্রেফতার করা পুলিশের যথার্থ হয়েছিল এবং তারা সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। ওদের সব কজনই যে ঐ ডাকাতির সাথে জড়িত ছিল, এমন নাও হতে পারে। পাঁচজন লোককে গ্রেফতার করা হয়ত ভুল হয়েছিল। কিন্তু ওদের কেউ ঐ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। তবু পুলিশ ওদের ছেড়ে দিচ্ছে তাদের নিজের গ্রামে নয়, যে গ্রামে তারা ডাকাতি ও খুন করেছিল সেই মানো মাজরায়। পুলিশ হয়ত ওদের নিরপরাধ ভেবেই এমন কাজ করল!

গ্রামের সর্দারকে এক পাশে ডেকে নিয়ে হেড কনস্টেবল তার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। সর্দার সাহেব ফিরে এসে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বললেন, সুলতানা বদমায়েশ বা তার কোন লোককে এখানে তোমরা কেউ দেখেছ বা তাদের সম্পর্কে কিছু শুনেছি কিনা সেন্ট্রি সাহেব জিজ্ঞাসা করছেন।

গ্রামের কয়েকজন লোক এগিয়ে এলো। ওরা বলল, সুলতানা ও তার দলের লোকেরা পাকিস্তান চলে গেছে বলে তারা শুনেছে। ওরা সবাই মুসলমান। ঐ গ্রামের সব মুসলমানকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

লালার খুন হওয়ার আগে না পরে সে চলে গেছে? সর্দার সাহেবের কাছে এসে হেড কনষ্টেবল জিজ্ঞাসা করল।

পরে, প্রায় এক সাথে সবাই বলল। এরপর কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটল। গ্রামবাসীরা একে অপরের দিকে তাকাল। তাদের কি করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারল না। পুলিশকে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বে হেড কনস্টেবল বলল,

মুসলিম লীগের কমী যুবক মুসলমান বাবু মোহাম্মদ ইকবালের সাথে কাউকে কথা বলতে বা এক সাথে উঠতে বসতে দেখেছ?

সর্দার সাহেব অবাক হলেন। তিনি জানতেন না, ইকবাল মুসলমান। তাঁর আবছা স্মরণ হলো, মিত সিং ও ইমাম বখশ তাকে ইকবাল সিং বলে ডাকতেন। তিনি উপস্থিত লোকের মধ্যে ইমাম বখশকে খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। গ্রামের বেশ কয়েকজন বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, তারা ইকবালকে মাঠে এবং ব্রিজের ধারে রেল লাইনের কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে।

তার কাজে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছ?

সন্দেহজনক? মানে...

ঐ লোকটা সম্পর্কে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পাওনি?

এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত ছিল না। শিক্ষিত লোক সম্পর্কে কেউ কখনও কোন ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না, ওরা সবাই সন্দেহজনকভাবে ধূর্ত। বাবু সম্পর্কে কোন কিছু একমাত্র মিত সিং-ই বলতে পারে। কারণ বাবুর কিছু মালপত্র এখনও গুরুদুয়ারায় আছে।

মিত সিং ভিড়ের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে ঠেলে সামনের দিকে পাঠিয়ে দিল উৎসাহী কেউ।

হেড কনষ্টেবল মিত সিং-এর উপস্থিতি উপেক্ষা করে তার কথার যারা জবাব দিচ্ছিল তাদের উদ্দেশে বলল, ভাইয়ের সাথে আমি পরে কথা বলব। ঐ বাবু মানো মাজরায় এসেছিল ডাকাতির আগে না পরে, এ কথা কেউ বলতে পারবে না?

গ্রামবাসী এ কথায় আবারও অবাক হলো। শহরের এক বাবুর সাথে ঐ ডাকাতির ও খুনের কি সম্পর্ক? হতে পারে, এর সাথে অর্থের কোন সম্পর্ক নেই। কেউ তো কিছু নিশ্চিত করে বলতে পারে না। তারা এখন কোন ব্যাপারেই নিশ্চিত নয়। হেড কনস্টেবল বলল, মহাজনের খুন হওয়া বা সুলতানা বা মোহাম্মদ ইকবাল সম্পর্কে কেউ নির্দিষ্ট কোন সংবাদ জানলে অবিলম্বে থানায় রিপোর্ট করবে।

এ কথা বলে সে যাওয়ার উপক্রম করল।

উপস্থিত লোকেরাও দলে দলে স্থান ত্যাগ করল। যাওয়ার পথে তারা প্রাণবন্ত আলোচনা ও অঙ্গভঙ্গি করল। মিত সিং গেলেন হেড কনষ্টেবলের কাছে। সে তখন তার দলকে মার্চ করে ফিরিয়ে নেয়ার তোড়জোড় করছিল।

সেন্ট্রি সাহেব, সেদিন যে যুবককে আপনি গ্রেফতার করেছিলেন সে মুসলমান নয়। সে একজন শিখ-ইকবাল সিং।

হেড কনষ্টেবল তার কথায় কান দিল না। একটা হলুদ কাগজে সে কিছু লেখার কাজে ব্যস্ত ছিল। মিত সিং ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করলেন।

হেড কনষ্টেবল কাগজ ভাঁজ করার সময় মিত সিং আবার বললেন, সেন্ট্রি সাহেব। হেড কনষ্টেবল তার দিকে ফিরেও দেখল না। সে একজন কনস্টেবলকে ইশারা করে কাগজখানা দিয়ে বলল, একটা সাইকেল বা টাঙ্গায় করে যাও। পাকিস্তান সামরিক ইউনিটের কমান্ড্যান্টকে চিঠিটা দেবে। মুখে তাকে বলবে যে, তুমি মানো মাজরা থেকে এসেছ এবং সেখানকার পরিস্থিতি মারাত্মক। ওখান থেকে মুসলমানদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি যেন অবিলম্বে ট্রাক ও সৈন্যদের পাঠান। এখনই যাও।

হ্যাঁ স্যার, কনস্টেবলটি জবাব দিল।

সেন্ট্রি সাহেব, মিত সিং অনুনয় করে বললেন।

সেন্ট্রি সাহেব, সেন্ট্রি সাহেব, সেন্ট্রি সাহেব, বেশ রেগে একই কথা বলল হেড কনস্টেবল। তোমার সেন্ট্রি সাহেব ডাকে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কি চাও তুমি?

ইকবাল সিং একজন শিখ।

তুমি কি ওর প্যান্ট খুলে দেখেছি ও শিখ না। মুসলমান। মন্দিরের তুমি একজন ভাই। যাও, গিয়ে প্রার্থনা কর।

দুই সারিতে দাঁড়ানো পুলিশের সামনে গিয়ে হেড কনস্টেবল দাঁড়াল।

সাবধানও হও, বাঁদিক থেকে শুরু কর, এগিয়ে চল।

মিত সিং মন্দিরে ফিরে গেলেন। উৎসুক গ্রামবাসীর কোন প্রশ্নেরই তিনি জবাব দিলেন না।

৩.২ হেড কনস্টেবলের আগমন

মানো মাজরায় হেড কনস্টেবলের আগমনের পর গ্রামের লোকেরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এই বিভক্তি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেল তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে।

মুসলমানরা নিজেদের বাড়িতে বসে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল এবং ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। পাতিয়ালা, আম্বালা ও কাপুরতলায় মুসলমানদের ওপর শিখদের নির্যাতনের যে কথা তারা গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেই কথা এখন তাদের চিন্তায় এলো। ওরা শুনেছিল, মহিলাদের কাপড় খুলে বেত মারা হয়েছে এবং বাজারের রাস্তায় তাদের ঘুরিয়ে জনবহুল বাজারে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। সতীত্ব রক্ষার্থে অনেক মহিলা আত্মহত্যা করেছে। ওরা শুনেছে, মসজিদে শূকর হত্যা করে মসজিদকে অপবিত্র করা হয়েছে, বিধর্মীরা কোরআন শরিফ ছিড়ে ফেলেছে। আকস্মিকভাবে মানো মাজরার সব শিখ তাদের কাছে পরিগণিত হলো অসৎ উদ্দেশ্যে আগত আগন্তুক হিসাবে। ওদের লম্বা চুল ও দাড়ি, হিংস্রতা ও কৃপাণ মুসলিম বিদ্বেষের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হলো। এই প্রথমবার পাকিস্তান নামটি ওদের কাছে নতুন অর্থ বয়ে নিয়ে এলো-আশ্রয় লাভের এমন এক শান্তিময় স্থান-যেখানে কোন শিখ নেই।

শিখরাও ছিল মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ও ক্রুদ্ধ। কখনও মুসলমানদের বিশ্বাস করবে না। তারা বলে থাকে। সর্বশেষ গুরু ওদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের কোন স্বদেশপ্রেম নেই। ভারতীয় ইতিহাসে মুসলমান শাসনামলে দেখা যায়, সিংহাসন লাভের জন্য পুত্ররা তাদের পিতাকে বদী বা হত্যা করেছে, ভাই ভাইকে অন্ধ করেছে। আর শিখদের প্রতি তারা কি করেছে? তাদের দুজন গুরুকে হত্যা করেছে, অন্য একজনকে খুন করেছে এবং তার শিশু সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে তাদের হাজার হাজার লোককে তালোয়ার দিয়ে নিধন করা হয়েছে। তাদের মন্দিরে গরু জবাই করে মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে, পবিত্র গ্রন্থ ছিড়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। মহিলাদের তারা কখনও সম্মান করেনি। শিখ উদ্বাস্তুরা অভিযোগ করেছে যে, মুসলমানদের কাছে ইজ্জত বিসর্জন দেয়ার আগে বহু মহিলা কুয়ায় ঝাঁপ দিয়েছে অথবা শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। যারা আত্মহত্যা করেনি, তাদের উলঙ্গ করে রাস্তায় নামানো হয়েছে, জনসমক্ষে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং শেষে হত্যা করা হয়েছে। এখন মুসলমানদের হাতে নিহত ট্রেনভর্তি শিখদের মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে মানো মাজরা গ্রামে। পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে মানো মাজরায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তার ওপর খুন হলো রামলাল। তাকে কে খুন করেছে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে রামলাল যে একজন হিন্দু, এ কথা সবাই জানে। সুলতানা ও তার দলের লোকেরা সবাই মুসলমান এবং তারা পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে। একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক-যার মাথায় পাগড়ি নেই, মুখে দাড়ি নেই- গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্য এসব কারণ যথেষ্ট। ফলে তারা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হয়েছে; মুসলমানদের ভিত্তি হলো অকৃতজ্ঞতা। শিখদের ক্ষেত্রে যুক্তি কখনও দৃঢ় বলে বিবেচিত হয়নি; তারা উত্তেজিত হলে যুক্তি কোন কাজেই আসে না।

রাতটা ছিল বিষন্ন। যে মৃদুমন্দ শীতল বায়ু মেঘকে দূরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই বায়ু আবার ফিরে এলো। প্রথমে এলো সাদা কুয়াশার আকারে। ঐ কুয়াশার মধ্যে চাঁদের আলো মোটামুটি দেখা যেতে লাগল। কিন্তু এরপর এলো বড় বড় আকারে, উত্তাল তরঙ্গের মতো। চাঁদ হারিয়ে গেল আকাশে, সারা আকাশটা ম্লান হয়ে গেল। ধূসর রঙের আবীরে। মাঝে মাঝে চাঁদের আলো যেন ঠিকরে পড়তে চাইছিল মেঘের আড়াল থেকে এবং ঐ চেষ্টা সফল হলে দেখা গেল, সমতল ভূমিতে চাঁদের আলো উজ্জ্বল রূপার মতো। পরে পুরো আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে পেল। বিদ্যুত চমকনি বা মেঘের গর্জন ছাড়াই আকস্মিকভাবে শুরু হল অবিরাম বৃষ্টি।

একদল শিখ চাষী সর্দারের বাড়িতে বসে ছিল। একটা হারিকেনের চারপাশে তারা

বসেছিল। কেউ ছিল চারপাই-এর ওপর, বাকিরা ছিল মেঝের ওপর। ঐ লোকদের মধ্যে মিত সিংও ছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা বলল না। নীরবে প্রহর গুণলো সবাই। মাঝে মাঝে তাদের মুখ থেকে শুধু একটা কথাই বেরিয়ে এলো,

সব কিছুই আমাদের পাপের শাস্তি।

হ্যাঁ, খোদা আমাদের পাপের শাস্তি দিচ্ছেন।

পাকিস্তানে অনেক জুলুম হয়েছে।

এ কারণেই খোদা চান, আমাদের পাপ কাজের শাস্তি হোক। মন্দ কাজের ফল মন্দই হয়।

একজন যুবক উঠে বলল, এই ধরনের শাস্তির জন্য আমরা এমন কি খারাপ কাজ করেছি? মুসলমানদের আমরা ভাইবোনের মতো দেখেছি। আমাদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তির জন্য। ওরা কেন লোক পাঠাচ্ছে?

তুমি বলছ ইকবালের কথা? মিত সিং বললেন। তাঁর সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে। তাঁর হাতে রয়েছে লোহার চুড়ি। যেমনটি থাকে, আমাদের মতো শিখদের হাতে। সে আমাকে বলেছে যে, ওর মা ওকে ওটা পরতে বলেছিল। এ কারণেই সে ওটা পরে। সে দাড়ি কামানো শিখ। সে ধূমপান করে না। লালার খুন হওয়ার একদিন পরেই সে এখানে আসে।

ভাই, আপনি সরল মনে বিষয়টি দেখছেন, ঐ যুবকটি জবাব দিল। লোহার চুড়ি পরলে মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয় না। কোন বিশেষ কাজের জন্য একদিন ধূমপান না করলেই বা কি এসে যায়?

আমি একজন সরল ভাই হতে পারি, মিত সিং বেশ আস্থার সাথে প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু তুমি আমি সবাই জানি, ঐ খুনের ব্যাপারে বাবুর কোন হাত নেই। তিনি যদি ঐ ব্যাপারে জড়িত থাকতেন, তাহলে খুন হওয়ার পর তিনি আর গ্রামে থাকতেন না। কোন বোকার কাছেও এ কথা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

যুবকটি লজ্জা পেল।

তা ছাড়া, আরও আস্থার সাথে মিত সিং বললেন, তারা ডাকাতির জন্য মাল্লিকে তো গ্রেফতার করেছে...

মাল্লিকে কি অপরাধে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তা আপনি জানলেন কিভাবে? যুবকটি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বেশ দৃঢ়তার সাথে বলল।

হ্যাঁ, ঠিক কথা। পুলিশ যা জানে তোমরা তা কিভাবে জানবে? তারা মাল্লিকে ছেড়ে দিল। বিচার ও নির্দোষ সাব্যস্ত ছাড়া তারা খুনীকে ছেড়ে দেয়, এমন কথা তোমরা কখনও শুনেছে? মিত সিং জিজ্ঞাসা করলেন উপস্থিত সকলকে।

ভাই, আপনি সব সময় যুক্তি ছাড়া কথা বলেন।

আচ্ছা, তোমরা তো যুক্তিগ্রাহ্য কথা বল। বলতো, জুঙ্কার বাড়িতে কে চুড়ির প্যাকেট ছুড়ে ফেলেছে?

আমরা কিভাবে জানিব? উপস্থিত সকলে প্রায় এক সাথে বলল।

আমি তোমাদের বলছি। ঐ লোকটা হলো জুগ্‌গার শত্রু মাল্লি। তোমরা জান, ওদের সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরেছে। ও ছাড়া জুগ্‌গাকে অপমানিত করার সাহস আর কাল্ল আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। মিত সিং তাঁর বক্তব্য সঠিক প্রমাণিত করার লক্ষ্যে আরও আস্থার সাথে বললেন, আর সুলতানার ব্যাপারে? সুলতানা। ঐ ডাকাতির ব্যাপারে ওর কি করার আছে?

হ্যাঁ ভাইজি, আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন, অন্য এক যুবক বলল। কিন্তু লালা নিহত হয়েছে। তাকে নিয়ে টানাটানি করে কি লাভ? এ কাজ পুলিশই করবে। জুগ্‌গা, মাল্লি ও সুলতানা তাদের গোলমাল মিটিয়ে ফেলুক। বাবুর জন্য আমরা যা করতে পারি তা হলো তিনি

তার মায়ের কোলে ফিরে যাক-এই প্রার্থনা। আমাদের সমস্যা অন্যটা। আমাদের সাথে যেসব শুয়োরের বাচ্চা (?) আছে, ওদের নিয়ে আমরা কি করব? তারা কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের নুন খাচ্ছে। আর দেখুন তো, কি কাজটা ওরা করল! আমরা ওদের দেখেছি ভাইয়ের মতো। কিন্তু ওরা ব্যবহার করল। সাপের মতো।

আলোচনা হঠাৎউত্তেজনাকর হয়ে উঠল।

মিত সিং বেশ রাগ করেই বললেন, ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে কি করেছে? ওরা কি তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, না তোমাদের ঘর দখল করেছে? ওরা কি তোমাদের মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করেছে? বল আমাকে, কি করেছে। ওরা?

উদ্বাস্তুদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, ওরা ওদের বিরুদ্ধে কি কাজ করেছে। প্রথমে যে ছেলেটি মিত সিং-এর কাছে উত্তর জানতে চেয়েছিল, সেই নির্দয় ছেলেটি উত্তর দিল, আপনি কি বলতে চান, গুরুদুয়ারায় আগুন দেয়ার সময় বা আমাদের লোকদের হত্যা করার সময় ওরা ঘুমিয়ে ছিল?

আমি শুধু মানো মাজরার কথা বলছি। আমাদের প্রজারা আমাদের বিরুদ্ধে কি করেছে?

ওরা মুসলমান।

মিত সিং এই কথায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে ঘাড় উঁচু করলেন।

সর্দার অনুভব করলেন যে, ঐ বান্দানুবাদ মিটিয়ে দিতে তার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

যা ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে কথা বলে কি লাভ, প্রজ্ঞার সাথে তিনি বললেন, এখন আমরা কি করব সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মন্দিরে যে সব উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে ওরা কিছু অঘটন ঘটাতে পারে। এতে গ্রামের সুনাম ক্ষুন্ন হবে।

কিছু আঘটন, কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে আলোচনার ধারাই পাল্টে গেল। নিজের গ্রামের লোকদের ওপর বহিরাগতরা কোন অত্যাচার করার সাহস পায় কি করে? যুক্তি এখানে বড় ধরনের একটা বাধা পেল। যুক্তির উর্ধে দলীয় চিন্তা। যে যুবকটি মুসলমানদের শুয়োর বলে গালি দিয়েছিল, সেই যুবকটিই উত্তেজিত হয়ে বলল, আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের প্রজাদের ওপর কেউ হাত তুলে দেখুক না।

সর্দার তাকে থামিয়ে দিলেন। তোমার মাথা গরম। কখনও কখনও তুমি মুসলমানদের, আবার কখনও কখনও উদ্বাস্তুদের হত্যা করার কথা বলছি। আমরা কিছু বলতে গেলেই তুমি অন্য আলোচনা করছি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে সর্দার, যুবকটি রাগে গর গর করতে লাগল, আপনার যদি ঐ বুদ্ধি থাকে তাহলে কিছু বলুন আমাদের।

শোন ভাই সব, গলার স্বর নামিয়ে সর্দার বললেন, মেজাজ খারাপ করার সময় আর নেই। এখানে যারা আছে তারা কেউ কাউকে হত্যা করতে চায় না। কিন্তু অন্য লোকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে? এখন আমাদের এখানে আছে চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন উদ্বাস্তু। গুরুর কৃপায় ওরা শান্তিপূর্ণ লোক। ওরা শুধু কথা বলে। আগামীকাল আর একদল উদ্বাস্তুকে আমরা পেতে পারি, যারা তাদের মাবোনকে হারিয়েছে। আমরা কি তাদের এ গ্রামে আসতে নিষেধ করব? আর যদি তারা সত্যি আসে, তাহলে কি তাদের সুযোগ দেব আমাদের প্রজাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে?

আপনি লাখ টাকার একটা কথা বলেছেন, একজন বৃদ্ধ বলল, এ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার।

কৃষকরা তাদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করল। ওরা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করতে পারে না। আতিথেয়তা অবসর বিনোদনের কাজ নয়। আশ্রয়হীন লোক যখন তা যায় তখন তাকে আতিথ্যে গ্রহণ করা একটা পবিত্র দায়িত্ব। আমরা কি মুসলমানদের চলে যেত বলব? অত্যন্ত জোরের সাথে বলতে হবে, না। সব কিছুর উর্ধে স্থান পাবে গ্রামের লোকদের আনুগত্য। অনেকে অনেক অযাচিত কথা বলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তাদের তাড়িয়ে

দেয়ার, এমন কি শিখদের বৈঠকেও সাহস দেখাবে না। বৈঠকের মেজাজ ক্রোধ থেকে পরিবর্তিত হলো হতবুদ্ধিতে।

কিছুক্ষণ পর সর্দার বললেন, আশপাশের সব গ্রামের মুসলমানদের বিতাড়িত করে চন্দননগরের পাশে উদ্বাস্তু শিবিরে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেকে পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। অন্যদের জলন্ধরে বড় উদ্বাস্তু শিবিরে নেয়া হয়েছে।

হ্যাঁ, অন্য একজন বলল, কাপুরা ও গুজ্জুমাত্তা গ্রামের মুসলমানদের গত সপ্তাহে অপসারণ করা হয়েছে। মানো মাজরা গ্রামে মুসলমান আছে। কিন্তু এই গ্রামের মুসলমানদেরই কেবল অপসারণ করা হয়নি। একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছা করে, গ্রামের বন্ধুপ্রতিম লোকদের চলে যাওয়ার কথা ওরা কিভাবে বলে। আমরা আমাদের ছেলেদের ঘর থেকে চলে যাওয়ার কথা বলতে পারব, কিন্তু আমাদের প্রজাদের কাছে অনুরূপ কথা কোনদিনই বলতে পারব না। এখানে কি এমন কোন লোক আছে, যারা মুসলমানদের বলতে পারবে, ভাইসব, মানো মাজরা থেকে তোমরা চলে যাও?

এ কথার জবাব কেউ দেয়ার আগে একজন গ্রামবাসী ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু হারিকেনের স্বল্প আলোয় কেউ তাকে চিনতে পারল না।

কে ওখানে? সর্দার জিজ্ঞাসা করলেন। হারিকেনের আলোর রশ্মি থেকে নিজের চোখ দু'টোকে হাত দিয়ে আড়াল করে তিনি বললেন, ভিতরে এসো।

ইমাম বখশ ভিতরে এলেন। তাঁর সাথে এলেন আরও দুজন। ওরাও মুসলমান।

সালাম চাচা ইমাম বখশ, সালাম খায়ের দিনা। সালাম, সালাম।

শুভ রাত সর্দার সাহেব, শুভ রাত, মুসলমানরা জবাব দিলেন।

উপস্থিত লোকেরা ওদের বসার জায়গা করে দিল। সবাই অপেক্ষা করল ইমাম বখাশের কথা শোনার জন্য।

ইমাম বখশ দাঁড়িতে হাত বুলালেন।

হ্যাঁ ভাইসব। আমাদের ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি? শান্তভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

একটা অকল্পনীয় নীরবতায় আচ্ছন্ন হলো সমস্ত ঘরটা। সবাই সর্দারের দিকে মুখ ফেরাল।

আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন কেন? সর্দার বললেন, আমাদের মতো গ্রামটা আপনাদেরও।

এখানে যা আলোচনা হয়েছে তা আপনারা জানেন। আশপাশের সব গ্রাম থেকেই মুসলমানদের অপসারণ করা হয়েছে। একমাত্র এ গ্রামটিই বাকি আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে আমারাও চলে যাব।

মিত সিং সশব্দ নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি মনে করলেন, এখন তার কথা বলা ঠিক নয়। তাঁর যা বলার তা তিনি আগেই বলেছেন। তা ছাড়া তিনি শুধু একজন ধর্মীয় ব্যক্তি। গ্রামবাসী তাঁকে যেখানে থাকতে দিয়েছে, সেখানেই তিনি থাকেন। একজন যুবক বলল:

চাচা ইমাম বখশ। একটা কথা আজ আমরা স্পষ্টভাবে বলছি। আমরা যতদিন এখানে আছি ততদিন কেউ আপনাদের স্পর্শ করার সাহস পাবে না। আমরা মরে গেলে আপনারা নিজেদের রক্ষা করবেন।

হ্যাঁ,আরও একজন ঐ কথার সমর্থন করুল উষ্ণভাবে, আগে মরব। আমরা, তারপর তোমরা। তোমাদের ওপর কেউ যদি চোখ উঁচু করে তাকায় আমরা তার মাকে অপদস্থ করব।

মা, বোন ও মেয়ে, অন্যরা তার কথা শুধরে দিল।

ইমাম বখশের চোখ দিয়ে দুফোঁটা অশ্রু নীরবে গড়িয়ে পড়ল। জামার কোণ দিয়ে তিনি তার নাক ঝাড়লেন।

পাকিস্তানে গিয়ে আমরা কি করব? আমরা এখানে জনেছি। আমাদের পূর্বপুরুষরাও এখানে জন্মেছেন। তোমাদের সাথে আমরা বসবাস করছি ভাইয়ের মতো। ইমাম বখশ আর বলতে পারলেন না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। মিত সিং তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারও কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো কান্নায়। উপস্থিত অনেকের কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। অনেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

সর্দার বললেন, হ্যাঁ, তোমরা আমাদের ভাই। আমরা তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়ে ও পোতা-পোতনিসহ যতদিন ইচ্ছা এখানেই থাকবে। তোমাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের কেউ যদি রূঢ় ভাষায় কথা বলে, আমরা তার প্রতিবিধান করব। তোমাদের মাথায় একটা চুলও যেন কেউ স্পর্শ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমরা করব। আমাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যারা তোমাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিরাপত্তা বিধান করবে। কিন্তু চাচা, আমরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসছে। তারা যদি কিছু করে তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবে?

হ্যাঁ, অন্যরা এ কথা সমর্থন করল। আমাদের দিক থেকে তোমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু উদ্বাস্তুরা যদি কিছু করে?

আমি শুনেছি যে, কয়েকটি গ্রাম হাজার হাজার উন্মত্ত লোক ঘিরে রেখেছে। তাদের হাতে আছে বন্দুক ও বর্শা। ওদের প্রতিরোধ করার কোন প্রশ্নই নেই।

আমরা উন্মত্ত জনতাকে ভয় করি না, একজন বলল, ওদের আসতে দাও আগে! আমরা ওদের এমন ঠেঙ্গানি দেব যেন মানো মাজরায় আসার কথা আর কোনদিন চিন্তাও না করে।

এই চ্যালেঞ্জকারীকে কেউ লক্ষ্য করল না। গর্বিত এই বক্তব্য এমনই শূন্য মনে হলো যে, কেউ এটাকে গুরুত্ব দিল না। ইমাম বখশ আবার নাক ঝাড়লেন। ধরা গলায় বললেন, ভাইসব, আমাদের এখন কি করতে উপদেশ দাও তোমরা?

চাচা, গম্ভীর স্বরে সর্দার বললেন, আমার পক্ষে কিছু বলা কঠিন। তবে যে পরিস্থিতিতে আমরা এখন দিন কাটাচ্ছি, তাতে আমার মনে হয়। এই গোলমালের সময় তোমাদের উদ্ধাস্তু শিবিরে যাওয়াই উত্তম। তোমরা ঘরে জিনিসপত্রসহ তালা লাগিয়ে যাও। তোমরা ফিরে না। আসা পর্যন্ত তোমাদের গরু-বাছুর আমরা দেখাশোনা করব।

সদারের এই পরামর্শে সবাই নির্বক হয়ে রইল। গ্রামবাসীরা যেন দম বন্ধ করে রইল। সর্দার নিজেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি যে কথা বলেছেন তার প্রতি দূর করার জন্য তাঁকে অবিলম্বে আরও কিছু বলা দরকার।

গতকাল পর্যন্ত, তিনি আবার শুরু করলেন, কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা তোমাদের নদী পার করে দিতে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু দুদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় নদীর পানি অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। নদী পার হওয়ার জন্য দু'টো উপায় হলো ট্রেন ও রাস্তার ব্রিজ। ঐ দুই জায়গায় কি হচ্ছে তোমরা জান। তোমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আমি পরামর্শ দিই, কয়েক দিনের জন্য ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে। পরে তোমরা চলে এসো পরিস্থিতি শান্ত হলো। আমাদের ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত থাকতে পোর। অত্যন্ত উষ্ণ আবেগে তিনি বললেন, তোমরা যদি গ্রামে থাকার সিদ্ধান্ত নাও, এ সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাব। আমাদের জীবন দিয়ে তোমাদের আমরা রক্ষা করব।

সর্দারের ঐ কথার গুরুত্ব নিয়ে কারও মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রইল না। তারা মাথা নিচু করে রইল। এমন সময় ইমাম বখশ দাঁড়ালেন।

ঠিক আছে, বিষণ্নভাবে তিনি বললেন, আমাদের যদি যেতেই হয় তাহলে আমাদের বিছানা ও জিনিসপত্র সাথে করে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আমাদের বাপ-দাদা কয়েক শ বছরে যে ঘর সৃষ্টি করেন তা খালি করতে আমাদের এক রাতের বেশি সময় লাগবে না।

সর্দার নিজেকে বড় ধরনের অপরাধী হিসাবে মনে করলেন। আবেগে তিনি বিভোর হয়ে পড়লেন। তিনি দাঁড়িয়ে ইমাম বখশকে জড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন।

শিখ ও মুসলমান চাষীরা পরস্পরকে জড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কেঁদে কি হবে, বিশ্বের নিয়ম এটাই–

সুগন্ধযুক্ত কুঞ্জের ছায়ায়
চিরদিন বুলবুল পাখি গান করে না,
চিরদিন বসন্ত থাকে না
থাকে না ফুটন্ত ফুল,
আনন্দ স্থায়ী হয় না চিরকাল,
বন্ধুত্ব থাকে না চিরদিন,
এ কথা যারা জানে না
তারা জীবনকেই জানে না।

এ কথা যারা জানে না, তারা জীবনকেই জানে না, দুঃখের সাথে এ কথা অনেকেই বলল। হ্যাঁ, চাচা ইমাম বখশ। এটাই জীবন।

চোখের পানি মুছতে মুছতে ইমাম বখশ ও তাঁর সঙ্গীরা বৈঠক ত্যাগ করল।

৩.৩ ইমাম বখশ

অন্য কোন মুসলমান বাড়িতে যাওয়ার আগে ইমাম বখশ মসজিদের লাগোয়া তাঁর নিজের বাড়িতেই গেলেন। নূরান তখন বিছানায় শুয়ে ছিল। একটা মাটির প্রদীপ দেয়ালের কুলঙ্গিতে জ্বলছিল।

নূরু, নূরু, তিনি ডাকলেন। তার ঘাড়ে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, ওঠো, নূরু।।

মেয়েটি চোখ খুলল। কি হয়েছে? উঠে সব কিছু গুছিয়ে নাও। কাল সকালেই আমাদের চলে যেতে হবে, নাটকীয়ভাবে তিনি মেয়েকে কথাগুলো বললেন।

চলে যেতে হবে? কোথায়?

আমি জানি না ... হয়ত পাকিস্তানে।

নূরান এক লাফে উঠে বসল। আমি পাকিস্তানে যাব না, সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল।

ইমাম বখশ এমন ভান করলেন যেন তিনি কিছুই শুনতে পাননি। কাপড়চোপড় সব বাক্সে রাখ। রান্নার জিনিসপত্রগুলো চটের ছালার মধ্যে রোখ। মহিষটার জন্য কিছু নিও। ওটাকে আমরা সাথে করে নিয়ে যাব।

আরও দৃঢ়তার সাথে মেয়েটি বলল, আমি পাকিস্তানে যাব না।

তুমি যেতে চাও বা না চাও, ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। মুসলমানরা সবাই আগামীকাল ক্যাম্পে যাচ্ছে।

কে আমাদের তাড়িয়ে দেবো? এটা আমাদের গ্রাম। পুলিশ ও সরকার, এরা কি মরে গেছে?

অবুঝ হয়ো না নূরান! তোমাকে যা বললাম। তাই কর। হাজার হাজার লোক পাকিস্তানে যাচ্ছে, হাজার হাজার লোক পাকিস্তান থেকে আসছে। যারা যাচ্ছে না, তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি কর, সব গুছিয়ে নাও। আমি যাই অন্যদেরকে বলতে হবে, তারা যেন তৈরি হয়ে থাকে।

ইমাম বখশ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মেয়েটি তখনও বিছানার ওপর বসা। নিজের হাত দিয়ে নূরান তার চোখ দু'টো ৱগড়ে নিল। দেয়ালের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ। সে কি করবে তার কিছুই ভেবে পেল না। সারা রাত সে বাইরে কাটাতে পারে ইচ্ছা করলে। তারপর সবাই চলে গেলে সে ঘরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তার পক্ষে একা এ কাজ করা সম্ভব নয়। তদুপরি বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে। তার একমাত্র ভরসা জুগ্গা। মাল্লিকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। হয়ত জুগ্গাও ঘরে ফিরে এসেছে। সে জানত, জুগ্গা ফিরে এসেছে। এ কথা সত্য নয়। কিন্তু সে আশায় বুক বাঁধল এবং এই আশাই তাকে কিছু করার সাহস যোগাল।

বৃষ্টির মধ্যেই নূরান বাইরে বেরিয়ে পড়ল। গলি পথে সে অনেক লোককে দেখতে পেল। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ওরা মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত চটের বস্তা পরে নিজের গন্তব্যস্থলে যাচ্ছিল। সমস্ত গ্রামটাই যেন জেগে আছে! প্রায় প্রতিটি ঘরেই সে দেখতে পেল প্রদীপের অস্বচ্ছ আলোর শিখা। কেউ জিনিসপত্র গোছগাছ করছে, কেউ কেউ তাদের কাজে সাহায্য করছে। অনেকে বন্ধুদের সাথে মামুলি কথাবার্তা বলছে। মেয়েরা মেঝেয় বসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে চোখের পানি ফেলছে। দেখে মনে হয় সব ঘরেই যেন কারও মৃত্যু হয়েছে!

জুগ্গার ঘরের দরজা নাড়াল নূরান। দরজার অপর পাশের শিকল নড়ে উঠল, কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না। ধূসর আলোয় সে দেখতে পেল, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করা। সে লোহার রিংটা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল।

জুগ্গার মা ঘরে ছিল না, সম্ভবত কোন মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। কোন আলো নেই ঘরে। একটা চারপাই-এর পরে নূরান বসল। সে একাকী জুগ্গার মায়ের সামনাসামনি হতে চাইল না, আবার বাড়িতেও ফিরে যেতে চাইল না। তার আশা, কিছু একটা

ঘটে যেতে পারে— হয়ত দেখা যাবে, জুগ্‌গা আসছে। ঘরের দিকে। সে বসে অপেক্ষা করল। আশায় বুক বাঁধল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নূরান লক্ষ্য করল, মেঘের ধূসর ছায়া একে অপরকে তাড়িয়ে ফিরছে। কখনও ঝিরঝিরে, কখনও বা প্রবল বৃষ্টি ঝরিছে। কর্দমাক্ত গলি পথে সে সাবধানে ফেলা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। দরজার কাছে এসে থেমে গেল এ পদশব্দ।

কে একজন দরজায় ধাক্কা দিল।

কে ওখানে? বৃদ্ধ এক মহিলা জিজ্ঞাসা করল।

নূরান ভয়ে আঁতকে উঠল। সে নিচুপ হয়ে রইল।

কে ওখানে? রেগে জিজ্ঞাসা করল ঐ মহিলা, কথা বলছ না কেন?

নূরান উঠে দাঁড়াল। বিড় বিড় করে অস্পষ্ট স্বরে সে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না।

বৃদ্ধা মহিলা গৃহাঙ্গণে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

জুগ্‌গা, জুগ্‌গা তুই? মহিলা ফিস ফিস করে বলল, ওরা তোকে ছেড়ে দিল?

না। আমি নূরান। চাচা ইমাম বখশের মেয়ে, মেয়েটি ভয়ে ভয়ে জবাব দিল।

নুরু? তোকে এ সময় এখানে কে আসতে বলেছে? ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল মহিলা।

জুগ্‌গা কি ঘরে ফিরে এসেছে?

জুল্লার সাথে তোর কি কাজ? নূরুর কথা শেষ না হতেই জুগ্‌গার মা বলল, তুই ওকে জেলে পাঠিয়েছিস। তুই ওকে বদমায়েশ বানিয়েছিস। তোর বাবা কি জানে, তুই বেশ্যার মতো মাঝ রাতে অচেনা পুরুষের বাড়িতে যাস?

নূরানের কান্না বাধা মানল না, আমরা কাল চলে যাচ্ছি।

এ কথায় বৃদ্ধা মহিলার হৃদয় মথিত হলো না।

তোর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক যে, তুই আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিস? তোর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যা।

নূরান দৃঢ়তার সাথে বলল, আমি যেতে পারি না। জুয়া আমাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করেছে।

দূর হ, নষ্টা মেয়ে কোথাকার, বৃদ্ধা মহিলা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। একটা মুসলমান তাঁতীর মেয়ে তুই। বিয়ে করবি একটা শিখ চাষীর ছেলেকে। দূর হ এখান থেকে। তা না হলে আমি তোর বাপ ও সারা গ্রামের লোকদের বলব। পাকিস্তানে তুই চলে যা, আমার জুগ্‌গাকে একা থাকতে দে।

নূরান খুব ব্যথিত হলো। মনে হলো, তার জীবন প্রদীপ নিভে গেছে।

ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। আমার ওপর রাগ করবেন না। জুগ্‌গা ফিরে এলে তাকে বলবেন আমি এসেছিলাম তার কাছ থেকে বিদায় নিতে। মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে বৃদ্ধ মহিলার দুপা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি চলে যাচ্ছি। আর কোনদিন ফিরে আসব না। যাওয়ার সময় আপনি আমার প্রতি কঠোর হবেন না।

জুল্লার মা শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। তার আচরণে আবেগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু অন্তরে সে কিছুটা দুর্বল ও নরম হয়ে গেল। তোর কথা আমি জুগ্‌গাকে বলব।

নূরান কান্না থামাল। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না থামল না। সে তখনও জুল্লার মারা পা জড়িয়ে ছিল। তার মাথা ছিল নত। সে তার নত মাথা আরও ঝুঁকিয়ে জুগ্‌গার মায়ের পায়ের ওপর রাখল।

নূরান যেন কিছু বলতে গিয়েও পারল না।

কি বলতে চাস তুই? মেয়েটি কি যেন বলতে চায় তা সে আশঙ্কা করল।

নূরান বিড় বিড় করে কি যেন বলল!

বিড় বিড় করে কি বলছিস, স্পষ্ট করে কিছু বল না, বৃদ্ধা তাকে জিজ্ঞাসা করল। সে তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। কি হয়েছে তোর?

মেয়েটি মুখের থুথু গিলল।

আমার পেটে এখন জুগ্‌গার বাচ্চা। আমি পাকিস্তান যাওয়ার পরে ওরা যদি জানে আমি শিখের বাচ্চা পেটে ধরেছি, তাহলে ওরা ওকে মেরে ফেলবে।

নূরান বৃদ্ধ মহিলার পায়ের ওপর আবার মাথা রাখার চেষ্টা করল। এবার সে বাধা দিল না। নূরান তার পা দুটি ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

কতদিনের বাচ্চা?

মাত্র কয়েক দিন হলো আমি বুঝতে পেরেছি। এখন দুমাস।

জুগ্‌গার মা কোন কথা বলল না। নূরানের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। তাকে উঠতে সাহায্য করল। তারপর দুজনেই চারপাই-এর ওপর গিয়ে বসল। নূরান কান্না থামাল।

শেষে জুগ্‌গার মা বলল, তোমাকে এখানে রাখা সম্ভব নয়। পুলিশের সাথে আমার নানা সমস্যা আছে। সব কিছু ঠিক হলে এবং জুগ্‌গা ফিরে এলে তোমাকে সে ফিরিয়ে আনবে। তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেখানেই সে তোমাকে আনতে যাবে। তোমার বাপ কি, একথা জানে?

না। সে একথা জানলে আমাকে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে, আর না হয় আমাকে মেরে ফেলবে, মেয়েটি আবার কাঁদতে শুরু করল।

আহ্‌, ঘেনঘেনানি বন্ধ করা, দৃঢ়তার সাথে বৃদ্ধা মহিলা আদেশ দিল। ঐ সময় তোমার একথা খেয়াল ছিল না? আমি তোমাকে বলেছি, জুগ্‌গা ফিরে এসেই তোমাকে নিয়ে আসবে।

নূরান তার কান্না থামাল।

সে যেন বেশি দেরি না করে।

সে তার নিজের গরজেই তাড়াতাড়ি যাবে। সে যদি তোমাকে না নিয়ে আসে, তাহলে তাকে আর একটা বিয়ে করতে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে একটা পয়সা বা গহনা নেই। সে যদি একটা বউ চায় তাহলে তোমাকেই ঘরে আনতে হবে। ভয় করো না।

নূরানের মন একটা অস্পষ্ট আশায় ভরে উঠল। সে অনুভব করল, সে এই বাড়ির লোক এবং এই বাড়ি তার। যে চারপাই-এ সে বসে আছে, মহিষ, জুগ্‌গার মা-সব তার। জুগ্‌গা যেতে ব্যর্থ হলে সে নিজেই ফিরে আসতে পারে। সে তাদের বলতে পারবে যে, সে বিবাহিত। তার সীমাহীন আশার মাঝে তার পিতার চিন্তা এক টুকরা কালো মেঘের মতো মনে হলো। সে তার পিতাকে না বলেই চলে আসবে। তার আশা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো।

সকালে সুযোগ পেলে আমি আবার এসে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাব। আমি এখন যাই, সব কিছু আবার গোছাতে হবে। বিদায়। আবেগভরা মন নিয়ে নূরান বৃদ্ধা মহিলাকে জড়িয়ে ধরল। চাপা স্বরে সে আবার বলল, বিদায়। তারপর সে চলে গেল।

চারপাই-এ বসে রইল জুগ্‌গার মা। ঘন অন্ধকারের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েক ঘণ্টা ধরে।

৩.৪ মানো মাজরায় বেশি লোক ঘুমাতে পারল না

ঐ রাতে মানো মাজরায় বেশি লোক ঘুমাতে পারল না। তারা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গেল। কথা বলল, কান্নাকাটি করুল, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিল। একে অপরকে সান্ত্বনা দিল যে, এই অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। তারা বলল, জীবন প্রবাহ আগের মতোই ফিরে আসবে।

নূরানের ঘরে ফেরার আগেই ইমাম বখশ গ্রামের মুসলমান বাড়ি ঘুরে ঘরে ফিরলেন। ঘরের কোন কিছুই তখনও গোছানো হয়নি। তিনি এতই হতাশ হয়ে পড়লেন যে, নূরানের ওপর রাগ করতে পারলেন না। এই পরিস্থিতি যুবক, বৃদ্ধ সবার জন্যই কষ্টদায়ক। সে হয়ত তার বন্ধুদের সাথে শেষ দেখা করতে গেছে। চটের বস্তা, টিনের পেট ও বাক্স কোথায় আছে তা খুঁজতে লাগলেন তিনি। কয়েক মিনিট পরেই নূরান ঘরে ঢুকল।

তোমার মেয়ে বন্ধুদের সাথে দেখা হয়েছে? ঘুমানোর আগে আমাদের সব গুছিয়ে রাখতে হবে, ইমাম বখশ বললেন।

আপনি শুতে যান। আমি সব গুছিয়ে রাখব। এমন বেশি কিছু গোছাবার নেই। আপনি ক্লান্ত, যান শুয়ে পড়ুন, নূরান জবাব দিল।

হ্যাঁ, আমি কিছুটা ক্লান্ত, চারপাই-এর ওপর বসতে বসতে তিনি বললেন। তুমি কাপড়-চোপড় এখন গুছিয়ে রাখ। সফরের জন্য কিছু রুটি সেঁকার পর সকালে রান্নার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়া যাবে।

একথা বলার পর ইমাম বখশ বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিলেন এবং একটু পরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

নূরানের জন্য গুছিয়ে নেয়ার বিশেষ কিছু ছিল না। একজন পাঞ্জাবী চাষীর মালপত্র বলতে এক সেট বাড়তি কাপড়, একটা লেপ, একটা বালিশ, কয়েকটা কলসি, রান্নার জিনিসপত্র এবং বড়জোর পিতলের একটা থালা ও একটা বা দুটি দস্তার গ্লাস। এ সব কিছুই তাদের একমাত্র আসবাব-চারপাই-এর ওপর এক সাথে রাখা যায়। নূরান তার ও তার বাপের সব কাপড় একটা স্টিলের ট্রাঙ্কে রাখল। ধূসর রংয়ের রং চটা এই বাক্সটা সে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। পরের দিনের জন্য কয়েকটা রুটি বানানোর জন্য সে চুলা জ্বালোল। আধা ঘণ্টার মধ্যে তার রান্নার কাজ শেষ হয়ে গেল। রান্নার জিনিসপত্র ধুয়ে সে একটা বস্তার মধ্যে রাখল। বাকী আটা, লবণ ও মসলা সে বিস্কুট ও সিগারেটের কৌটার মধ্যে রাখল। এ সব কিছুই সে আবার রাখল কেরোসিন রাখার একটা খালি টিনের মধ্যে। গোছানো শেষ। একমাত্র বাকি রইল বালিশের সাথে লেপটা জড়িয়ে রাখা এবং লেপের বাড়তি অংশ চারপাই-এর ওপর গুছিয়ে রাখা। এরপর চারপাইটা মহিষের পিঠের ওপর তুলে দেয়া। ভাঙ্গা আয়নাটা সে হাতে করেই নিয়ে যেতে পারবে।

৩.৫ সারা রাত ধরে বৃষ্টি

সারা রাত ধরে বৃষ্টি ঝরল মাঝে মাঝে। কিন্তু ভোরের দিকে একনাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হলো। গ্রামের যে সব লোক প্রায় সারা রাত জেগে ছিল, তারা বৃষ্টির শব্দে ঘুমিয়ে পড়ল। তদুপরি ভোরের নির্মল ঠাণ্ডা বাতাসের আমেজ তাদের গভীর ঘুমে অচেতন করে দিল।

মোটর গাড়ির হর্ন এবং কর্দমাক্ত নরম মাটিতে অল্প গতির গিয়ারে গাড়ি চালাবার জন্য ইঞ্জিনের বিকট শব্দে সারা গ্রামের লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। গাড়ির বহর মানো মাজরা গ্রামে এসে গাড়ি ঢোকার মত একটা চওড়া রাস্তার খোঁজ করতে শুরু করল। সামনে একটা জীপ। জীপের সাথে লাগানো একটা লাউড স্পীকার। ঐ জীপে ছিলেন দুজন অফিসার- একজন শিখ (ভৌতিক ট্রেনটা আসার পর যিনি আসেন) ও অন্যজন মুসলমান। জীপের পেছনে বারোটির বেশি ট্রাক। একটা ট্রাকে পাঠান সৈন্য এবং অন্য আর একটা ট্রাকে শিখ সৈন্য ভর্তি। প্রত্যেক সৈন্যের কাছে স্টেনগান।

গ্রামের ধারে এসে গাড়ির বহর থেমে গেল। একমাত্র জীপটাই সামনের দিকে এগুতে পারল। আরও কিছু দূর সামনে গিয়ে জীপটা পিপুল গাছের নিচে সিমেন্টে বাঁধানো স্থানে থামল। দুজন অফিসোরই গাড়ি থেকে নামলেন। শিখ অফিসারটি গ্রামের এক লোককে সর্দারকে ডেকে আনতে বললেন। মুসলিম অফিসারটি পাঠান সৈন্যদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে কথা বললেন। তিনি তাদের তিন জন করে এক একটা দলে বিভক্ত হয়ে সব ঘরে গিয়ে মুসলমানদের বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিতে বললেন। কয়েক মিনিট পরে মানো মাজরা গ্রামে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল–পাকিস্তানগামী সব মুসলমান এখনই বেরিয়ে এসো। সব মুসলমান বেরিয়ে এসো। এখনই।

ধীরে ধীরে মুসলমানরা তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। গরুর গাড়ির ওপর বোঝাই করা চারপাই, বিছানাপত্র, টিনের বাক্স, কেরোসিন তেলের টিন, মাটির কলসি, পিতলের আসবাবপত্র ও গরু-ছাগল নিয়ে তারা রাস্তায় নামল। মানো মাজরার অন্য লোকেরা রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওদের বিদায় জানাতে।

দুজন অফিসার ও গ্রামের সর্দার গ্রাম ছাড়লেন সবার শেষে! তাদের পেছনে পেছনে জীপ চলল। ধীর গতিতে। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করছিলেন। বেশির ভাগ আলোচনাই হচ্ছিল মুসলমান অফিসার ও সর্দারের মধ্যে।

গরুর গাড়িসহ বিছানাপত্র, টিনের পত্র, হাঁড়ি-পাতিল নেয়ার ব্যবস্থা আমার নেই। সড়ক পথে এসব গাড়ি পাকিস্তানে যাবে না। আমরা প্রথমে ওদের চন্দন নগর উদ্বাস্তু কাম্পে নিয়ে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে ট্রেনে করে লাহোরে নিয়ে যাব। ওরা শুধু কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, নগদ টাকা পয়সা ও গয়নাপত্র সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে। অন্য সব কিছু ওদের এখানে রেখে যেতে বলুন। আপনি ওদের জিনিসপত্র দেখাশুনা করবেন।।

মানো মাজরার মুসলমানদের পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ খবরটায় সর্দার বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি জানতেন, ওদের উদ্ধাস্তু ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাত্র কয়েক দিনের জন্য এবং কয়েক দিন পরেই ওরা ফিরে আসবে নিজেদের ঘরে।

না সাহেব, আমরা কিছুই বলতে পারিনে, সর্দার বললেন, যদি দুএক দিনের ব্যাপার হতো, আমরা ওদের জিনিসপত্র দেখ-ভাল করতে পারতাম। আপনিও পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন। ওদের ফিরে আসতে হয়ত কয়েক মাস লেগে যাবে। সম্পত্তি খুব খারাপ জিনিস। সম্পত্তি মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে। না, আমরা কিছুই ছুতে পারব না। ওদের ঘরবাড়ি যেন ঠিক থাকে তা আমরা দেখব।

মুসলমান অফিসারটি কিছুটা বিরক্ত হলেন। আপনার সাথে বাদানুবাদ করার সময় আমার নেই। আপনি দেখছেন, আমার কাছে মাত্র বারোটি ট্রাক আছে। গরুমহিষের গাড়ি আমি ট্রাকে তুলতে পারি না।

না সাহেব, অতি দৃঢ়তার সাথে সর্দার বললেন, আপনার যা খুশি তাই বলতে পারেন। আপনি আমাদের ওপর রাগও করতে পারেন। কিন্তু আমরা আমাদের ভাইয়ের সম্পত্তি স্পর্শ

করব না। আপনি কি চান, আমরা ওদের শত্রু হই?

বাহ বাহ, সর্দার সাহেব, হাসতে হাসতে মুসলমান অফিসারটি জবাব দিলেন, সাবাশ, গতকাল আপনারা ওদের খুন করতে চেয়েছিলেন, আজ বলছেন ওরা আপনাদের ভাই। কাল আবার আপনারা আপনাদের মন পরিবর্তন করতে পারেন।

এভাবে আমাদের খোঁচা দিয়ে কথা বলবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব। আমরা সব ভাই এবং ভবিষ্যতেও আমরা ভাই হিসাবে থাকব।

ঠিক আছে সর্দার সাহেব। আপনারা সব একে অন্যের ভাই, অফিসারটি বললেন, আপনার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু ওসব জিনিস। আমি ট্রাকে নিতে পারব না। শিখ অফিসার ও গ্রামের লোকদের সাথে আপনি আলোচনা করে দেখুন। আমি মুসলমানদের সাথে কথা বলছি।

মুসলমান অফিসারটি জীপের ওপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বললেন। তিনি অতি সতর্কতার সাথে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন।

আমাদের কাছে মাত্র বারোটি ট্রাক আছে। আপনারা যারা পাকিস্তানে যেতে চান, তাদের সবাইকে দশ মিনিটের মধ্যে গাড়িতে উঠতে হবে। এরপর আমাকে অন্য গ্রামের মুসলমানদের আনতে যেতে হবে। সাথে করে যেসব জিনিস নেয়া যায়, সেই সব জিনিসই কেবল নেবেন, অন্য কিছু নেবেন না। গরু-ছাগল, গরুর গাড়ি, চারপাই, কলসি এবং এ ধরনের জিনিস আপনারা গ্রামের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে রেখে যান। সময়-সুযোগ পেলে এসব জিনিস আমি পরে আপনাদের কাছে পৌছিয়ে দেব। সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনাদের দশ মিনিট সময় দিলাম। এরপর গাড়ি চলে যাবে।

মুসলমানরা তাদের গরুর গাড়ি ফেলে জীপের চারপাশে এসে জমায়েত হলো। তারা অফিসারের কথার প্রতিবাদ জানাল এবং চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করল। মুসলমান অফিসারটি জীপ থেকে নেমে মাইক্রোফোনের কাছে গেলেন।

চুপ করুন। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দেবে। গাড়িতে আপনারা উঠুন, বা না উঠুন, সে ব্যাপারে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।

একটু দূরে যে সব শিখ চাষী দাঁড়িয়ে ছিল, তারা অফিসারের ঐ আদেশ শুনতে পেল। তারা শিখ অফিসারের কাছে গোল পরামর্শের জন্য। অফিসারটি ওদের উপস্থিতি গ্রাহ্যই করল না। কাদামাটির রাস্তায় চলমান গাড়ি, গরু-বাছুর ও ট্রাকের বহরের দিকে লক্ষ্য করে তিনি গর্বের সাথে নিজের বর্ষাতি কোটের উঁচু কলারের দিকে তাকাচ্ছিলেন বার বার।

কেন, সর্দার সাহেব, ভয়ে ভয়ে মিত সিং জিজ্ঞাসা করলেন, গ্রামের সর্দার কি ঠিক কথা বলেননি। কারও উচিত নয়, অন্যের সম্পত্তি স্পর্শ করা। এতে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থাকে সব সময়।

মিত সিং-এর আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখলেন শিখ অফিসারটি। তারপর বললেন, আপনি ঠিক কথা বলেছেন ভাইজি। এতে ভুল বুঝাবুঝির ভয় থাকেই। কারও উচিত নয় অন্যের সম্পত্তি স্পর্শ করা। অন্যের স্ত্রীর দিকেও কারও তাকানো উচিত নয়। একজনের জিনিস অন্যে নিয়ে যাক, একজনের বোনের সাথে অন্য কেউ ঘুমোক-এসব কিছু একজন কেবল দেখতে পারে! আপনি বুঝতে পারছেন, লোকে চায় ওরা পাকিস্তানে যাক। আপনার সামনে কি আপনার মা-বোন ধর্ষিত হয়েছে, আপনাকে কি উলঙ্গ করা হয়েছে? আপনাকে লাথি মেরে পিছনে থুথু নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে?

অফিসারের এই ধরনের উক্তি উপস্থিত চাষীদের মুখে চপেটাঘাতের শামিল। কেউ যেন বিক্রপাত্মক হাসি হাসল। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। মাল্লি ও তার পাঁচজন সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েকজন যুবক উদ্বাস্তু। ওরা শিখ মন্দিরে থাকে। ওদের কেউ মানো মাজরার বাসিন্দা নয়।

স্যার, এই গ্রামের লোকেরা তাদের আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত, মাল্লি হাসতে হাসতে বলল। ওরা নিজেদেরই দেখ-ভাল করতে পারে না, অন্যের ভাল-মন্দ দেখবে কি

করে? কিন্তু চিন্তা করবেন না। সর্দার সাহেব, আমরা মুসলমানদের সম্পত্তি দেখব। ঐ অফিসারকে আপনি বলে দিন, ওসব জিনিস আমাদের জিম্মায় রেখে যেতে। গ্রামের লোকেরা যেন ওসব জিনিস লুঠ না করে, তা নিশ্চিত করার জন্য আপনি কয়েকজন সৈন্য মোতায়েন করে দিন। সব জিনিস আমাদের কাছে নিরাপদে থাকবে।

সময়টা হট্টগোলের। মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছিল, চিৎকার করছিল সব শক্তি দিয়ে। অফিসারটির শেষ সিদ্ধান্ত শোনার পরও গ্রামের লোকেরা তাকে ঘিরে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। তারা একাধিক প্রস্তাবও রাখল অফিসারটির কাছে। তিনি তাঁর শিখ সহকর্মীর কাছে এগিয়ে গেলেন ভীত বিহ্বল স্বধর্মীয় মুসলমানদের নিয়ে।

যে সব জিনিস রেখে যাচ্ছি তা কি আপনি বুঝে নিতে পারবেন?

শিখ অফিসারটি কিছু বলার আগেই চারদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তিনি চুপ করে রইলেন। গোলমাল থেকে নিজেকে। মুসলমান অফিসারটি ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বললেন, চুপ করুন।

গোলমাল থেমে গেল। আবার কিছু বলতে শুরু করলেন তিনি। হাতের তর্জনী তুলে প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে বললেন :

পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। হাতে করে যা নেয়া যায় তাই নিয়ে ট্রাকে উঠুন। যাঁরা উঠবেন না, তাঁরা এখানে থেকে যাবেন। এটাই শেষ সময়। আমি আবার বলছি, এটাই শেষ সময়।

সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, পাঞ্জাবী ভাষায় শিখ অফিসারটি কোমল স্বরে। বললেন, পাশের গ্রামের এই লোকগুলো গোলমাল না থামা পর্যন্ত ওদের গাড়ি, গরু-বাছুর, ঘর দেখবে-এমন ব্যবস্থা করেছি। আমি সব মালের একটা তালিকা তৈরি করে আপনার কাছে পরে পাঠিয়ে দেব।

তাঁর সহকর্মী এ কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর ঠোঁটে ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি খেলে গেল। মানো মাজরার শিখ ও মুসলমানরা অসহায়ভাবে তা দেখল।

কোনো ব্যবস্থা করার সময় ছিল না। এমন কি বিদায় কথাটা বলারও সময় ছিল না। ট্রাকের ইঞ্জিনে স্টার্ট দেয়া হলো। পাঠান সৈন্যরা মুসলমানদের ঘিড়ে তাড়িয়ে নিয়ে এক দু'মিনিটের জন্য তাদের গরুর গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। তারপর নিয়ে গেল ট্রাকের কাছে। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। কাদা-মাটির রাস্তায় সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে ফিরছিল। গ্রামের লোকেরা একে অপরকে ভাল করে দেখারও সুযোগ পেল না। ট্রাকে উঠে দূরে দাঁড়ানো গ্রামবাসীর দিকে তাকিয়ে তারা হাত নেড়ে বিদায় নিল। মুসলমান অফিসারটি জীপে চড়ে ট্রাকগুলোর চারপাশে একবার ঘুরে এলেন সব কিছু ঠিক আছে কি না তা দেখার জন্য। এরপর তিনি শিখ অফিসারের কাছে এলেন বিদায় নিতে। যন্ত্রের মতো তাঁরা করমর্দন করলেন। তাঁদের মুখে হাসি দেখা গেল না, আবেগের কোন লক্ষণও স্পষ্ট হলো না। ট্রাকের সামনে গিয়ে জীপ দাঁড়াল। মাইক্রোফোনে ঘোষিত হলোঃ তারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। অফিসারটি জোর দিয়ে বললেন, পাকিস্তান। তার সৈন্যরা একযোগে বলল চিরদিনের জন্য। গাড়ির বহর ছুটিল চন্দননগরের দিকে। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল, শিখরা দাঁড়িয়ে দেখল। চোখের পানি মুছল তারা দু'হাত দিয়ে। তারপর ঘরে ফিরে গেল বেদনাভরা হৃদয় নিয়ে।

মানো মাজরার দুঃখের পেয়ালা তখনও পূর্ণ হয়নি। শিখ অফিসারটি সর্দারকে ডেকে পাঠালেন। সর্দারের সাথে গ্রামের সবাই এলো। কেউ ঘরে একাকী থাকতে চাইল না। শিখ সৈন্যরা গ্রামের সব লোককে ঘিরে ফেলল। শিখ অফিসারটি ঘোষণা দিলেন যে, তিনি মাল্লিকে অপসারিত মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির জিম্মাদার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার বা তার লোকের কোন কাজে কেউ বাধা দিলে তাকে গুলি করা হবে।

মাল্লির দলের লোক ও উদ্বাস্তুরা সময়ক্ষেপণ না করে গাড়ি থেকে গরুর বাঁধন খুলে দিল। গাড়িতে রাখা মালপত্র লুঠ করল। তারপর গরু ও মহিষগুলোকে তাড়িয়ে দিল।

৪.০১ কর্ম

ঐদিন সকালে গ্রামের লোকেরা তাদের বাড়িতে বসে রইল। খোলা দরজার মধ্য দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। তারা দেখল, মাল্লির লোকজন ও পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা মুসলমানদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠ করছে। তারা দেখল, গরু-ছাগলকে নির্দয়ভাবে পেটাতে পেটাতে নিয়ে যেতে তারা দেখল, শিখ সৈন্যরা যাচ্ছে, আসছে–যেন মাল্লির ইশারায় তারা কাজ করছে। যন্ত্রণাকাতর পশুগুলোর কাতর ধ্বনি তারা শুনতে পেল ঘরে বসেই। গৃহপালিত মোরগ-মুরগির আর্ত ডাক, ঝটপটানি ও ছুরির আঘাতের পর তাদের নীরবতা তারা উপলব্ধি করল। তাদের কিছুই করার ছিল না— শুধু দেখা আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া।

মাঠ থেকে ছত্রাক তুলে গ্রামে ফিরে একটা রাখাল ছেলে জানোল যে, নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তার কথায় কেউ কান দিল না। তারা এই ইচ্ছা পোষণ করল যে, নদীর পানি আরও বাড়ুক এবং পুরো মানো মাজরা গ্রামটাকে ডুবিয়ে দিক। তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পশু-পাখিসহ তারাও নিমজ্জিত হোক, ঐ পানিতে। কিন্তু তাদের শর্ত একটাই, ঐ পানিতে নিমজ্জিত হতে হবে মাল্লি, তার দলের লোক, পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু ও সৈন্যদেরও।

গ্রামের লোকেরা যখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে হতাশা ব্যক্ত করছিল এবং গভীর আর্তনাদে ফেটে পড়ছিল তখন বৃষ্টি ঝরছিল অঝোর ধারায়। শত্রুঘ্ন নদীর পানি বাড়ছিল ক্রমান্বয়ে। তীর ছাপিয়ে পানি আশপাশের জমি প্লাবিত করল, শীতকালে পানি সংরক্ষণের জন্য নির্মিত চ্যানেলের মুখে খিলানের ভাররক্ষক স্তম্ভের দুপাশে পানির ঢেউ এসে আছড়াতে লাগল। নির্মিত ঐ চ্যানেলের চিহ্ন আর দেখা গেল না, সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল বাড়তি পানির নিচে। এই পানির ঢেউ বিস্তৃত হলো বড় ব্রিজের পাশ পর্যন্ত। মানো মাজরা গ্রামের চাষাবাদী জমিতে যে বাঁধটি; প্রয়োজনের সময় পানি সরবরাহ করে, সেই বাধেও পানির ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল। নদীর তীরে ছোট ছোট যে সব উঁচু টিলা ভূমি ছিল তাও ডুবে গেল। পানির ওপর দেখা গেল। আগাছার অগ্রভাগ। সামুদ্রিক পাখি ও শঙ্খ জাতীয় পাখি যে সব গাছে রাত কাটাত, সেই সব গাছের আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে তারা উড়ে চলে গেল ব্রিজের ওপর। কয়েকদিন ধরে ঐ লাইন দিয়ে কোন ট্রেন যাতায়াত করেনি।

বিকালের দিকে জনৈক গ্রামবাসী একাধিক বাড়ির কাছে চিৎকার করে বলতে লাগলঃ ওহে বানটা সিং, নদীর পানি বাড়ছে! ও দলিপ সিং, নদীর পানি বেড়ে গেছে! শোন তোমরা, বাঁধের কাছ পর্যন্ত পানি এসে গেছে৷ অবসন্ন দৃষ্টি মেলে। ওরা বলল: এ, খবর আমরা আগেই পেয়েছি। এরপর আর একজন লোক এসে খবর দিল, নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর আর একজন, পরে আরও একজন। সবাই বললঃ তোমরা কি জান, নদীর পানি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে!

শেষে সর্দার সাহেব বেরুলেন সব কিছু নিজের চোখে দেখতে। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিু নদীর পানি বেড়েছে। দু'দিনের বৃষ্টিতে এ অবস্থা হয়নি। পর্বতের বরফগলা পানির কারণেই এ অবস্থা হয়েছে। বন্যার পানি রোধ করার জন্য হয়ত খালের মুখের স্লুইসগেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে নদী ছাড়া পানি চলে যাওয়ার আর কোন পথ খোলা নেই। নদীর পানির মৃদু ঢেউ এখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, নদীর পাড় ভাঙ্গার কারণে সাদা পানির রং মেটে হয়ে গেছে। ব্রিজের স্তম্ভগুলো এখনও দৃঢ় থাকায় নদীর পানির উন্মত্ত ঢেউ ওখানে আছড়ে পড়ে ফিরে আসছে। আশপাশের ছোট ছোট পথে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে, স্তম্ভের ছুচালো শীর্ষে পানির প্রবাহ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করছে। বৃষ্টির পানি ফোঁটায় ফোঁটায় এখনও ঝরছে। নদী ও সমতল ভূমি একাকার হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায় সমগ্র এলাকা জুড়ে। শত্রুঘ্ন নদীর এ দৃশ্য সত্যি ভয়াবহ!

সন্ধ্যার দিকে মানো মাজরার লোকেরা মুসলমানদের কথা, মাল্লির অপকর্মের কথা ভুলে গেল। আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল নদীর পানি। ঘরের মেয়েরা ছাদের ওপর

দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল। লোকেরা মাঝে মাঝে বাঁধের করতে লাগল। সূর্যাস্তের আগে সর্দার সাহেব। আবার নদীর অবস্থা দেখতে পেলেন। বিকালে তিনি যে অবস্থা দেখেছিলেন, তার চেয়ে পানি এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব ঝোপঝাড় আগে পানির অনেক ওপরে ছিল, এখন তার সবটাই ডুবে গেছে। ঐ সব গাছের পাতা ও পাতলা ডাল এখন পানির ওপর ভাসছে। গত কয়েক বছরে শত্রুঘ্ন নদীর পানি এত বেড়েছে কি না তাঁর মনে পড়ে না। বাঁধ থেকে মানো মাজরা এখনও অনেক দূরে। মাটির বাঁধটা এখনও দৃঢ় ও নিরাপদ আছে। তবু বলা যায় না, সারা রাত ধরেই সতর্ক থাকা দরকার। তিনজন করে চারটি দল সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাঁধে প্রহরায় থাকতে হবে এবং তারা এক ঘণ্টা অন্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে গ্রামবাসীকে অবহিত করবে। বাকিরা সব তাদের বাড়িতেও থাকবে।

সর্দারের ঐ সিদ্ধান্তে সবাই বাড়িতে আরামে ঘুমাল। নিরাপদে থাকার কারণে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হলো না। সর্দার সাহেব অবশ্য নিজে ভালমতো ঘুমাতে পারলেন না। মধ্যরাতের কিছু পরে পাহারারত তিনজন লোক ফিরে এসে চিৎকার করে কথা বলছিল। তাদের কথায় উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছিল। নদীর পানি বেড়েছে কিনা, ধূসর চাঁদের আলোয় তারা বুঝতে পারেনি। তাদের কথায় এ সম্পর্কে কিছু ছিল না। তবে তারা শুনেছে, মানুষ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। পানির মধ্য থেকেই তারা ঐ আর্ত চিৎকার শুনেছে। নদীর ওপারে বা নদী থেকেই ঐ চিৎকার শোনা গেছে। সর্দার তাদের সাথে করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর টর্চ লাইটটাও সাথে নিলেন।

চারজন লোক বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে শক্রিান্ন নদীকে দেখলেন। কালো একটা খন্ডের মত দেখা যাচ্ছে নদীকে। সর্দারের হাতের টর্চের সম্মুখভাগের সাদা গোলাকার অংশ থেকে বিচ্ছুরিত আলো পুরো নদীটা একবার নিরীক্ষণ করে এলো। চঞ্চল পানি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। তারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে কিছু শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু নদীর পানির ওপর পড়া বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ ছাড়া তারা আর কিছুই শুনতে পেল না। সর্দার তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কি মানুষের না শিয়ালের শব্দ শুনেছে। তারা যেন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল। একজন অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা তো স্পষ্ট মানুষের চিৎকার শুনেছি। তাই না করনাইলা?

হ্যাঁ। খুবই স্পষ্ট চিৎকার। হায়, হায় বলে কেউ যেন আর্তচিৎকার করছিল।

ওরা চারজন হেরিকেনের চারপাশে একটা গাছের তলায় জড়ো হয়ে বসল। বর্ষাতি হিসাবে তারা যে চটের ছালা পরেছিল তা ভিজে গেছে। তাদের পরিধেয় জামা-কাপড়ও ভিজে গেছে। ঘন্টাখানেক পরে বৃষ্টির ধারা কমে এলো। প্রথমে ঝির ঝিরে বৃষ্টি এবং পরে একেবারে থেমে গেল। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ দেখা গেল মেঘের ফাঁক দিয়ে। চাঁদের আলো পানির ওপর প্রতিবিম্বিত হওয়ায় নদীর এপার-ওপার একটা আলো-পথের সৃষ্টি হলো। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় পানির ঢেউয়ের ফলে সৃষ্ট বুদ্বুদ স্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল।

ডিম্বাকার আকারের একটা কালো বস্তু ব্রিজের খিলানের সাথে আঘাত খেয়ে মানো মাজরার দিকের বাঁধের দিকে স্রোতে ভেসে এলো। বস্তুটা দেখতে বড় ড্রামের মতো, এর চারপাশে লাঠি বাঁধা। বস্তুটা কিছুটা এগিয়ে গেল, কিছুটা পিছিয়ে গেল এবং এক সময় নদীর এক পাশে সরে গেল। স্রোতের টানে বস্তুটা চাঁদের আলোর পথে পৌঁছল এবং বাঁধের ওপর বসে থাকা ঐ চারজন লোক থেকে তা খুব দূরে ছিল না। এটা ছিল একটা মৃত গরু। এর পেটটা এমনভাবে ফুলে উঠেছিল যে, দেখতে অনেকটা বড় ব্যারেলের মতো। এর পা কাঁটা ছিল শক্ত এবং তা ছিল। ওপরের দিকে উত্থিত। এর পর ভাসতে দেখা গেল কিছু ঘাস-বিচালি এবং তারপর এক বোঝা কাপড়।

এসব দেখে সর্দার বললেন, দেখে মনে হয় কোন গ্রাম বন্যায় ভেসে গেছে। চুপ করুন! শুনুন চাপা গলায় এক জন বলল। কারও বিলাপের মূর্ছিনা নদীর অপরদিকের কিনারা থেকে শোনা গেল।

তুমি শুনতে পাচ্ছে?

চুপ কর!

তারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে এ শব্দ শোনার অপেক্ষায় রইল।

না। এ শব্দ কোন মানুষের হতে পারে না। ওটা ছিল গুড় গুড় শব্দ। ওরা আবার শুনল। হ্যাঁ, ওটা গুড় গুড় শব্দই। একটা ট্রেনের শব্দ। এর ছশ দুশ শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। এর পর ওরা দেখল ইঞ্জিনের অগ্রভাগ এবং ক্রমে ট্রেনের পুরো অংশ। ইঞ্জিনের ধোঁয়া বেরুনোর ফাঁক দিয়ে এমনভাবে আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে, যেন মনে হয়, কেউ আতসবাজি পোড়াচ্ছে। ট্রেনের কামরায় কোন খভাগের লাইটও জুলছে না। ব্রিজের ওপর ট্রেনটা আসার পর ব্রিজের ওপর বসা সামুদ্রিক পাখি নীরবে নদীর দিকে আর শংখ। থামল। ট্রেনটা এলো পাকিস্তান থেকে।

ট্রেনে কোন বাতি নেই।

ইঞ্জিন থেকেও হুইসেল বাজল না।

এটাও ভৌতিক ট্রেনের মতো।

ভগবানের দোহাই, এ ধরনের কথা বলে না, সর্দার বললেন, এটা মাল ট্রেনও হতে পারে। এর যে সাইরেন আছে তা তোমরা শুনেছ। আমেরিকার তৈরি এই নতুন ইঞ্জিন এমনভাবে শব্দ করে যেন কেউ খুন হয়েছে।

না সর্দার, আমরা প্রায় এক ঘণ্টা আগে শব্দ শুনেছি; একই শব্দ শুনলাম ট্রেন আসার আগে, একজন বলল।

এখন আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কারণ ইঞ্জিনটা এখন আর কোন শব্দই করছে না।

রেল লাইনের উল্টো দিকে আগে যেখানে হাজার বেশি। মৃতদেহ পোড়ানো হয়েছিল থেকে একটা শিয়াল দীর্ঘ একটা বিলাপপূর্ণ ডাক দিল। ঐ ডাকের সাথে আরও শিয়াল ডেকে উঠল। এক্যোগে। লোকগুলো ভয়ে আঁতকে উঠল।

শিয়ালের কান্না। কোন লোক মারা গেলে মেয়েরা যেমন কাঁদে ঠিক সেই ধরনের কান্না, সরদার বললেন।

না না, একজন প্রতিবাদ করে বলল, না। এটা মানুষের কান্না। আপনার কথা। যেভাবে আমি স্পষ্ট শুনছি, ঠিক সেভাবেই ঐ কান্না শোনা যাচ্ছে।

ওরা বসে শুনল, দেখল। বন্যার স্রোতে ভেসে আসছে পৃথক করা যায় না। এমন অদ্ভুত ধরনের বস্তু। আকাশের চাঁদ অস্তমিত হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য অন্ধকার ঘনিয়ে এ। এর পর পূর্বকাশ হলো ধূসর। লম্বা লাইন দিয়ে শব্দ করে বাদুড় উড়ে গেল নদীর ওপারে। কাকেরা তাদের ঘুমের মধ্যে থেকেও কা কা শব্দে মেতে উঠল। ঝোপের মধ্য থেকে কোয়েলের তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে এলো। মনে হলো, সমগ্র জগতটাই যেন জেগে উঠেছে।

মেঘ সরে গেল উত্তর দিকে। আস্তে আস্তে সূর্যের আলো। বৃষ্টিভেজা সমতল ভূমিতে সূর্যরশ্মি কমলা রংয়ের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত। সব কিছুই যেন সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠল। নদীর পানি আরও বেড়েছে। এর কর্দমাক্ত পানিতে ভেসে যাচ্ছে গরুর গাড়ি, ফুলে-ফেপে ওঠা গরুর মৃতদেহ-তখনও গাড়ির সাথে বাঁধা। ঘোড়ার মৃতদেহ পানির মধ্যেই ওলট-পালট হয়ে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। মনে হয়, ঘোড়া তার পিঠ ওপরের দিকে রাখার চেষ্টা করছে তখনও। পুরুষ ও মহিলার মৃতদেহও ভাসছে, কাপড় জড়িয়ে আছে ওদের নিস্প্রাণ দেহে। ছোট ছোট শিশু যেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পানির ওপর, পানিতে হাত দুটা ভাসছে। পশ্চাৎ দিকটা মাঝে মাঝে ডুবছে, আবার ভাসছে। আকাশে অসংখ্য চিল ও শকুনের আনাগোনা শুরু হলো। নদীর পানির ওপরে ভাসমান মৃতদেহের ওপর তারা নিরাপদে এসে বসছে। মৃতদেহ উল্টে না যাওয়া পর্যন্ত তারা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। এর পর মৃতদেহের কিছু টুকরা নিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই পানির ওপর পড়ে যাচ্ছে ঐ সব টুকরা।

দুঃখের সাথে সর্দার বললেন, রাতে বোধ হয় কিছু গ্রাম বন্যায় ভেসে গেছে।

তার একজন সঙ্গী বলল, রাতে গাড়িতে গরু বেঁধেছে কে?

ঠিক কথা। গরুগুলো গাড়ীর সাথে জোড়া থাকবে কেন?

ব্রিজের খিলাদের দিক থেকে বহু লোকের বিকৃত মৃতদেহ ভেসে আসতে দেখা গেল। সেতুর ভার রক্ষার জন্য নির্মিত নির্মিত স্তম্ভে এসে ঐসব মৃতদেহ আঘাত খেয়ে থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য। এর পর ঘূর্ণায়মান পানির স্রোতে ঘুরতে ঘুরতে যাত্রা করল অনির্দিষ্ট ঠিকানার উদেশে। লোকগুলো ব্রিজের দিকে এগিয়ে গেল নদীর ধারে পড়ে থাকা কয়েকটি মৃতদেহ দেখতে।

মৃতদেহগুলো ওরা পরখ করে দেখল।

সরদার, ওরা ডুবে মরেনি। ওদের মারা হয়েছে।

পানির ওপর সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ সটান শুয়ে আছে। ওর হাত দু'টো দুদিকে এমনভাবে প্রসারিত ছিল যে, মনে হয়, ওকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। হাঁ করা মুখের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে দাঁতের মাড়ি দেখা যায়, দাঁত নেই। কাপড় দিয়ে তার চোখ দু'টো বাঁধা, মাথার চুলগুলো এমন এলোমেলোভাবে আছে যেন মনে হয় সাধুর বেশ। তার ঘাড়ে একটা গভীর ক্ষত, ঐ আঘাতটা নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। বৃদ্ধের হাতের ওপর একটা শিশুর মাথা। ওর পিঠেও একটা গভীর ক্ষত। নদীর স্রোতে আরও মৃতদেহ ভেসে আসছে। পাহাড়ের ওপর গাছ কেটে তা সমতল ভূমিতে আনার জন্য যেমন নদীতে ভাসমান অবস্থায় আনা হয়, তেমনিভাবে ভেসে আসছে মৃতদেহ-মানুষ, পশুর। কিছু মৃতদেহ পুলের নিচের পানির মধ্য থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু মৃতদেহ পুলের খুঁটির সাথে আঘাত খেয়ে উল্টে-পাল্টে আশেপাশে সরে যাচ্ছে, যেন তাদের ক্ষত স্থান দেখাবার জন্য। অতঃপর স্রোতের আওতায় এসে তারাও চলে যাচ্ছে। কারও হাত-পা নেই, কারও পেট কার্ট অনেক মহিলার স্তন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা। সূর্যের কিরণসিক্ত নদীতে ওরা ভেসে যাচ্ছে। কখনও ডুব। ছে, কখনও ভাসছে। ওদের ওপরে আছে ছিল আর শকুন।

সর্দার ও তাঁর সঙ্গীরা মাথার পাগড়ির একটা অংশ মুখে দিল। গুরু, আমাদের প্রতি দয়া করা, কেউ ফিসফিস করে বলল।

কোথাও নির্মম খুনখারাবী হয়েছে। পুলিশকে আমাদের জানানো দরকার।

পুলিশ? আর একজন লোক বিরক্ত প্রকাশ করে বলল, ওরা কি করবে? ওরা তো শুধু ডাইরীতে লিখে রাখবে।

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওরা গ্রামে ফিরল। গ্রামের লোকদের ওরা কি বলবে ঠিক করতে পারল না। নদীর পানি আরও বেড়েছে? আরও গ্রাম বন্যা প্লাবিত হয়েছে? নদীর উজানে গণহত্যা হয়েছে? শত্রুঘ্ন নদীতে কি শয়ে শয়ে লাশ ভাসছে? না শুধু চুপ করেই থাকবে?

ওরা যখন গ্রামে ফিরে এলো, ওদের কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য গ্রামবাসীরা কোন আগ্রহ দেখাল না। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা স্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। কয়েক দিন পর দিনে একটা ট্রেন মানো মাজরায় এসে থেমেছে। ট্রেনের ইঞ্জিন যেহেতু পূর্বদিকে, সেহেতু এটা পাকিস্তান থেকে এসেছে। ঐ সময়ও স্টেশনে বহু সৈন্য ও পুলিশকে দেখা গেছে। পুরো স্টেশন এলাকা ওরা ঘিরে রেখেছিল। বাড়ির ছাদ থেকেই ঐ লাশ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা শিউরে উঠেছিল। শিশু ও মহিলার ওপর নির্যাতনের কথা লোকে আলোচনা করেছে। লাশগুলো কাদের তা কেউ জানতে চায়নি বা নদীর ধারেও ওরা যায়নি মৃতদেহ দেখতে। স্টেশনে আরও নতুন কিছু দেখার আগ্রহে ওরা বাড়ির ছাদ ছেড়ে যায়নি কোথাও। শেষ এই ট্রেনটার পর আরও তো ট্রেন আসতে পারে!

ট্রেনের কামরায় কি আছে তা নিয়ে তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ওরা নিশ্চিত ছিল যে, এখনই সৈন্যরা বেরিয়ে আসবে তেল ও কাঠ সংগ্রহ করতে। দেয়ার মতো বাড়তি তেল তাদের কাছে নেই, যে কাঠ আছে তা ভেজা। ফলে সহজে তা জ্বালানো কষ্ট হবে। কিন্তু সৈন্যরা এলো না। দেখা গেল, ঐ স্থানে কোথা থেকে একটা বুলডোজার এলো।

ক্টেশনের উল্টো দিকে মানো মাজরা গ্রামের পাশে মাটি খুঁড়তে শুরু করল ঐ বুলডোজারটি। মনে হলো মাটি খুঁড়ে সে খেয়ে ফেলল এবং এর পর পরই মুখ উঁচু করে চিবিয়ে তা এক পাশে ফেলে দিল। কয়েক ঘণ্টা ধরে সে এ কাজই করল। প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা ত্রিকোণ বিশিষ্ট একটা গভীর খাদ সৃষ্টি হলো। খাদের দুপাশে মাটির পাহাড় দেখা গেল দূর থেকে। কিছুক্ষণের জন্য থামল বুলডোজারটি। যে সব সৈন্য ও পুলিশ অলসভাবে বুলডোজারের মাটি খোঁড়া দেখছিল, তাদের ডাকা হলো। লাইন করে ওরা প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেল। দেখা গেল, দুজন সৈন্য একটা করে স্ট্রেচার নিয়ে খাদের দিকে এগিয়ে আসছে। খাদের কাছে এসে স্ট্রেচার কাৎ করে সৈন্যরা স্ট্রেচার খালি করে আবার ছুটছে প্লাটফর্মের দিকে, স্ট্রেচার ভর্তি করে আরও কিছু আনতে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে একই কাজ করুল সৈন্যরা। এর পর আবার বুলডোজার গর্জে উঠল। মুখ খুলে সে তার নিজের খোড়া মাটি খের মধ্যে পুরে বমি করার মতো করে ঐ মাটি আবার উগরে দিল খোড়া গর্তের মধ্যে। সমতল ভূমির সাথে গর্তের মাটি সমান না হওয়া পর্যন্ত সে এ কাজ করল অত্যন্ত দ্রুত। আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় দেখা গেল। ঐ গর্তের স্থানটি। শিয়াল ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর কবল থেকে রক্ষার জন্য স্থানটির পাহারায় নিযুক্ত রইল দুজন সৈন্য।

৪.০২ প্রার্থনার জন্য গুরুদুয়ারায়

ঐ দিন সন্ধ্যায় গ্রামের প্রত্যেক লোকই প্রার্থনার জন্য গুরুদুয়ারায় এসে উপস্থিত হলো। একমাত্র গুরুর জন্মদিন বা নববর্ষের দিন ছাড়া গুরুদুয়ারায় এমন উপস্থিতি আগে কখনও দেখা যায়নি। গুরুদুয়ারায় সাধারণত নিয়মিত যাতায়াত করে বৃদ্ধ লোক ও মহিলারা। অন্যরা সাধারণত আসে তাদের ছেলেমেয়ের নাম রাখতে, দীক্ষা নেয়ার জন্য, বিয়ের সময় বা অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময়। গ্রামের মহাজনের খুন {য়ার পর থেকে প্রার্থনার সময় লোকের উপস্থিতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। তারা যেন উ আর একা একা থাকতে চায় না। মুসলমানরা চলে যাওয়ার পর তাদের শূন্য বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের লোকেরা দ্রুত এগিয়ে যায়, ভায় ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকায় না। তাদের আশ্রয় নেয়ার একমাত্র স্থান গুরুদুয়ারা। এখানে আসার জন্য তাদের কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। ওরা এখানে এসে এমন ভান করে যেন এখানে ওদের প্রয়োজন হতে পারে। মহিলারা আসে তাদের সাথে। আর মহিলারা সাথে করে নিয়ে আসে তাদের ছেলেমেয়েদের। যে ঘরে পবিত্র গ্রন্থখানি রাখা আছে, সেই হল ঘর ও পাশের দুটি ঘর উদ্বাস্তু ও গ্রামের লোক দিয়ে ভরা। আঙ্গিনার বাইরে ওদের জুতা সারি দিয়ে রাখা আছে পরিচ্ছন্নভাবে।

হারিকেনের আলোয় মিত সিং সান্ধ্য প্রার্থনার শ্লোক পড়লেন। একজন লোক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে পশমের ফুলঝড় আন্দোলিত করল মৃদুভাবে। প্রার্থনা শেষে উপস্থিত স্তবগান করল। মিত সিং রুচিহীন, অথচ জাঁকালো সিল্কা কাপড়ে পবিত্র গ্রন্থখানি ভাঁজ করে। সারা রাতের মতো তুলে রাখলেন। প্রার্থনাকারীরা উঠে দাঁড়াল, দু'হাত এক সাথে করে নীরব রইল। মিত সিং তাঁর জন্য নির্ধারিত স্থানে এসে সবার সামনে দাঁড়ালেন। তিনি দশ জন গুরু, শিখ শহীদ ও শিখদের মন্দিরের নাম বার বার উচ্চারণ করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করলেন। উপস্থিত সবাই হে গুরু বলে মিত সিং-এর প্রতিটি কথার মাঝে মাঝে আমেন বলল। হাঁটু গেড়ে বসে তারা মাটিতে মাথা ঠেকাল। এভাবেই শেষ হলো সন্ধ্যার অনুষ্ঠান। মিত সিং নিজের স্থান ছেড়ে বাইরে লোকদের সাথে মিলিত হলেন।

এটা ছিল একটা পবিত্র অনুষ্ঠান। শিশুরাই কেবল খেলায় মত্ত ছিল। ঘরের মধ্যে তারা একে অপরকে ছোয়াছুয়ি করে খেললো। হাসোহাসি করলো, কোন বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করলো। বয়স্করা শিশুদের তিরস্কারও করলো। পরে তারা . একে একে তাদের মায়ের কোলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পুরুষ ও মহিলারা ঘরের মেঝেয় যে যেখানে পারল হাত-পা ছেড়ে বসে-শুয়ে সময় কাটাল।

সারা দিনের ঘটনার কথা ঘুমের মধ্যে কারও বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। অনেকে ঘুমাতে পারল না। অনেকে আধা ঘুমে রইল। পাশের কারও পা বা হাত দেহে লাগার সাথে সাথে তাদের কেউ কেউ চিৎকার করে উঠল। এমন কি যারা নাক ডেকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছিল বলে মনে হলো, তারও স্বপ্ন দেখল, দিনের ভয়াবহ দৃশ্য ওদের তাড়িয়ে ফিরল। তারা শুনল মোটর গাড়ির শব্দ, গরুর হাম্বা রব। শুনল মানুষের কান্না। ঘুমের মধ্যে তারা নিজেরাই কাঁদল। চোখের পানিতে তাদের দাড়ি ভিজে গেল।

আরও একবার যখন তারা মোটর গাড়ির হর্ন শুনতে পেল, তখন যারা আধাঘুমে ছিল তাদের মনে হলো তারা স্বপ্ন দেখছে। যারা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল, তাদের মনে হলো স্বপ্নের মধ্যেই তারা ঐ শব্দ শুনছে। তোমরা সবাই কি মারা গেছ? এমন জিজ্ঞাসার জবাবে তারা ঘুমের মধ্যেই হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠল।

শেষ রাতে এলো একটা জীপ। জীপের যাত্রীরা চলার পথের ঐ গ্রাম সম্পর্কে কিছু জানতে চায়, এক ঘর থেকে অন্য ঘরের দরজার কাছে গিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, ঘরে কেউ আছে? উত্তরে কুকুর শুধু ঘেউ ঘেউ করল। এরপর ঐ জীপ এলো মন্দিরের কাছে। আঙিনায় উঠে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কেউ আছে? নাকি সবাই মারা গেছে?

সবাই সচকিত হলো। শিশুরা কান্না শুরু করল। মিত সিং তাঁর হারিকেনের সলতে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি ও গ্রামের সর্দার আগন্তুকদের সাথে কথা বলতে বাইরে গেলেন।

আগন্তুক দুজন প্রত্যক্ষ করল, তারা কি ধরনের ভীতি সৃষ্টি করেছে। তারা মিত সিং ও সর্দারের উপস্থিতি উপেক্ষা করে হল ঘরের দরজার কাছে এলো। ভীতবিহব্বল ঐ লোকদের দিকে তাকিয়ে একজন বলল :

তোমরা কি সবাই মরে গেছ?

তোমাদের মধ্যে কি কেউ বেঁচে নেই? অপর লোকটি যোগ করল।

ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিলেন সর্দার, এ গ্রামের কেউ মারা যায়নি। আপনার কি চান? তারা কিছু জবাব দেয়ার আগেই খাকী পোশাক পরা আরও দুজন শিখ তাদের সাথে যোগ দিল। তাদের ঘাড়ে রাইফেল ঝুলানো।

গ্রামটিকে মৃত বলেই মনে হয়, তাদের একজন অন্যজনকে বলল।

গুরু এই গ্রামের প্রতি দয়াবান। এখানে কেউ নিহত হয়নি। আস্থার সাথে মিত সিং এর শান্ত জবাব।

ঠিক আছে, এখানে কেউ মারা না গেলে সবার মরে যাওয়া উচিত। তাল গাছ সমান পানি ঢেলে গ্রামটিকে ডুবিয়ে দেয়া উচিত। এ গ্রামে সব হিজড়াদের বাস, হাত উঁচু করে বেশ দৃঢ়তার সাথে বলল একজন।

আগন্তুকেরা তাদের জুতা খুলি হল ঘরের মধ্যে ঢুকাল। সর্দার ও মিত সিং তাঁদের অনুসরণ করলেন। লোকগুলো দাঁড়িয়ে তাদের পাগড়ি দুহাতে চেপে ধরল। মহিলারা তাদের কোলের শিশুকে জাপটিয়ে ধরে তাদের ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করল।

দলের মধ্য থেকে একজনকে নেতার মতো মনে হলো। সে ইশারায় সবাইকে বসতে বলল। আচরণে আক্রমণাত্মক ভাব লক্ষ্য করা গেল। তার বয়স খুব বেশি নয়। তার চিবুকে দাড়ির চিহ্ন বেশ উজ্জ্বলভাবেই দেখা যাচ্ছে। বেঁটে ও চিকন তার গড়ন। সব মিলিয়ে তাকে হীনবল মনে হয়। নীল পাগড়ি পরা নেতার কপালের ওপর (পাগড়ির অংশ) উজ্জ্বল লাল রঙের ফিতা। তার গোলাকার ঘাড়ের ওপর চিলে-ঢালা খাকী রঙের সামরিক শার্ট ঝুলে আছে। পায়ে কালে চামড়ার জুতা। তার বুকের ওপর দিয়ে পাঁচানো বেল্টের ফাঁকে ফাঁকে বুলেট সাজানো। কোমরে কালো চওড়া বেল্ট বাঁধা, তার কোমর যে চিকন তা সহ ই অনুমান করা যায়। বেল্টের এক পাশে থাপের মধ্যে রিভলবারের বাঁট, অপরদিকে একটা ছোরা ঝুলানো। তার চেহারা দেখতে এমন, যেন তার মা তাকে মার্কিন কাউবয়ের মতো করে সাজিয়েছে।

ছেলেটি ছেলেটি রিভলবারের খাপের ওপর হাত বুলিয়ে গুলির অগ্রভাগে আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া করল। তারপর পূর্ণ আস্থার সাথে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

এটা কি শিখ অধ্যুষিত গ্রাম? ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল।

গ্রামের লোকদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল যে, লোকটি লেখাপড়া জানা শহুরে লোক। কৃষকদের সাথে এসব লোক যখন কথা বলে তখন একটা ফাঁপা আভিজাত্যের ভাব তাদের আচরণে লক্ষ্য করা যায়। বয়স বা মর্যাদার প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই।

হ্যাঁ স্যার, সর্দার জবাব দিলেন। এ গ্রামটায় আগে থেকেই শিখরা বাস করে। আমাদের কিছু মুসলমান প্রজা ছিল, ওরা চলে গেছে।

তোমরা কি ধরনের শিখ? ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল। তার অঙ্গভঙ্গিতে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেল। সে তার প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলল, তোমরা মরদ না হিজড়া শিখ?

এ তোমরা এ প্রশ্নের জবাব কি, তা কেউ বলতে পারল না। গুরুদুয়ারায় দাঁড়িয়ে মহিলা ও শিশুদের সামনে এ ধরনের অশ্লীল কথারও কেউ প্রতিবাদ করল না।

তোমরা কি জান, কয়টা ট্রেন ভর্তি হিন্দু ও শিখের মৃতদেহ এসেছে? রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান, গুজরানওয়ালা ও শেখুপুরায় যে গণহত্যা হয়েছে তার খবর তোমরা রাখো? এ ব্যাপারে তোমরা কি করেছ? তোমরা শুধু খাচ্ছ, ঘুমাচ্ছ আর নিজেদের শিখ বলে দাবি

করছ? হায়রে সাহসী শিখ! বীরের জাতি! সে আগের কথার সূত্র ধরে বলল, আর তাচ্ছিলের সঙ্গে হাত নাড়াল। তার কথার প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস পায় কি না, সে তার তীক্ষ্ম চোখ দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে নিরীক্ষণ করল। লোকগুলো লজ্জায় মাথা হেট করে রইল।

কিন্তু আমরা কি করতে পারি সর্দারাজী? সর্দার প্রশ্ন করলেন। আমাদের সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে আমরা যুদ্ধ করব। মানো মাজরায় বসে বসে আম্নরা কি করব?

সরকার! অবজ্ঞা ভরে ছেলেটি বলল, তোমরা আশা কর সরকার সব কিছু করে আগে পাকিস্তানের মুসলমানরা কি সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করেছিল। ট্রেন থামিয়ে যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের হত্যু করার আগে ওরা কি সরকারের কাছে দরখাস্ত দিয়েছিল? তোমরা চাও সরকার সব কিছু করে দিক বাহ! সাবাস ব্রেভো! ছেলেটি রিভলবারের খাপটি দৃঢ়তার সাথে চেপে ধরল।

কিন্তু সর্দার সাহেব, আমতা আমতা করে সর্দার বললেন, আমরা কি করব বলে দিন।

ভাল কথা, ছেলেটি বলল, আমরা আলোচনা করতে পারি এ বিষয়ে। শোন, মন দিয়ে শোন আমার কথা। ছেলেটি থামল। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। প্রতিটি বাক্যই সে হাতের বুড়ো আঙ্গুল দুলিয়ে স্পষ্ট করে বলল দৃঢ়তার সাথে, ওরা একজন হিন্দু বা একজন শিখকে মারলে তোমরা অপহরণ করবে। দুজনকে। প্রতিটি ঘর লুঠ করার বদলে তোমরা দু'টো লুঠ করবে। একটা ট্রেন ভর্তি মৃতদেহের পরিবর্তে তোমরা পাঠাবে দু'টো ট্রেন ভর্তি মৃতদেহ। রাস্তায় একটা গাড়ি আক্রমণের শিকার হলে তোমরা আক্রমণ করবে। দু'টো গাড়ি। এ কাজ করলে সীমান্তের ওপারে। হত্যা বন্ধ হবে। ওরা বুঝতে পারবে যে, আমরাও হত্যা ও লুঠের খেলায় মেতেছি।

তার কথায় কি ফল হলো তা অনুধাবনের জন্য সে থামল। তার কথা লোকগুলো অতি আগ্রহভরে শুনেছে। একমাত্র মিত সিং-ই তার কথায় প্রভাবিত হয়নি বলে মনে হলো। গলা পরিষ্কার করে তিনি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

হ্যাঁ ভাই, চুপ করে রইলেন কেন? ছেলেটি যেন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলল।

আমি বলতে চাই, থেমে থেমে মিত সিং বললেন। আমি বলতে চাই, একই কথা তিনি আবার বললেন। এখানকার মুসলমানরা আমাদের ওপর কি করেছে যে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য তাদের ওপর আমরা প্রতিশোধ নেব? তাদের আমরা খুন করব? যারা দোষ করেছে তাদেরই কেবল শাস্তি পাওয়া উচিত।

ছেলেটি ক্রুদ্ধভাবে মুক্ত সিং-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখরা কি অপরাধ করেছিল যে, তাদের হত্যা করা হয়েছে? তারা কি নির্দোষ ছিল না। মহিলারা কি কোন অন্যায় কাজ করেছিল যে, তার জন্য তাদের ইজ্জত দিতে হয়েছে? শিশুরা কি কাউকে খুন করেছিল যে, তাদের পিতা-মাতার সামনে নির্বিচারে খুন করা হলো?

মিত সিং বিচলিত হলেন। ছেলেটি তাঁকে আরও বিচলিত করতে চাইল। কেন। ভাই? কথা বলুন। কি করতে চান এখন তা-ও বলুন।

আমি একজন বৃদ্ধ ভাই। কারও ওপর আমি হাত তুলতে চাই না। যুদ্ধেই হোক আছে কি? মহিলাদের ব্যাপারে আমাদের শেষ গুরু গোবিন্দ সিং কি বলেছিলেন তা তো আপনি জানেন। সবাইকে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে, কোন শিখ কোন মুসলমান মহিলাকে স্পর্শ করবে না। অথচ খোদা জানেন, মুসলমানদের হাতে তিনি কীভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন! ওরা তাঁর চার ছেলেকেই খুন করেছিল।

এ ধরনের শিখবাদ অন্য কাউকে শেখাবেন, ঔদ্ধত্যের সাথে ছেলেটি বলল, তোমাদের মতো লোকই দেশের জন্য অভিশাপ। মহিলাদের সম্পর্কে গুরুর বাণী তুমি আমাদের শোনালে। মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা তো বললে দু:স্ব সম্প্রদায়ের লোক মারা গেলে তুর্কদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। একথা কি হাঁ। মৃদু স্বরে জবাব

দিলেন মিত সিং। কিন্তু কেউ তো আপনাকে তাদের সাথে বন্ধুত্বের কথা বলছে না। তাছাড়া গুরুর সামরিক বাহিনীতে মুসলমানরাও ছিল....।

গুরু যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন তাদেরই একজন তাঁকে ছুরিকাঘাত করে।

মিত সিং অস্বস্তি বোধ করলেন।

গুরু যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন তাদেরই একজন তাঁকে ছুরিকাঘাত করে, একই কথা আবার বলল ছেলেটি।

হাঁ... খারাপ লোক সব জায়গাতেই আছে...।

একজন ভাল লোকের উদাহরণ আমাকে বলুন।

ছেলেটির সরস আলোচনায় মিত সিং পরাজয় বরণ করলেন। তিনি মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নীরবতায় প্রমাণিত হলো যে, তিনি পরাজিত হয়েছেন।

উনি নিজের মতে থাকুন। উনি একজন প্রবীণ ভাই। উনি প্রার্থনা নিয়েই থাকুন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে অনেকেই একথা বলল।

ছেলেটি খুশি হলো। সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে আনন্দের সাথে বলল, সাবধান। আমি আবার বলছি সাবধান। মুসলমানরা তরবারি ছাড়া কোন যুক্তি জানে না। একথা কখনও ভুলবে না।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ঐ গুঞ্জন ধ্বনির মধ্য দিয়ে তারা ছেলেটির কথায় সমর্থন জানাল।

গুরুর প্রিয় এমন কেউ কি এখানে আছে? শিখ সম্প্রদায়ের জন্য কেউ কি নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছে? সাহসী কেউ আছে কি? প্রতিটি বাক্যই সে চ্যালেঞ্জের মতো ছুড়ে দিল।

গ্রামবাসীরা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল। ছেলেটি তার বক্তব্যের মাধ্যমে সবাইকে উত্তেজিত করতে পেরেছে এবং তারা তাদের বীরত্ব প্রমাণ করতে চায়। একই সাথে তারা মিত সিং-এর উপস্থিতির কারণে অস্বস্তি বোধ করল। তারা মনে করল, মিত সিং-এর সাথে তারা বেইমানী করছে।

আমাদের কি করা উচিত? সর্দার জিজ্ঞাসা করলেন।, নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ছেলেটি বলল, আমাদের কি করতে হবে তা আমি বলে দেব। সে কাজ করতে তোমাদের অবশ্যই সাহসী হতে হবে। একটু থেমে ছেলেটি আবার বলল, আগামীকাল একটা ট্রেন মুসলমানদের নিয়ে ব্রিজ অতিক্রম করে পাকিস্তান যাবে। তোমরা যদি সত্যি সাহসী হও তাহলে তোমরা যত মৃতদেহ ট্রেন থেকে নামিয়েছিলে, ততু মৃতদেহ ট্রেনে করে ওপারে পাঠিয়ে দেবে।

শীতল নীরবতার অনুভূতি উপস্থিত সবার মনেই ছড়িয়ে পড়ল। ওরা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল!

ঐ ট্রেনেই থাকছে মানো মাজরার মুসলমানরা, মাথা উঁচু না করেই মিত সিং বললেন।

ভাই, আপনি বোধ হয় সব কুছুই জুনেন, তাই না? উত্তেজিত হয়ে যুবকটি বলল। আপনি কি ওদের ট্রেনের টিকিট দিয়েছন-না আপনার ছেলে রেলের বাবু? ট্রেনে যারা যাবে তারা কোথাকার মুসলমান আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। তারা মুসলমান, একথা জনাই আমার জন্য যথেষ্ট। জীবিত অবস্থায় তারা এ নদী পার হবে না। তোমরা যদি আমার সাথে একমত হও, তাহলে আলোচনা হতে পারে। যদি তোমরা ভয় পাও, তাহলে সে কথা এখনই বল। তোমাদের শুভ বিদায় জানিয়ে আমরা অন্য লোক খুঁজব, যারা সত্যি সাহসী।

সবাই চুপ করে রইল। দীর্ঘ নীরবতা। ছেলেটি তার রিভলবারের খাপে একটা চাপড় দিয়ে ধীরে ধীরে তার চারপাশের উদ্বিগ্ন মুখগুলো নিরীক্ষণ করল।

ব্রিজে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। মাল্লি বলল। সবার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে ছিল। মানো মাজরা গ্রামে এক আসার সাহস তার ছিল না। তবু সে এসেছে।

সাহসের সাথে সে গুরুদুয়ারায় পা রেখেছে। দরজার কাছে তার দলের কয়েকজনকে দেখা গেল।

সৈন্য বা পুলিশ নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। কেউ তোমাদের কাজে বাধা দেবে না। এ ব্যাপারটা আমরা দেখব, ছেলেটি বলল। পিছন দিক তাকিয়ে সে আবার বলল, স্বেচ্ছাসেবক কেউ আছে। এখানে?

আমার জীবন আপ্পনার হাতে, মাল্লি বীরের মতো বলল। জুগ্‌গা তাকে মেরেছে, এ খবর গ্রামের সবাই জানে। তার নিজের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দরকার।

সাবাশ, ছেলেটি বলল। শেষে একজন লোক পাওয়া গেল। শিখ ধর্ম প্রবর্তনের সময় গুরু পাঁচজনের জীবন প্রার্থনা করেছি। তাঁরা মানুষ নন, মহামানব। আমাদের প্রয়োজন পাঁচজনের চেয়ে অনেক বেশি। আর কে তার জীবন বিসর্জন দিতে আগ্রহী?

মাল্লির চারজন সঙ্গী বারান্দায় উঠে এলো। তাদের অনুসরণ করল আরও অনেকে। এদের অনেকেই উদ্বাস্তু। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই যারা গ্রামের মুসলমানদের চলে যাওয়ার কারণে চোখের পানি ফেলেছিল, তারাও স্বেচ্ছাসেবী হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। স্বেচ্ছাসেবী হওয়ার জন্য যারাই হাত উঁচু করছিল,। ছেলেটি তাদের সাবাশ ধ্বনি দিয়ে উল্লসিত করে এক পাশে বসার আহবান জানাচ্ছিল। উদ্ধৃঙ্খল ঐ অভিযানে পঞ্চাশ জনেরও বেশী যোগ দিতে সম্মত হলো।

যথেষ্ট হয়েছে, ছেলেটি বলল। আরও স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হলে আমি তোমাদের বলব। আমাদের অভিযান সফল হওয়ার জন্য এসো আ৷ প্রার্থনা করি।

সবাই দাঁড়াল। যে স্থানটিতে পবিত্র গ্রন্থখানি রাখা আছে, সেই স্থানের দিকে সবাই মুখ করে দু'হাত এক করে প্রার্থনা করল।

ছেলেটি মিত সিং-এর দিকে ফিরে কটাক্ষ করে বলল, ভাইজি, আপনি কি প্রার্থনা পরিচালনা করবেন?

এটা আপনার অভিযান সর্দার সাহেব, বিনয়ের সাথে মিত সিং বললেন, আপনিই প্রার্থনা পরিচালনা করুন।

ছেলেটি গলা পরিষ্কার করে চোখ বন্ধ করল এবং তারপর গুরুদের নাম উচ্চারণ করল। এই অভিযানে গুরুর আশীর্বাদ কামনা করে সে প্রার্থনা শেষ করল। সমবেত লোকেরা নতজানু হয়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করল:

গুরু নানকের নামে
সবার মনে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হোক
এই আশায়
দয়াময়ের রহমতে
এই বিশ্বে আমরা প্রতিষ্ঠিত করি
শুধু শুভ কামনা।

সমবেত সবাই দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল:

শিখ জাতি শাসন করবে
তাদের শক্ররা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে
কেবল তারাই রক্ষা পাবে
যারা আশ্রয় প্রার্থনা করবে!

ছোট এই অনুষ্ঠানটি শেষ হলো শুভ সকাল ধ্বনির মধ্য দিয়ে। ছেলেটি ছাড়া আর সবাই আবার বসল মেঝের ওপর। এই প্রার্থনা ছেলেটিকে বিনম্রর ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছে। সে হাত জোড় করে সমবেত লোকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল :

ভাই ও বোনেরা গভীর রাতে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। ভাইজি ও সর্দার সাহেব, আপনারও ক্ষমা করবেন। এই অসুবিধার জন্য এবং আমি কোন কটু কথা বলে থাকলে আপনারা দয়া করে মাফ করবেন। সব কিছু করা হচ্ছে গুরুর

সেবায়। স্বেচ্ছাসেবীরা, তোমরা পাশের কামরায় যাও। আপনারা বিশ্রাম গ্রহণ করুন। শুভ বিদায়।

শুভ বিদায়, উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলল।

৪.০৩ মিত সিং-এর কামরায়

বড় হল ঘরের পাশে মিত সিং-এর কামরায় যে মহিলা ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। আগন্তুকেরা স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ঐ কামরায় প্রবেশ করল। ঘরে আরও হারিকেন আনা হলো। একটা খাটিয়ার ওপর নেতা একটা ম্যাপ বিছিয়ে দিল। একটা হারিকেন সে উঁচু করে ধরল। স্বেচ্ছাসেবীরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে ম্যাপটি নিরীক্ষণ করল।

নেতা বলল, তোমরা এখন যেখানে আছ, সেখান থেকে ব্রিজ ও নদীর অবস্থান লক্ষ্য করতে পারছি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

তোমাদের কারও কাছে বন্দুক আছে?

তারা একে অন্যের দিকে তাকাল। না, কারও কাছে বন্দুক নেই।

এটা আলোচনার কোন বিষয়ই নয়, নেতা বলল। আমাদের কাছে ছয়-সাতটা রাইফেল আছে। সম্ভবত কয়েকটা স্টেনগানও আছে। তোমরা শুধু তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে আসবে। বন্দুকের চেয়ে এগুলো বেশি কাজে লাগবে।।

নেতা কিছুক্ষণ থামল।

আমাদের পরিকল্পনা এই রকম। আগামীকাল সূর্যাস্তের পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আমরা ব্রিজের প্রথম খিলানের ওপর আড়াআড়ি দড়ি বেঁধে দেব। দড়িটা থাকবে ইঞ্জিনের ধোয়া নির্গত হওয়ার নলের এক ফুট ওপরে। দড়ির নিচ দিয়ে ট্রেন অতিক্রম করার সময় ট্রেনের ছাদের ওপর বসে থাকা লোকগুলো দড়িতে বেধে নিচে পড়ে যাবে। এতে কম করে হলেও চার-পাঁচ শ লোককে আমরা ঘায়েল করতে পারব।

স্বেচ্ছাসেবীদের চোখে যেন বিদ্যুত খেলে গেল! এটা যে একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ তা তাদের চোখের ভাষায় স্পষ্ট হলো। তারা মাথা নেড়ে একে অপরের কথায় সায় দিল। সর্দার ও মিত সিং দরজার পাশে দাড়িয়ে সব কথা শুনছিলেন। নেতা তাঁদের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে বলল :

ভাইজি, এসব কথা শুনে আপনার লাভ কি? আপনি যান। প্রার্থনা করুন।

সর্দার ও মিত সিং নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে গেলেন। সর্দার জানতেন, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁকেও চলে যেতে বলবে নেতা।

সর্দারকে লক্ষ্য করে নেতা বলল, এই যে সর্দার সাহেব, এসব ঘটনা সম্পর্কে থানায় আপনার রিপোর্ট করা উচিত।

সবাই তার কথায় হাসল।

ছেলেটি হাতের ইশারায় সবার হাসি থামিয়ে দিল। সে বলল, কাল মধ্যরাতের পর চন্দননগর থেকে ট্রেনটি ছাড়ার কথা। ট্রেনে কোন আলো থাকবে না। ইঞ্জিনও থাকবে অন্ধকারে। রেল লাইনে এক শ গজ অন্তর অন্তর আমরা একজন করে লোক নিয়োগ করব, ওদের হাতে থাকবে টর্চলাইট। ট্রেন অতিক্রম করার সময় একজন লোক টর্চ জ্বালিয়ে সিগন্যাল দেবে। ফলে পরবর্তী লোকটি বুঝতে পারবে ট্রেন আসছে। অবশ্য ট্রেনের শব্দ শুনেও তোমরা বুঝতে পারবে ট্রেন আসছে। বেঁধে রাখা দড়িতে আটকে যেসব লোক ট্রেনের ছাদ থেকে ব্রিজের কাছে পড়বে, তাদের মারার জন্য ব্রিজের কাছেই তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে লোক মোতায়েন থাকবে। তাদের হত্যা করে নদীতে ফেলে দিতে হবে। যাদের কাছে বন্দুক থাকবে তারা রেল লাইন থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জানোলা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বে। ট্রেন থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষিপ্ত হওয়ার কোন আশংকা নেই। ট্রেনে মাত্র ডজনখানেক পাকিস্তানী সৈন্য থাকবে। অন্ধকারে তারা বুঝতেও পারবে না কোথায় গুলি করতে হবে। বন্দুকে গুলি ভরার সময়ও ওরা পাবে না। তারা যদি ট্রেন থামায়, তাহলে আমরা ওদের দেখব এবং সময়ের সুযোগ নিয়ে যত লোককে পারা যায় হত্যা করব।

পরিকল্পনাটি যথার্থ মনে হলো। প্রতিপক্ষের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগের কোন

সম্ভাবনা নেই। সবাই খুশি হলো।

এখন ভোর হতে আর দেরি নেই, ছেলেটি ম্যাপ ভাঁজ করতে করতে বলল। কিছুটা সময় তোমাদের ঘুমানো উচিত। কাল সকালে আমরা ব্রিজের কাছে যাব। ওখানে গিয়ে আমরা ঠিক করব রাতে কে কোথায় অবস্থান নেব। শিখ জাতি খোদার পছন্দনীয় জাতি। আমাদের খোদার জয় হোক।

বৈঠক শেষ হলো। আগন্তুকর গুরুদুয়ারায় আশ্রয় নিল। মাল্লি ও তার দলের লোকেরাও মন্দিরে থেকে গেল। গ্রামের অনেক লোক ইচ্ছা করেই মন্দির ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে গেল। তাদের আশঙ্কা ছিল, মন্দিরে যে ষড়যন্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে তারা উপস্থিত ছিল এবং সে কারণে সম্ভাব্য অপরাধমূলক কাজেও তারা জড়িয়ে পড়তে পারে। গ্রামের সর্দার দুজন লোককে সাথে নিয়ে চন্দননগর থানার দিকে রওনা হলেন।

৪.০৪ হুকুম চাঁদ

ঠিক আছে ইন্সপেক্টর সাহেব, ওরা হত্যাযজ্ঞ করুক, ক্লান্তভাবে বললেন হুকুম চাঁদ। প্রত্যেক লোকই হত্যার শিকার হোক। অন্য থানায় সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং আপনি যে সংবাদ পাঠাবেন তার রেকর্ড রাখবেন। আমরা যেন প্রমাণ করতে পারি যে, ওদের প্রতিহত করতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

হুকুম চাঁদকে মনে হলো একজন ক্লান্ত মানুষ। এক সপ্তাহে তাঁর চেহারা এমন হয়েছে যে, চেনাই যায় না। তাঁর মাথার চুলের গোড়ার সাদা অংশ দীর্ঘায়িত হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি দাড়ি কাটার ফলে কয়েক জায়গায় কেটে গিয়েছে। তাঁর চিবুক ঝুলে পড়েছে, ভাঁজ করা মাংস গরুর গল কম্বলের মতো ঝুলে পড়েছে। বার বার তিনি চোখ রাগড়াচ্ছেন।

আমি কি করতে পারি? কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। সারা বিশ্বটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। যাক পাগল হয়ে! আরও হাজার খানেক লোক খুন হলে কি এসে যায়? একটা বুলডোজার এনে আমরা তাদেরও আগের মতো করে সমাহিত করব। নদীর ধারে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমাদের বুলডোজারেরও দরকার নেই। মৃতদেহগুলো শুধু নদীতে ফেলে দেব। চল্লিশ কোটি লোক থেকে কয়েক শ চলে গেলে কী আর এমন হবে। মহামারীর সময় তো এর দশ গুণ লোক মারা যায়। কই, তখন তো কেউ মাথা ঘামায় না!

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব বুঝতে পারলেন যে, এ কথা প্রকৃতপক্ষে হুকুম চাঁদের নয়। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মনকে হালকা করার চেষ্টা করছেন মাত্র। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব কিছুক্ষণ ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করলেন। পরে সহানুভূতির সাথে বললেন :

হাঁ স্যার, আমি সব ঘটনা এবং আমরা যা কাজ করছি তার রেকর্ড লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। গত রাতে চন্দননগর থেকে সবাইকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। সৈন্য বা আমার কনস্টেবলদের কারও ওপর আমি আস্থা রাখতে পারিনি। আমি একটা কাজ করতে পেরেছি। পাকিস্তানী সৈন্যরা শহরে আছে, একথা বলে আমি আক্রমণকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হই। আমার কথায় ওরা ভীত হয়ে পড়ে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি মুসলমানদের সরিয়ে নিয়ে যাই। আমার চালাকি আক্রমণকারীরা আবিষ্কার করার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা মুসলমানদের ঘরবাড়ি লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি ধারণা করছি, ওদের অনেকে আমাকে ধরার জন্য থানায় আসার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু কারও উত্তম পরামর্শে ওরা তা করেনি। আপনি তো দেখছেন স্যার, বাড়ি ঘর থেকে বিতাড়নের সময় আমি মুসলমানদের গালিগালাজ খেয়েছি, শিখদের কাছ থেকে লুঠ করা জিনিস কেড়ে নিয়ে তাদেরও গালিগালাজের শিকার হয়েছি। আমার মনে হয়, নানা বাহানায় সরকারও আমাকে তিরস্কার করবে। আমি পেলাম শুধু একটা বড় কলা। সাবইন্সপেক্টর সাহেব মৃদু হেসে হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখালেন।

হুকুম চাঁদের মনটা খোশ মেজাজে ছিল না। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের কথার গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করতে পারলেন না।

ঠিক বলেছেন, ইন্সপেক্টর সাহেব। এই ঘটনা প্রবাহ থেকে আপনি আমি বদনাম ছাড়া আর কিছুই পাব না। আমরা কি-ই বা করতে পারি? প্রত্যেকেই বন্দুকের ট্রিগার টিপে খুশি। ভিড়ে ঠাসা ট্রেন, মোটর গাড়ি ও অসংখ্যা হেঁটে চলা উদ্বাস্তুদের মাঝে রাইফেলের ম্যাগাজিনের গুলি শেষ করে মানুষ রক্তের হোলি উৎসবে মেতেছে। রক্তাক্ত এই উৎসব। যেখানে বুলেট উড়ছে আকাশে-বাতাসে, সেখানে যাওয়া সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। আরো এ তো হুকুম চাঁদ, একে বিদ্ধ করো না- স্ফুটন্ত বুলেট থেমে গিয়ে এ কথা চিন্তা করবে না। কে বুলেট নিক্ষেপ করছে তার নামও বুলেটে লেখা নেই। এমন কি বুলেটে যদি কারও নাম লেখাও থাকে, তাহলেও তা কারও দেহে ঢুকে গেলে সান্তনা পাওয়ার কিছু থাকে কি? না ইন্সপেক্টর সাহেব! পাগলের আখড়ায় একজন সুস্থ লোক শুধু একটা কাজই করতে পারে। সে ভান করতে পারে যে, সে ওদের মতোই পাগল এবং প্রথম সুযোগেই বেড়া ডিঙ্গিয়ে পলায়ন।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব এ ধরনের ভাষণ শুনে অভ্যস্ত। এসব কথা যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মনের কথা নয়, তাও তিনি জানেন। কিন্তু হুকুম চাঁদ তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না এটা সত্যি বিস্ময়কর। তিনি কখনও কোন কথা সোজাভাবে বলেন না। এটা তাঁর কাছে বোকামি বলে মনে হয়। তাঁর কাছে কূটনীতির আর্ট হলো, সহজ কথা কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে বলা। এর ফলে কেউ কখনও বিপদে পড়ে না। তিনি এ কথা বলেছেন, এমন কথাও কেউ বলতে পারে না। আবার একই সাথে প্রমাণিত হয় তাঁর তীক্ষ্ণতা ও চালাকি। হুকুম চাঁদের মুতো দক্ষ কেউ নেই। যিনি পরোক্ষে অসম্মানজনক ইঙ্গিত করতে সমর্থ। আজ সকালে তিনি তাঁর মনকে বোধ হয় বিশ্রামে রেখেছেন।

গতকাল আপনার চন্দননগর যাওয়ার কথা ছিল। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন। তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সেদিকে আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্য তিনি বললেন, আমি যদি পাঁচ মিনিট পরে যেতাম, তাহলে একজন মুসলমানের জীবনও রক্ষা পেত না। আমি যাওয়াতে একজন লোকও মারা যায় নি। সবাইকে আম বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছি।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব একজন লোকও এবং সবাইকে শব্দ দু'টোর ওপর বেশ জোর দিলেন। হুকুম চাঁদের প্রতিক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করলেন।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব দেখলেন, তাঁর কথায় কাজ হয়েছে। হুকুম চাঁদ তাঁর চোখের কোণা ব্লগড়ানো বন্ধ করলেন। অতি সাধারণভাবে তিনি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ভাবখানা যেন তিনি শুধু তথ্য জানতে চাচ্ছেন। তার মানে আপনি বলতে চান, চন্দননগরে আর একটাও মুসলমান পরিবার নেই?

না স্যার, একটা পরিবারও নেই।

আমার মনে হয়, হুকুম চাঁদ বললেন, ঝামেলা মিটে গেলে ওরা ফিরে আসবে।

হতে পারে, সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন। ওরা ফিরে এসে আর কিছুই পাবে না। ওদের ঘরবাড়ি হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে আর না হয় দখল হয়ে গেছে। কেউ যদি ফিরেও আসে তাহলে তার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দেবে?

এ অবস্থা চিরদিন থাকবে না। আপনি দেখছেন অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা চন্দননগরে ফিরে আসবে। মুসলমান ও শিখরা আবার এক কলসির পানি পান করবে। হুকুম চাঁদের আশাবাদ যে ঠিক নয় তা তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন তাঁর কণ্ঠস্বরে। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবও বুঝলেন।

আপনি হয়ত ঠিকই বলছেন স্যার। তবে সব কিছু ঠিক হতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় লাগবে। চন্দননগরের উদ্বাস্তুদের আজ রাতে ট্রেনে করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভগবান জানেন, কতজন জীবিত অবস্থায় ব্রিজ পার হতে পারে। যারা চলে যাবে তারা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব এবার আসল কথাটাই বললেন। হুকুম চাঁদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাঁর কৃত্রিম গাম্ভীর্য আর বজায় রাখতে পারলেন না।

চন্দননগরের উদ্বাস্তুরা আজ রাতের ট্রেনে যাচ্ছে। এ কথা। আপনি কোথায় শুনলেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্যাম্প কমান্ডারের কাছ থেকে আমি এ কথা শুনেছি। ক্যাম্পে আক্রমণ করার একটা আশঙ্কা ছিল। সে কারণে তিনি প্রাপ্ত প্রথম ট্রেনেই উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তারা কেউ না গেলে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম। তারা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে এবং ট্রেনটা যদি দ্রুত যেতে পারে তাহলে অনেকের বাঁচার সম্ভাবনা আছে। ট্রেনটিকে লাইনচ্যুত করার পরিকল্পনা ওদের নেই। ওদের পরিকল্পনা, ট্রেনটি পাকিস্তান যাবে মৃতদেহ নিয়ে।

আকস্মিক বিপর্যয় এড়াবার জন্য যেন হুকুম চাঁদ চেয়ারের হাতল ধরলেন।

ক্যাম্প কমান্ডারকে আপনি সতর্ক করে দিচ্ছেন না কেন? তিনি উদ্বাস্তুদের না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

স্যার, ধৈর্যের সাথে ব্যাখ্যা করে সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, ট্রেনে আক্রমণের ব্যাপারে। আমি তাকে কিছুই বলিনি। কারণ তিনি যদি উদ্বাস্তুদের না পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে পুরো ক্যাম্পটিই নিশ্চিহ্ন করা হতে পারে। বিশ থেকে ত্রিশ হাজার উন্মত্ত গ্রামবাসী রক্তের জন্য অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার অধীনে পনেরো জন পুলিশ আছে। ওরা কেউ শিখদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বে না। উন্মত্ত গ্রামবাসীকে যদি আপনি আপনার প্রভাব খাটিয়ে নিরস্ত্র করেত পারেন তাহলে আমি ক্যাম্প কমান্ডারকে ট্রেনে সম্ভাব্য আক্রমণের কথা বলে উদ্বাস্তুদের না পাঠাবার অনুরোধ জানাতে পারি।

সাব-ইন্সপেক্টর যেন এবার তাঁর তলপেটে আঘাত করলেন।

না না, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আঁতকে উঠলেন। অস্ত্রধারী উন্মত্ত জনতার ওপর কোন প্রভাব কাজে আসবে না। না। আমাদের চিন্তা করতে হবে।

হুকুম চাঁদ চেয়ারে বসেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। নিজের দুহাতে তিনি মুখ ঢাকলেন। মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে কপালে বেশ কয়েকবার করাঘাতও করলেন। মাথার চুল এমন করে টানলেন যেন মস্তিষ্ক থেকে বুদ্ধি বের করে আনতে চান। তিনি।

মহাজনের খুনের কেসে যে দুজন লোককে আপনি গ্রেফতার করেছিলেন, তাদের কি হয়েছে? কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘটনার সাথে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রশ্নের কোন সংযোগ খুঁজে পেলেন না ইন্সপেক্টর সাহেব।

তারা এখনও লক-আপে আছে। গোলমাল না মেটা পর্যন্ত আপনি তাদের আটকে রাখতে বলেছিলেন। যে হারে গোলমাল বাড়ছে, আমার তো মনে হয় তাদের আরও কয়েক মাস আটকে রাখতে হবে।

মানো মাজরা ছেড়ে যেতে কোন মুসলমান মেয়ে বা গৃহহীন কোন লোক অস্বীকার করেছে?

না স্যার, চলে যেতে কারও বাকি নেই। পুরুষ, মহিলা, শিশু-সবাই চলে গেছে, ইন্সপেক্টর সাহেব জবাব দিলেন। হুকুম চাঁদ কি চিন্তা করছেন তা তিনি আন্দাজ করতে পারলেন না।

জুগ্গার সাথে কোন একটা তাঁতী মেয়ের প্রেম আছে বলছিলেন একবার। কি যেন মেয়েটার নাম?

নূরান।

ওহ্ হাঁ, নূরান। কোথায় সে এখন?

সে চলে গেছে। তার বাপ মানো মাজরার মুসলমানদের কাছে নেতার মতো ছিল। গ্রামের সর্দার তাঁর সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছুই বলেছে। তার মাত্র একটাই মেয়ে-নাম নূরান। সে ডাকাত জুগ্গার সন্তান ধারণ করেছে বলে অভিযোগ আছে।

অন্য লোকটির খবর কি? লোকটি রাজনৈতিক কর্মী না?

হ্যাঁ স্যার। পিপলস পার্টি বা ঐ ধরনের কোন পার্টির কর্মী। আমার মনে হয় লোকটি মুসলিম লীগার, নিজের পরিচয় গোপন রেখে সে কাজ করছে। আমি তাকে পরীক্ষা...

নির্দেশের জন্য কোন সাদা সরকারী কাগজ আপনার কাছে আছে? অধৈর্যের সাথে হুকুম চাঁদ তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন।

হ্যাঁ স্যার। সাব-ইন্সপেক্টর উত্তর দিলেন। তিনি কয়েকটা ছাপানো হলুদ কাগজ বের করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে দিলেন।

হুকুম চাঁদ হাত বাড়িয়ে সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের পকেট থেকে কলম টেনে নিলেন। টেবিলের ওপর কাগজ রাখতে রাখতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বন্দীদের নাম কি?

জুগ্গা বদমায়েশ এবং...

জুগ্গা বদমায়েশ, তাঁর কথায় বাঁধা দিয়ে বললেন, জুগ্গা বদমায়েশ আর ...? ইতোমধ্যে তিনি একটা কাগজ পূরণ করে অন্য একটা কাগজ নিলেন।

ইকবাল মোহাম্মদ না মোহাম্মদ ইকবাল, আমি ঠিক বলতে পারছি না। ইকবাল মোহাম্মদ নয় ইন্সপেক্টর সাহেব। তার নাম মোহাম্মদ ইকবালও নয়। তার নাম ইকবাল সিং, লিখতে লিখতে তিনি বললেন। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব যেন বোকা বনে গেলেন। হুকুম চাঁদ কিভাবে জানেন? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাথে মিত সিং কি দেখা করেছে?

স্যার, কারও কথায় আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি পরীক্ষা...

একজন শিক্ষিত মুসলমান এই গোলমালের সময় এখানে আসতে পারে আপনি তা বিশ্বাস করেন? আপনি কি চিন্তা করেন, কোন দল এমনই বোকা যে, মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে পাগলপারা শিখদের কাছে তারা একজন মুসলমানদে শান্তির বাণী নিয়ে পাঠাবে? ধিক আপনার কল্পনা শক্তিকো।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের মাথা নত হয়ে এলো। এটা মনে করা সমীচীন নয় যে, কোন শিক্ষিত লোক যে কোন কারণে তার জীবনকে বিসর্জন দেবে। তা ছাড়া তিনি নিজেও দেখেছেন যে, লোকটির ডান হাতে শিখরা যে স্টালের বালা পরে সেই বালা আছে।

আপনি ঠিক কথাই বলেছেন স্যার। কিন্তু ট্রেনে আক্রমণ ঠেকাতে এটার সাথে কোন সংযোগ আছে কি?

আমি ঠিক কথাই বলেছি, হুকুম চাঁদ গর্বের সাথে বললেন। আমার কথা ঠিক কি না। শীঘ্রই আপনি জানতে পারবেন। চন্দননগর যাওয়ার পথে আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের মুক্ত করে দেবেন। মুক্তি পাওয়ার পর ওরা দুজনেই যেন মানো মাজরায় যায় তা অবশ্যই দেখবেন। প্রয়োজন হলে ওদের জন্য একটা টাঙ্গা গাড়ি যোগাড় করে দেবেন। আজ সন্ধ্যার মধ্যে ওদের মানো মাজরা গ্রামে যাওয়া নিশ্চিত করবেন।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব কাগজপত্র নিয়ে হুকুম চাঁদকে স্যালুট করলেন। নিজের সাইকেলে চড়ে তিনি থানার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর মন থেকে ক্রমেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভাব কেটে গেল। হুকুম চাঁদের পরিকল্পনা তাঁর কাছে এমন স্পষ্ট হয়ে উঠল। যেমন বৃষ্টিমুখর দিনের পর উদ্ভাসিত হয় আলোকোজ্জ্বল দিন।।

৪.০৫ মানো মাজরায় অনেক পরিবর্তন

মানো মাজরায় আপনারা এখন অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন, টেবিলের এক পাশে চেয়ারে বসে সাধারণভাবেই কথাগুলো বললেন ইন্সপেক্টর সাহেব। টেবিলের অন্যদিকে ইকবাল সিং এবং জুগ্‌গা তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি বসছেন না কেন বাবু সাহেব? ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন। এবার সাবইন্সপেক্টর সাহেব সরাসরি ইকবাল সিংকেই বললেন, দয়া করে একটা চেয়ার নিন। ওহে, কি যেন তোমার নাম? বাব্রু সাহেবের জন্য একটা চেয়ার দাও না? তিনি একজন কনস্টেবুলকে লক্ষ্য করে বললেন। আমি জানি আপনি আমার ওপর রাগ করে আছেন। কিন্তু এতে আমার কোন দোষ নেই, তিনি বলে চললেন, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। আমি যদি মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করি। তাহলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা একজন শিক্ষিত লোক হিসাবে আপনি ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারেন।

কনষ্টেবিলটি ইকবাল সিং-এর জন্য একটি চেয়ার নিয়ে এল।

বসুন। চা বা অন্য কিছু আনবে আপনার জন্য? ইন্সপেক্টর সাহেব অতি মোলায়েমভাবে মৃদু হেসে বললেন।

আপনার দয়া। আমি বরং দাঁড়িয়ে থাকি। গত কিছুদিন সেলে আমি বসে বসেই কাটিয়েছি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমি চলে যেতে চাই, ইকবাল সিং বললেন। ইন্সপেক্টর সাহেবের মৃদু। হাসির প্রতি উত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না।

আপনি যখন ইচ্ছা যেখানে যেতে চান যেতে পারেন। আপনাকে মানো মাজরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি টাঙ্গা আনতে বলেছি। আমি সশস্ত্র কনস্ট্রেবল আপনার সাথে পাঠিয়ে দেব। চন্দননগরে এখন একা ঘোরাফেরা করা বা একা এক ভ্রমণ করা নিরাপদ নয়।

ইন্সপেক্টর সাহেব একখানি হলুদ রংয়ের কাগজ তুলে নিয়ে পড়লেন: জুগ্‌গাতু সিং, পিতা আলম সিং, বয়স চব্বিশ বছর, মানো মাজরা গ্রামের শিখ ধর্মাবলম্বী, দশ নম্বর বদমায়েশ।

ঠিক স্যার, কথার মধ্যে জুয়া হাসতে হাসতে বলল। পুলিশের কাছ থেকে সে যে ব্যবহার পেয়েছে তাতে তার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। কর্তৃপক্ষের সাথে তার সম্পর্ক অতি সাধারণ-সে সব সময় অন্যপক্ষের লোক। এর মধ্যে ব্যক্তিত্বের কোন সংঘাত নেই। সাব-ইন্সপেক্টর ও পুলিশ খাকি পোশাকে থাকে, ওরা প্রায়ই তাকে গ্রেফতার করে, সব সময় গালি দেয় এবং মাঝে মাঝে প্রহার করে। ক্রোধ বা ঘৃণার বশবর্তী হয়ে তারা যেহেতু তাকে গালি দেয় না বা মারে না, সেহেতু তাদেরকে বিশেষ কোন নামের মানুষ বলে গণ্য করা যায় না। তারা একটা সম্প্রদায়মাত্র। তাদের কাছ থেকে কেউ কেউ ভাল আচরণ আশা করে। সেই প্রার্থিত আচরণ না পাওয়া গেলে দুর্ভাগ্যই বলতে হয়।

তোমাকে ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু তোমাকে ১৯৪৭ সালের ১লা অক্টোবর সকাল ১০টায় ডেপুটি কমিশনার মিঃ হুকুম চাঁদের সামনে হাজির হতে হবে। এ কাগজটায় আঙ্গুলের ছাপ দাও।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব একটা স্ট্যাম্প প্যাড নিলেন। তিনি জুগ্‌গাত্ সিং-এর একটা আঙ্গুল নিজের হাতে নিয়ে স্ট্যাম্প প্যাডে ঘষলেন এবং পরে ঐ আঙ্গুলটা কাগজের ওপর রেখে চাপ দিলেন।

আমি এখন যেতে পারি? জুগ্‌গা জিজ্ঞাসা করল।

তুমি বাবুর সাথে টাঙ্গায় যেতে পোর। তা না হলে সন্ধ্যার আগে তুমি বাড়িতে পৌঁছতে পারবে না। জুগ্‌গার দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, মানো মাজরা এখন আর আগের মতো নেই।

মানো মাজরার পরিস্থিতি নিয়ে সাব-ইন্সপেক্টরের কথায় দুজনের কেউ আগ্রহ প্রকাশ করল না। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব। আর একখণ্ড কাগজ নিয়ে পড়লেন: মি, ইকবাল

সিং, সমাজকর্মী।

ইকবাল কাগজটার দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

মুসলিম লীগের সদস্য মোহাম্মদ ইকবাল নয়। আপনারা দেখছি ইচ্ছামতো তথ্য ও দলিল পরিবর্তন করেন।

সূর্ব-ইন্সপেক্টর সাহেব কপট হাসলেন। সবাই ভুল করে। মানুষ মাত্রই ভুল করে, ক্ষমা করা স্বর্গীয় গুণ, ইংরেজীতেই তিনি কথাগুলো বললেন। আমি আমার ভুল স্বীকার করছি।।

আপনার অসীম দয়া, ইকবাল বললেন, আমার ধারণা ছিল ভারতীয় পুলিশ ভুল করে না।

আপনি বোধ হয় আমাকে নিয়ে কৌতুক করছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি আপনার মিশন অনুযায়ী বক্তৃতা করার সময় উন্মত্ত শিখদের হাতে ধরা পড়লে তারা আপনার মানত না। আপনার লিঙ্গের চর্ম কাটা হয়েছে কি না তা দেখতে তারা আপনার কাপড় খুলে ফেলত। দাড়ি ও লম্বা চুল নেই এমন লোককে পরীক্ষা করার জন্য তারা এ ধরনের পরীক্ষাই করে থাকে। এরপর তারা আপনাকে মেরে ফেলত। আমার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ইকবালের কথা বলার মন ছিল না। তাছাড়া ঐ বিষয়টা নিয়ে তিনি কারও সাথে আলোপও করতে চান না। ঐ বিষয়ে সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের উলঙ্গ আলোচনার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

মানো মাজরায় আপনারা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন! সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব আরও একবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। জুগ্‌গা বা ইকবাল কেউ এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। ইকবাল তাঁর হাতের বইখানি টেবিলের ওপর রেখে বিদায় বা ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে গেলেন। জুগ্ন খালি পায়ে মেঝের ওপর ছিল। জুতা পায়ে দিয়ে সেও যাওয়ার উপক্রম করল।

মানো মাজরা থেকে সব মুসলমান চলে গেছে, নাটকীয়ভাবে সাব-ইন্সপেক্টর ঘললেন।

জুগ্‌গা তার অগ্রসরমান পা থামাল। তারা কোথায় গেছে?

গত রাতে তাদের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ রাতে তারা ট্রেনে করে পাকিস্তান যাবে।

গ্রামে কি গোলমাল হয়েছে? ইন্সপেক্টর সাহেব? তাদের চলে যেতে হলো কেন?

তারা গ্রাম ছেড়ে চলে না গেলে গোলমাল হতো। বাইরে থেকে বন্দুক হাতে বহু লোক এসে মুসলমানদের খুন করছে। মাল্লি ও তার দলের লোকেরা ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। মুসলমানরা মানো মাজরা ছেড়ে চলে না গেলে মাল্লি এতক্ষণে সবাইকে খুন করে ফেলত। তাদের সব জিনিসপত্র– গরু, মহিষ, ষাঁড়, খচ্চর, হাঁসমুরগি, তৈজসপত্র- মাল্লি গ্রাস করেছে। ভালই করেছে মাল্লি।

জুল্লার রাগ পঞ্চমে উঠে গেল। ঐ শুয়োরের বাচ্চাটা! ও ওর মায়ের সাথে ঘুমায়, বোন আর মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দেয়। ও যদি মানো মাজরায় পা রাখে, ওর পাছায় বাঁশ ঢুকিয়ে উঁচু করে রাখব।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব ঠোঁট উল্টিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসলেন। তুমি বড় বড় কথা বল সর্দার। তুমি তাকে সুযোগ মতো চুল ধরে আটকে পিটিয়েছিলে বলে মনে করছ, তুমি একটা সিংহ। হাতে চুড়ি ও মেহেদী রং লাগানো মহিলা মাল্লি নয়। সে মানো মাজরায় গিয়ে তার ইচ্ছামতো সব কিছুই করায়ত্ত করেছে। ওখানে সে এখনও আছে। ফিরে গিয়ে তুমি তাকে দেখতে পাবে।

আমার নাম শুনলে সেশিয়ালের মতো পালিয়ে যাবে।

তার দলের লোকেরাও তার সাথে আছে, অন্য অনেকে আছে। সবার হাতে আছে

বন্দুক ও পিস্তল। নিজের প্রাণের মায়া থাকলে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো।।

জুগ্গা মাথা নোয়ালো। ঠিক কথা ইন্সপেক্টর সাহেব। আবার আমাদের দেখা হবে। সে সময় মাল্লির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। রাগে সে গরগর করতে লাগল। আমি যদি তার পাছায় থুথু না দেই আমার নাম জুগ্গাত্ সিং নয়। সে তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ ঘষল। মাল্লির মুখে যদি আমি থুথু নিক্ষেপ না করি, আমার নাম জুগ্গাত্ সিং নয়। এ সময় জুয়াত্ সিং তার নিজের হাতে থুথু ফেলে উরুতে ঘষিল। তার ক্রোধ আরও চড়ে গেল। ঐ সময় খাকি পোশাক পরে আপনার পুলিশ যদি ওখানে না থাকে তাহলে বাপের বেটাকে দেখিয়ে দেব, জুগ্গাত্ সিং-এর সামনে চোখ উচু করে কথা বলার পরিণতি, একথা বলে সে তার বুক চওড়া করে মেলে ধরল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, সরদার জুগ্গাত্ সিং।। আমরা মানি, তুমি একজন অতি সাহসী লোক। অন্তত তুমি তাই মনে করো। সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব হাসলেন। সন্ধ্যার আগেই তোমার বাড়ি ফেরা দরকার। বাবু সাহেবকে তুমি সাথে করে নিয়ে যাও। বাবু সাহেব, আপনার ভয়ের কিছু নেই। আপনার দেখাশোনার জন্য আপনার সাথে থাকছে। জেলার সবচেয়ে সাহসী লোক।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের ব্যঙ্গোক্তির জবাব জুগ্গাত্ দেয়ার আগেই একজন কনষ্টেবল এসে জানোল যে, সে টাঙ্গা যোগাড় করেছে।

বিদায় ইন্সপেক্টর সাহেব। মাল্লি কাঁদতে কাঁদতে এসে আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে যখন রিপোর্ট করবে, তখন আপনি বিশ্বাস করবেন, জুগ্গাত্ সিং শুধু ফাঁকা কথা বলে না।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব হাসলেন।

বিদায় জুগ্গাত্ সিং। বিদায় ইকবাল সিংজি।

ইকবাল আর ফিরে তাকালেন না। সোজা এগিয়ে গেলেন।

৪.০৬ টাঙ্গা চন্দননগর ছেড়ে গেল

বিকেলের দিকে টাঙ্গা চন্দননগর ছেড়ে গেল। এ যাত্রা ছিল পুরোপুরি ঘটনাবিহীন। এ সময় জুগ্‌গা সামনের সিটো পুলিশ ও গাড়ি চালকের সাথে বসেছিল। পিছনের সিটে বসে ছিলেন ইকবাল।

কথা বলার মানসিকতা কারোরই ছিল না। বিপদের সময় যখন কেউ গাড়ি নিয়ে ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না, সে সময় পুলিশ গাড়ি চালক ভোলাকেই খোঁজ করে। ভোলা নির্ভয়ে তার হাড় জিরজিরে ধূসর রংয়ের ঘোড়া গাড়িতে জুড়ে বেরিয়ে পড়ে। এবারও সে গাড়ি নিয়ে রওনা দিয়েছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারা আর মুখ দিয়ে খিস্তি কাটা তার স্বভাব। এবারও সে একইভাবে গাড়ি চালাতে শুরু করল। অন্যরা নিমগ্ন রইল তাদের নিজের চিন্তায়।

গ্রামের পথ ছিল নীরব ও শান্ত। রাস্তার পাশের নিচু জমি পানিতে পূর্ণ থাকায় পরিবেশটি মনে হচ্ছিল আরও শান্ত। চাষাবাদের জমিতে কোন পুরুষ বা মহিলাকে দেখা গেল না। মাঠে কোন গরু-ছাগলকেও দেখা গেল না। দু'টো গ্রাম তারা অতিক্রম করল। কিন্তু কুকুর ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। ঐ গ্রাম দুটিতে। দুএকবার তাদের নজরে এল, কেউ যেন দেয়ালের পাশ দিয়ে বা কোন ঘরের কোণা দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। তাদের কাছে দেখা গেল বন্দুক বা বর্শা।

ইকবাল বুঝতে পারলেন যে, জুগ্‌গা ও কনস্টেবল, দুজন শিখ তাঁর সাথে থাকায় তাঁকে থামতে বলা এবং নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। তিনি যে শিখ, বেঁচে থাকার জন্য একথা প্রমাণ করতে হয় যেখানে, সেখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম বলে তিনি মনে করলেন। মানো মাজরা থেকে তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে প্রথম ট্রেনেই চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। এখন সম্ভবত কোন ট্রেন নেই। যদি কোন ট্রেন থাকেও, তাহলে তিনি কি ঐ ট্রেনে ঝুকি নিয়ে যাত্রা করবেন? ইকবাল নামের জন্য এবং পরে... ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিলেন। লিঙ্গের অগ্রবর্তী চামড়ার অংশ কাটা হয়েছে কি হয়নি তার ওপর একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোথাও মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে? এটা দুর্ভাগ্যজনক না হলেও হাস্যকর তো বটে। কয়েকদিন তাঁকে মানো মাজরায় থাকতে হবে মিত সিং-এর আশ্রয়ে। মিত সিং-এর চেহারা অগোছালো, প্রতিদিন দুবার তিনি মাঠে যান প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। এই চিন্তাও তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হলো।

তিনি যদি দিল্লীতে গিয়ে সভ্যতার ধারে কাছে থাকতে পারতেন! তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর গ্রেফতারের কথা বলতেন। তাঁদের দলীয় পত্রিকা তাঁর ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করত:

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে এ্যাংলো-মার্কিন পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র: সীমান্তে কমরেড ইকবাল গ্রেফতার ।

এতে তিনি সত্য সত্যই খ্যাতনামা হয়ে যেতেন।

জুগ্‌গার চিন্তা নূরানের কি হয়েছে তা নিয়ে। পাশের লোক বা গ্রামের মনোরম দৃশ্যের দিকে তার খেয়াল নেই। মাল্লির কথাও সে প্রায় ভুলে গেছে। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা রয়েছে, নূরান এখনও মানো মাজরায় আছে। ইমাম বখশ চলে যাক, এটা গ্রামের কেউ চায় না। অন্য মুসলমানদের সাথে ইমাম বখশ চলে গেলেও নূরান হয়ত মাঠে ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, আর না হয় সে তার মায়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তার আশা, তার মা তাকে তাড়িয়ে দেবে না। তার মা যদি তাকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে সে নিজে তার মাকে ছেড়ে যাবে। সে আর কোনদিন তার মার কাছে ফিরে আসবে না। নূরানকে আশ্রয় না দেয়ার জন্য সারা জীবন তাকে অনুশোচনা করে কাটাতে হবে।

জুগ্‌গা তার নিজের চিন্তায় বিভোর ছিল। কখনও সে উদ্বিগ্ন আবার কখনও বা ক্রুদ্ধ হচ্ছিল মনে মনে। শিখ মন্দিরে প্রবেশের জন্য ছোট গলিপথটায় ঢোকার জন্য গাড়ির গতি কম হওয়ার সাথে সাথেই জুগ্‌গা চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে অন্ধকারের মধ্যে

মিলিয়ে গেল। বিদায়ের সময় কারও সাথে সে একটা কথাও বলল না।

ইকবাল গাড়ি থেকে নেমে হাত-পা ঝাড়তে লাগলেন। গাড়ি চালক ও কনস্টেবল দুজন চাপা গলায় কি যেন কথা বলল!

আপনার আর কোন সেবা করতে পারি বাবু সাহেব? কনস্টেবলটি বলল।

না। ধন্যবাদ তোমাকে। আমি ঠিক আছি। তোমার কাজে আমি মুগ্ধ।

গুরুদুয়ারায় একা একা যাওয়ার কথা ইকবাল চিন্তা করলেন না। কিন্তু কাউকে সাথে করে তিনি সেখানে যাবেন, এটাও তিনি পছন্দ করলেন না।

বাবুজি, আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। সারা দিন আমার ঘোড়াটা বাইরে, দানা পানি কিছুই দিতে পারিনি। তাছাড়া সময়টাও খারাপ আপনি জানেন।

হ্যাঁ। তোমরা যেতে পার। ধন্যবাদ। বিদায়।

বিদায়।

৪.০৭ গুরুদুয়ারার আঙিনায়

গুরুদুয়ারার আঙিনায় হারিকেনের গোলাকার আলো দেখা যাচ্ছিল। রাতের খাবারের জন্য মহিলারা চুলায় আগুন জ্বলিয়েছিল। ঐ আগুনের আলোও দেখা যাচ্ছিল। বড় হল ঘরটায় মিত সিং বসে সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর চারপাশে লোক বসে ছিল। যে কামরায় ইকবাল তাঁর জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিলেন, সেই কামরাটি ছিল তালা দেয়া।

ইকবাল তাঁর জুতা খুলে, মাথায় একটা রুমাল দিয়ে ঐ লোকগুলোর পাশে গিয়ে বসলেন। দুএকজন লোক সরে দিয়ে তাঁকে বসার জায়গা করে দিল। ইকবালা লক্ষ্য করলেন, দুএকজন লোক তাকে দেখে কানাকানি করছে। লোকগুলো প্রবীণ এবং তাদের পোশাক শহুরে লোকের মতো। দেখে মনে হয়, তারা উদ্বাস্তু।

প্রার্থনা শেষে মিত্ত সিং পবিত্র গ্রন্থখানি ভেলভেটের কাপড়ে জড়িয়ে কুলঙ্গিতে রেখে দিলেন। কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি ইকবালের সাথে কথা বললেন।

শুভ সন্ধ্যা ইকবাল সিংজি। আপনি ফিরে আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার নিশ্চয় ক্ষুধা লেগেছে?

ইকবাল বুঝতে পারলেন, মিত সিং ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর উপাধি উল্লেখ করেছেন। তিনি উত্তেজনামুক্ত হলেন। কয়েকজন লোক তাঁর পাশে এসে তাঁকে শুভ সন্ধ্যা জানালেন।

শুভ সন্ধ্যা, তাদের কথার জবাব দিয়ে ইকবাল মিত সিং-এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

সরদার ইকবাল সিং অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য মিত সিং বললেন, একজন সমাজ কর্মী। তিনি বহু বছর বিলেতে ছিলেন।।

ইকবালের প্রতি একাধিক প্রশংসনীয় দৃষ্টি পতিত হলো বিলেত ফেরৎ। বার বার উচ্চারিত হলো শুভ সন্ধ্যা। ইকবাল অস্বস্তি বোধ করলেন।

আপনি একজন শিখ, ইকবাল সিংজি?, একজন লোক জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। পনেরো দিন আগে তিনি হয়ত দৃঢ়তার সাথে বলতেন, না অথবা আমার কোন ধর্ম নেই বা ধর্ম অপ্রাসঙ্গিক। পরিস্থিত এখন অন্য রকম। তবে একথা ঠিক যে, তিনি একজন শিখের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন।।

বিলেতে থাকার সময় কি আপনি চুল কেটে ফেলেন? আগের ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

না জনাব, ইকবাল জবাব দিলেন। আমি আমার চুল কখনও লম্বা হতে দেই নি। লম্বা চুল ও দাঁড়ি ছাড়াই আমি একজন শিখ।

আপনার পিতামাতাও নিশ্চয় উদার, তাঁর সহায়তায় মিত সিং এগিয়ে এলেন। এই বক্তব্যে সন্দেহ নিরসন হলেও ইকবাল নিজের বিবেকের কাছে ছোট হয়ে গেলেন।

মিত সিং তাঁর পাজামার দড়ির সাথে বাঁধা এক গোছা চাবি বের করলেন। তিনি পাশে টুলের ওপর রাখা হারিকেন নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে একটা কামরার দিকে গেলেন।

এই কামরায় আমি আপনার জিনিসপত্র তালা দিয়ে রেখেছিলাম। ঐ সব জিনিস আপনি বুঝে নিন। আমি আপনার জন্য খাবার যোগাড় করছি।

না ভাইজি! আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার কাছে যথেষ্ট খাবার আছে। আমি চলে যাওয়ার পর গ্রামে কি ঘটেছে তাই আমাকে বলুন। এসব লোকই বা কারা?

দরজার তালা খুলে মিত সিং কুলঙ্গিতে রাখা আলোর প্রদীপ জ্বলিয়ে দিলেন। ইকবাল তাঁর ব্যাগ খুলে সব জিনিস খাটিয়ার ওপর রাখলেন। তাঁর কাছে ছিল মাছ, মাখন ও পনিরের অনেক টিনের প্যাকেট। এ্যালুমিনিয়ামের অনেক কাটা চামচ, চামচ, ছুরি ও প্লাষ্টিকের কাপ-পিরচও ছিল তাঁর কাছে।

ভাইজি, কি হচ্ছে এখানে? ইকবাল আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

কি হচ্ছে? কি হয়নি। তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। ট্রেন ভর্তি মৃতদেহ এসেছে মানো মাজরা গ্রামে। একবার আমরা পুড়িয়েছি, একবার মাটি দিয়েছি। নদীর পানিতে

অসংখ্য মৃতদেহ ভাসছে। মুসলমানদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তাদের স্থানে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা এসেছে। আর কি জানতে চান। আপনি?

ইকবাল হাতের রুমাল দিয়ে প্লাস্টিকের কাপ ও পিরচ মুছলেন। তিনি তাঁর ফ্লাস্ক বের করে ঝাকালেন। ফ্লাস্ক ভর্তি, তিনি বুঝলেন।

ফ্লাস্কে কি আছে?

ওহ্ এটাতে? ওষুধ। ইকবাল আসল কথা চেপে বললেন। এটা খেলে আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, মৃদু হেসে তিনি বললেন।

এরপর আপনি টেবলেট খান হজম হওয়ার জন্য?

ইকবাল হাসলেন। হাঁ। এটা খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়। গ্রামে কেউ খুন হয়েছে।

না, অতি সাধারণভাবে মিত সিং বললেন। তিনি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন ইকবালকে বাতাসের গদি ফু দিয়ে ফুলাতে দেখে। কিন্তু এখানে খুন-জখম হতে পারে এ গদির ওপর ঘুমাতে খুব আরাম, তাই না? বিলেতে কি সব লোক এর ওপর ঘুমায়?

আপনি কি বলতে চান—এখানে খুন-জখম হবে? গদির মুখ বাঁধতে বাঁধতে ইকবাল জিজ্ঞাসা করলেন। সব মুসলমানরা তো চলে গেছে, তাই না?

হাঁ, কিন্তু ওরা আজ রাতে ব্রিজের কাছে ঐ ট্রেনটাতেই আক্রমণ করবে। ঐ ট্রেনে করে চন্দননগর ও মানো মাজরা গ্রামের মুসলমানদের পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপনার বালিশেও বাতাস ভর্তি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। ওরা কারা? নিশ্চয় গ্রামবাসীরা নয়?

আমি ওদের সবাইকে চিনি না। কয়েকজন লোক সামরিক পোশাকে সামরিক গাড়িতে করে এসেছিল। তাদের কাছে পিস্তল ও বন্দুক ছিল। উদ্বাস্তুরা ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। মাল্লি বদমায়েশ ও তার দলের লোকেরাও যোগ গিয়েছে। ঐ দলে। গ্রামের কিছু লোকও আছে। আচ্ছা, ভারি কোন লোক এর ওপর শুলে এটা ফেটে যায় না? মিত সিং গদি টিপতে টিপতে জিজ্ঞাসা করলেন।

এই ঘটনা, মিত সিং-এর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইকবাল বললেন। ওদের পরিকল্পনা এখন বুঝতে পারছি। সেজন্য পুলিশ মাল্লিকে ছেড়ে দিয়েছে। জুগ্গাও ওদের সাথে যোগ দেবে বলে আমার ধারণা। সব কিছুই পূর্ব পরিকল্পিত। বিছানার ওপর শুয়ে ইকবাল ঘাড়ের নিচে বালিশ দিলেন। ভাইজি, আপনি কি এটা থামাতে পারেন না? ওরা তো সবাই আপনার কথা শোনে।

মিত সিং গদির ওপর হাত বুলিয়ে মেঝের ওপর বসলেন।

বুড়ো ভাই-এর কথা কে শোনে? এখন সময় খুব খারাপ ইকবাল সিংজি, সময় খুব খারাপ। বিশ্বাসও নেই, ধর্মও নেই। এই দুঃসময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদে চুপচাপ থাকাই ভাল, তিনি গদ্দির ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বললেন।

ইকবাল উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেয়া আপনার উচিত। নয়। আপনি কি ওদের বলতে পারেন না যে, ঐ ট্রেনে যারা আছে তাদের তোমরা চাচা, চাচি, ভাই ও বোন বলে সম্বোধন করেছ?

মিত সিং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ঘাড়ে রাখা গামছা দিয়ে চোখের কোণা থেকে পানি মুছলেন।

আমি কিছু বললেও ওদের কি এসে যায়। তারা জানে, তারা কি করছে। তারা ওদের হত্যা করবে। তাদের অভিযান সফল হলে গুরুদুয়ারায় এসে তারা ধন্যবাদ। জানাবে। তারা পাপমুক্তির জন্যও প্রার্থনা করবে। ইকবাল সিংজি, এখন আপনি আপনার কথা বলুন। আপনি কি ভাল ছিলেন? থানায় পুলিশ কি আপনার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ভাল ছিলাম। মিত সিংকে থামিয়ে দিয়ে ইকবাল বললেন, কেন আপনি কিছু করছেন না? আপনি কিছু একটা করুন।

আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি করেছি। কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় তা

লোকদের বলাই আমার কাজ। তারা যদি অন্যায় কাজ করতে এগিয়ে যায়, আমি ভগবানের কাছে তাদেরকে ক্ষমা করার প্রার্থনা করব। আমি শুধু প্রার্থনা করতে পারি। বাকি কাজ করতে পারে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট। আর পারেন। আপনি।

আমি? আমি কেন? অবাক বিস্ময়ে ইকবাল তাঁকে বললেন, এখানে আমি কি করতে পারি? এসব লোককে আমি চিনি না। তারা একজন অচেনা লোকের কথা শুনবেই বা কেন?

আপনি যখন এখানে আসেন, তখন ওদের কিছু বলার জন্যই এসেছিলেন। এখন ওদের উদ্দেশে কিছু বলছেন না কেন?

ইকবাল কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। ভাইজি, লোকেরা যখন বন্দুক ও বর্শা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তাদের সাথে কথা বলার জন্য প্রয়োজন বর্শা ও বন্দুকের। এটা যদি আপনি না করতে পারেন তা হলে তাদের পথের সামনে থেকে সরে দাঁড়ানোই ভাল।

আমিও ঠিক ঐ কথা বলছি। আমি মনে করেছিলাম, সমস্যা সমাধানে আপনি আপনার ইউরোপীয় জ্ঞান কাজে লাগাবেন। আপনার জন্য কিছু সব্বজি এনে দেই। আমি কিছুক্ষণ আগে রান্না করেছি, মেঝে থেকে দাঁড়াতে গিয়ে বললেন মিত সিং।

না, না ভাইজি। আমার যা প্রয়োজন সব টিনের মধ্যে আছে। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমি আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব। খাওয়ার আগে আমার সামান্য কিছু কাজ আছে।

মিত সিং বিছানার পাশে একটা টুলের ওপর হারিকোনটা রেখে হল ঘরে চলে গেলেন।

৪.০৮ যেমনটি সিনেমার নায়ককে দেখা যায়

ইকবাল তাঁর থালা, ছুরি, চামচ ও টিনের কৌটা ক্যানভাসের থলির মধ্যে পুরলেন। তার মনে হলো তাঁর দেহে উত্তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেউ যখন তার প্রিয়াকে বলে যে, সে তাকে ভালবাসে, তখন যে ধরনের উত্তাপ বোধ হয়, ঠিক সেই রকম। ইকবালের পক্ষে এখন কিছু একটা ঘোষণা দেয়ার সময় হয়েছে। কিসের ঘোষণা, ইকবাল সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানেন না।

তিনি কি উন্মত্ত জনতার সামনে গিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলবেন যে, এটা অন্যায়-অনৈতিক ও সশস্ত্র লোকগুলোর দিকে তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবেন-তাঁর দৃষ্টি অবনত হবে না, কোনদিকে ফিরে তাকবেন না যেমনটি সিনেমার নায়ককে দেখা যায়। সিনেমার পর্দায় ক্যামেরার কারসাজিতে তাকে ক্রমেই দেখা যায় বিরাট আকারে-তারপর নায়কের প্রচণ্ড ঘুসি একের পর এক অথবা রাইফেলের গুলি একের পর এক। শিরঃদাঁড়া দিয়ে নিম্নানুভিমুখী একটা শীতল অনুভূতি ইকবাল অনুভব করলেন।

আত্মত্যাগের এই সর্বোৎকৃষ্ট কাজ দেখার জন্য কেউ থাকবে না। অন্য লোককে তারা যেভাবে খুন করবে, ইকবালকেও তারা সেইভাবে মেরে ফেলবে। তাদের দৃষ্টিতে তিনি নিরপেক্ষ নন। তারা তাঁর কাপড় খুলে দেখবে। লিঙ্গের চামড়ার অগ্রবর্তী অংশ কাটা, সুতরাং মুসলমান। জীবনকে একেবারে অকাজে বিনষ্ট করা হবে। এতে কি লাভ হবে? কয়েকজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ তাদের সমগোত্রীয় অন্য একজন মানুষকে হত্যা করবে। বছরে চল্লিশ লাখ লোক যে দেশে বাড়ে, সেখানে একজনের হত্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে খুব সামান্য প্রভাব ফেলবে। এমন নয় যে, খারাপ লোকের হাত থেকে ভাল লোককে বাঁচানো হচ্ছে। অন্যদের কোন সুযোগ থাকলে তারাও একই কাজ করত। বস্তুত কিছু লোক এ কাজ করছে নদীর ওপারে, সামান্য দূরে। সুতরাং আত্মত্যাগ অর্থহীন। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে নিজেকে নিরাপদ রাখাই পবিত্র দায়িত্ব।

ইকবাল তাঁর ফ্লাস্কের মুখ খুলে প্লাষ্টিকের কাপে বেশ কিছুটা হুইস্কি ঢাললেন। এক ঢোকে। তিনি সবটাই গলাধঃকরণ করলেন।

বুলেট যখন যত্রতত্র ছুটে বেড়ায় তখন বুলেটের গতিপথে মাথা পেতে দিয়ে গুলি খাওয়ার প্রয়োজন কি? বুলেট নিরপেক্ষ। ভাল-মন্দ, গুরুত্বপূর্ণ-গুরুত্বহীন কোন কিছু পার্থক্য না করে বুলেট আঘাত করে। সিনেমার পর্দায় আত্মাহুতির কিছুটা প্রভাব আছে-এ থেকে দর্শকরা নৈতিক শিক্ষা পেতে পারে। যা ঘটার তাই যদি ঘটে যায় তা হলে পর দিন সকালে হাজারটা মৃতদেহের সাথে আরও একটা মৃতদেহ যুক্ত হবে, ঐ মৃতদেহটিও দেখা যাবে অন্য মৃতদেহের মতো-কোঁকড়ানো কে বুঝবে যে তোমার মৃতদেহ মুসলমানের নয়! কে জানবে যে, তুমি এমন একজন শিখ যে পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুলেট বর্ষণের দিকে অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়েছ। শুধু এ কথা প্রমাণের জন্য যে, অন্যায়ের ওপর ন্যায় বিজয়ী হবে? আর ভগবানা-না, না ভগবান নয়। ভগবান এখানে অপ্রয়োজনীয়।

ইকবাল আর এক পেগ হুইস্কি ঢাললেন। মনে হলো তাঁর মনটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে।

তিনি ভাবলেন, আত্মত্যাগের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। ঐ লক্ষ্যের জন্য এটাই দেখা যথেষ্ট নয় যে, জিনিষটা ভাল; সেটা যে ভাল এ কথা সবার জানা থাকতে হবে। কেউ ঠিক পথে আছে। এ কথা শুধু তার জেনে কোন লাভ নেই; এই সন্তুষ্টি শুধু নিজেরই। স্কুলে বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য নিজে শাস্তি ভোগ করার মতো এটা নয়। সেক্ষেত্রে আত্মত্যাগের সুফল আনন্দের সাথে ভোগ করা যায়। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে তুমি নিজেই যাচ্ছ নিহত হওয়ার জন্য। এ কাজ সমাজের উপকারে আসবে না; সমাজ কোনদিন জানতেও পারবে না, এমন কি তুমি নিজেও জানতে পারবে না, কারণ তুমি নিজেই মারা যাবে। সিনেমার পর্দায় এ ধরনের ঘটনা হাজার হাজার লোক দেখে উত্তেজিত হয়, উদ্বিগ্ন হয়। এ দৃশ্য থেকে তারা শিক্ষাও গ্রহণ করে। সমগ্র বিষয়ের মধ্যে ওটাই প্রধান। গ্রহণকারীরা গ্রহণ করতে

প্রস্তুত থাকলেই কেবল আগ্রহী ব্যক্তিরা কিছু করতে পারে। অন্যথায় সব কিছু বিফলে যায়।

ফ্লাস্ক থেকে আবার কিছু ঢেলে তিনি গ্লাস পূর্ণ করলেন। সব কিছুই তাঁর কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

তোমার যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস হয় অবস্থার এমন অবনতি ঘটেছে যাতে তোমার প্রথম কাজ হলো নিজেকে বিসর্জন দেয়া-স্লেট থেকে সব কিছু পরিষ্কার করে মুছে ফেলা।– তাহলে বিসর্জনের মতো সামান্য কাজ করা তোমার উচিত নয়। তোমার প্রথম কাজ হবে, যারা আগুন ছড়াচ্ছে তাদের উপেক্ষা করা-তাদের প্রতি নৈতিক উপদেশ বর্ষণ করে নয়-এমন প্রবল প্রমত্তা ঢেউ প্রবাহিত করতে হবে যাতে স্বার্থপরতা, অধৈর্য, লোভ, মিথ্যা, চাটুকারিতার মতো সব ঘৃণ্য বস্তু ডুবে যায়। প্রয়োজন হলে রক্ত দিতে হবে।

ভারতীয় জনগণ কিছু কিছু প্রতারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মের কথাই ধরুন। হিন্দুদের কাছে ধর্ম জাতিভেদ প্রথা ও গরুকে বাঁচাও ছাড়া আর বিশেষ কিছু নয়। মুসলমানদের কাছে ধর্ম সুন্নত করা আর গরুর গোশত। শিখদের কাছে লম্বা চুল আর মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। খ্রীষ্টানরা মনে করে, হিন্দুত্ব আর সোলার টুপি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পারসিকদের কাছে ধর্ম হলো অগ্নিপূজা করা আর শকুনিকে আহার করানো। ধর্মীয় নীতির মূল কথা যে নৈতিকতা, সে কথা সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়। দর্শনের কথাই ধরুন। এ নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়। অতীন্দ্রিয়বাদের মতো এ বিষয়ে ছদ্মাবরণে অনেক বোকামি লক্ষ্য করা যায়। আর যোগ! যোগ বিশেষ করে হয়ে দাঁড়িয়েছে ডলার আয়ের উত্তম উপায়। মাথার ওপর ভর করে দু'পা উচু করে থাক। আড়াআড়ি করে দু'পা ভেঙ্গে বস এবং নাভির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখ। নিজের মনকে পূর্ণ আয়ত্তে আন। মহিলারা এতে যথেষ্ট হয়েছে না বলা পর্যন্ত ঐভাবে থাক এবং তুমি চোখ বন্ধ করেই বলতে পার পরবর্তী আসন। পুনর্জন্ম মতবাদ নিয়ে নানা কথা। মানুষ, ষাঁড়, বানর, গোবরে পোকা থেকে শুরু করে আট লাখ থেকে চার লাখ প্রকারের জীবিত প্রাণী। প্রমাণ? প্রমাণের জন্য এত সময় আমাদের নেই। প্রয়োজন বিশ্বাসের। যুক্তির প্রয়োজন নেই, বিশ্বাস থাকলেই হলো। দার্শনিক নীতির সাথে চিন্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে আমরা ওপরে উঠি, অনেক ওপরে। সৃষ্টিশীল বাস্তব জীবনে আমরা দড়ির খেলার চালাকি প্রদর্শন করি। আমরা শূন্যে দড়ি নিক্ষেপ করে ছোট ছেলেকে সেই দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠাতে পারি এবং ছেলেটি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে পারে ঐ দড়ি বেয়ে, একথা বিশ্ব যতদিন বিশ্বাস করবে ততদিন আমাদের ছলনা বাড়তেই থাকবে।

শিল্প ও সঙ্গীতের কথাই ধরুন। সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্যবিদ্যা এমন ব্যর্থ হলো কেন? কারণ এসব বিদ্যা খ্রীষ্টজন্মের পূর্বের বিষয় নিয়েই আবর্তিত। অতীত নিয়ে আলোচনা দোষের কিছু নয়, যদি তা একটা প্যাটার্নে পরিবর্তিত হয়। যদি পরিণামে তাই হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা হবে এমনই যে, আমাদের সম্মুখের রাস্তা বন্ধ। আকর্ষণহীন কিছুকে আমরা বর্ণনা করি, এর মধ্যে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। আর না হয় আমরা সব কিছু ভেঙ্গে ফেলি, যেমন, আধুনিক সিনেমার গান। হাইওয়ান গিটার, ভায়োলিন, এ্যাকোরডিয়ান ও ক্লারিনেটস-এ আমরা ট্যাংগো ও রাম্বা বা সাম্বা বাজাই। অন্য অনেক কিছুর মতো এর প্রতিবিধান করতে হবে।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন। গ্লাসে তিনি আর এক পেগ হুইস্কি ঢাললেন।

ভাল কিছু কাজ করতে উৎসাহিত হওয়ার একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হলো খারাপ কিছু সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা। যে ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে গেছে সেই ঘরের ওপর দোতলা করার চেষ্টা কোন কাজেই আসবে না। এর চেয়ে ঐ ঘরটা ভেঙ্গে ফেলাই উত্তম। কেউ যদি সমাজ বা সামাজিক নীতি না মানে তাহলে সামাজিক নীতির প্রতি নতজানু হওয়া ভীরুতা ও বোকার মত সাহসী হওয়ার সমান। ওদের সাহসের অর্থ তোমার ভীরুতা, ওদের ভীরুতার অর্থ তোমার সাহসিকতা। সব কিছুই পরিভাষার ব্যাপার। কেউ বলতে পারে, ভীরু হওয়ার

জন্যও সাহসের প্রয়োজন। এটা একটা বাধা, তবে উল্লেখ করার মতো। এর ব্যাখ্যা করার দরকার।

আর এক পেগ হুইস্কি। হুইস্কি পানির মতো। এর কোন স্বাদ নেই। ফ্লাস্কটা ঝাঁকিয়ে দেখলেন ইকবাল। ফ্লাস্কের তলায় ছলাৎ করে একটা শব্দ শোনা গেল। ফ্লাস্ক এখনও খালি হয়নি। ভগবানকে ধন্যবাদ, ফ্লাস্ক এখনও খালি হয়নি।

ইকবাল মনে মনে ভাবলেন, বিভিন্ন বস্তুর দিকে তাকালে এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না যে, মানুষ বা ভগবানের এমন কোন নিয়ম আছে যার ওপর ভিত্তি করে কেউ তার আচরণ সেই ধাঁচে গড়ে তুলতে পারে। অসত্যের ওপর সত্য যেমন জয়ী হচ্ছে তেমনি সত্যের ওপরও অসত্য জয়ী হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সত্যের ওপর অসত্যের জয় বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। পরিণামে কি হচ্ছে, তা তুমি জানতে পার না। এমন পরিস্থিতিতে সব ধরনের মূল্যবোধের প্রতি উদাসীন থাকা ছাড়া আর তুমি কি করতে পার ঐ কোন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না ... কোন কিছুই না। ইকবাল ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর হাতে রইল প্লাষ্টিকের কাপ। তার পাশে টুলের ওপর রাখা হারিকেন জ্বলতে থাকল।

গুরুদুয়ারার আঙ্গিনায় চুলার আগুন নিভে ছাই হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাতাস লেগে ছাই সরে যাওয়ায় আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে। বাতি জ্বলছে মিট মিট করে। হল ঘরের মেঝের ওপর পুরুষ, মহিলা ও শিশু বিক্ষিপ্তভাবে শুয়ে। মিত সিং জেগেছিলেন। তিনি মেঝে ঝাড় দিচ্ছিলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলোও গুছিয়ে রাখছিলেন।

কেউ যেন দরজায় করাঘাত করল। মিত সিং, ঝাড় দেয়া বন্ধ করে আঙ্গিনা অতিক্রম করে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

কে?

তিনি দরজা খুলে দিলেন। জুগ্‌গা ভিতরে ঢুকল। অন্ধকারের মধ্যে তাকে আগের চেয়ে মোটা দেখাচ্ছিল। পুরো দরজার ফাঁক যেন তার দেহ দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেল।

কি ব্যাপার জুল্লাত্‌ সিংজী, এ সময়ে তুমি এখানে, কি ব্যাপার? মিত সিং জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাই, সে আস্তে আস্তে বলল, আমার গুরুর আশীর্বাদ দরকার। বাণীর একটা অংশ আমাকে শোনাবেন?

রাতের জন্য পবিত্র গ্রন্থ আমি তুলে রেখেছি, মিত সিং বললেন। তুমি কি কাজ করতে চাও যে গুরুর আশীর্বাদ দরকার ?

কাজ নিয়ে আলোচনার দরকার নেই, জুগ্ন অধৈর্যের সাথে বলল। মিত সিংএর কাঁধের ওপর সে তার মাংসল হাত রাখল। কয়েকটা লাইন আমাকে তাড়াতাড়ি পড়ে শোনান।

মিত সিং এগিয়ে গেলেন বিড়বিড় করতে করতে। তুমি কোনদিন কোন সময় গুরুদুয়ারায় আস না। এখন যখন পবিত্র গ্রন্থ তুলে রাখা হয়েছে এবং মানুষজন সব ঘুমাচ্ছে, তখন তুমি আমাকে বলছি গুরুর বাণী শোনাতে। এটা ঠিক নয়। সকালের প্রার্থনা থেকে আমি কিছুটা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

আপনি কি পড়বেন তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। কিছু এটা পড়ুন।

মিত সিং একটা হারিকেনের সলতে কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন। এর ঘোলা চিমনিটা কিছুটা উজ্জ্বল হলো। যে চৌকির ওপর পবিত্র গ্রন্থ রক্ষিত আছে তার পাশে মেঝের ওপর তিনি বসলেন। চৌকির নিচ থেকে জুগ্‌গা একটা বাতাস করার ফুলঝড় নিয়ে মিত সিং-এর মাথার ওপর দোলাতে লাগল। মিত সিং প্রার্থনার একখানা ছোট গ্রন্থ হাতে নিয়ে কপালে ঠোকালেন এবং গ্রন্থখানি খুলে একটা অংশ পড়লেন:

দিন ও রাত যিনি সৃষ্টি করেছেন
যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তাহের দিনগুলো ও ঋতুসমূহ।
যিনি প্রবাহিত করেন মৃদুমন্দ বায়ু ও পানি,

যিনি সৃষ্টি করেছেন আগুন ও নিম্নভূমি।
পৃথিবীকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আইনের মন্দির।
যিনি সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ধরনের প্রাণী।
বিভিন্ন নামে,
এটাই আইন—
চিন্তা ও কাজকে নিশ্চয়ই বিচার করতে হবে;
খোদা সত্য এবং তিনি সত্য বিধান দেন।
তাঁর দরবার অলঙ্কৃত হয় পছন্দের লোক দিয়ে
এবং স্বয়ং ভগবান তাদের কাজকে গ্রহণ করেন,
সম্পাদিত বাছাইকৃত কাজ এবং যে কাজের পরিণতি ভাল,
যে কাজ তাদের দ্বারা কোনদিন সম্পাদিত হতো না।
এসব, ওহে নানক, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে ঘটবে।

মিত সিং প্রার্থনা গ্রন্থ বন্ধ করে কপালে ঠেকালেন। তিনি সকালের প্রার্থনার শেষের কিছু অংশ বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন:

বায়ু, পানি ও মাটি
সব দিয়ে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি
গুরুর বাণীর মতো বায়ু জীবনকে সচল করে
ধরিত্রী মাতার সব কিছুকে পানি জীবন দান করে।

শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর এমনই ভারি হয়ে গেল যে, তাঁর কথা মোটেই বোঝা গেল না!

জুগ্গাত্ সিং ফুলঝাড়ুটা চৌকির নিচে রেখে দিয়ে পবিত্র গ্রন্থের সামনে নতজানু হয়ে মেঝেতে কপাল ঠেকাল।

গুরুর ঐ বাণী কি ভাল? সে সরল মনে জিজ্ঞাসা করল।

গুরুর সব বাণীই ভাল, মিত সিং অতি ভক্তির সাথে বললেন।

যা পড়লেন তার মানে কি?

মানে দিয়ে তুমি কি করবে? এসব গুরুর কথা। তুমি কোন উত্তম কাজ করতে গেলে গুরু তোমাকে সাহায্য করবেন; কোন খারাপ কাজ করতে গেলে গুরু তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। তুমি যদি খারাপ কাজ করতে জিদ কর, তাহলে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত গুরু তোমাকে শাস্তি দেবেন এবং শেষে মাফ করে দেবেন।

ঠিক। আমি গুরুর বাণীর মানে জেনে কি করব? আচ্ছা ভাইজি, শুভ বিদায়।

শুভ বিদায়।

জুগ্গা নতজানু হয়ে আবার মেঝের ওপর কপাল ঠেকাল। তারপর সোজা হয়ে সে ঘুমন্ত লোকগুলোর মধ্য দিয়ে বাইরে এসে জুতা জোড়া হাতে নিল। একটা কামরায় আলো দেখা গেল। জুয়া ঘরের মধ্যে কে তাকিয়ে দেখল। বালিশের ওপর পড়ে থাকা উস্কখুস্ক চুল ও মাথা সে চিনতে পারল। ইকবাল ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁর বুকের ওপর পড়ে রয়েছে। শূন্য ফ্রাঙ্কটি।

শুভ রাত বাবুজী, সে মৃদু স্বরে বলল। কোন উত্তর এলো না। আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন??

উনাকে বিরক্ত কর না, মিত সিং আস্তে আস্তে বললেন। ওর শরীরটা ভাল নেই। তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন।

আচ্ছা ভাইজি, আমার পক্ষ থেকে বাবুকে আপনি শুভ বিদায় বলবেন। জুগ্গাত্ সিং গুরুদুয়ারা থেকে বেরিয়ে গেল।

৪.০৯ বুড়ো বোকার মতো আর কোন বোকা হয় না

বুড়ো বোকার মতো আর কোন বোকা হয় না। হুকুম চাঁদের মনে এ কথা বার বার উদিত হতে লাগল। এ কথা যেন মনে না আসে, তার চেষ্টা করলেন, ভুলে থাকতে চাইলেন ঐ কথা। কিন্তু বার বার তাঁর মনে ঐ একই কথা উদয় হলো, বুড়ো বোকার মতো আর কোন বোকা হয় না। পঞ্চাশ বছরের একজন বিবাহিত লোকের পক্ষে মহিলা সংগ্রহ করে রাত কাটানো খারাপ এবং খুবই খারাপ কাজ। মেয়ের সমান বয়সী একটা মেয়ের সাথে আবেগপ্রবণ হয়ে জড়িয়ে পড়া মোটেই ঠিক হয়নি তাঁর। মেয়েটি আবার মুসলমান দেহপসারিণী। এটা সত্যি হাস্যকর। সব কিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব লোপ পাচ্ছে। তিনি বৃদ্ধ ও বোকা হয়ে পড়েছেন।

যে পরিকল্পনা সকালের দিকে তাঁর মনে আনন্দ দিয়েছিল, এখন তা উবে গেছে। আনন্দের পরিবর্তে তাঁর মনে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। তিনি যে বুড়ো হয়েছেন, এ কথাও তাঁকে ভাবিয়ে তুলছে বার বার। বদমায়েশ বেটা আর সমাজকর্মীকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জেনেই। তাঁর মতো সম্ভবত ওদেরও কোন ক্ষমতা নেই। বামপন্থী কতিপয় সমাজকর্ম অবশ্য অতিসাহসী ও দুর্দমনীয় বলে পরিচিত। কিন্তু যে সমাজকর্মীকে তিনি ছেড়ে দিলেন, তিনি একজন বুদ্ধিজীবী। এ ধরনের লোককে অবজ্ঞাভরে বলা হয় আরাম কেদারায় বসা বুদ্ধিজীবী। তিনি কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার জন্য অন্যকে সমালোচনা ছাড়া সম্ভবত নিজে কিছুই করবেন না। বদমায়েশটা অবশ্য এক কুখ্যাত ডানপিটে। ট্রেন ডাকাতি, গাড়ি থামিয়ে লুঠ, ডাকাতি, খুন-সব কাজেই সে দক্ষ। হয় প্রতিশোধ আর না হয় টাকা, এ দু'টোই তার উদ্দেশ্য। সে যদি মাল্লির সাথে বোঝাপড়া করতে চায়, তাহলে একটা সম্ভাবনা আছে। জুগ্গার উপস্থিতির কথা শুনে মাল্লি যদি পালিয়ে যায়, তাহলে জুগ্গা হয়ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ঐ দলে যোগ দেবে, হত্যা-লুঠপাটে মেতে উঠবে। কোন মেয়ের জন্য এ ধরনের লোক জীবনকে বাজি ধরে না। নূরান মারা গেলে সে অন্য মেয়ের কাছে যাবে।

হুকুম চাঁদ নিজের ভূমিকায়ও সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজের কাজ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়াই কি যথেষ্ট? আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব। কিন্তু তাঁরা শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন তাঁদের পিছনে যে ক্ষমতা থাকে তার বলে, ঐ ক্ষমতার বিরোধিতা করে নয়। কিন্তু ক্ষমতা কোথায়? দিল্লীতে যে সব লোক আছে, তারা কি করছে? সংসদে সুন্দর সুন্দর ভাষণ দিচ্ছে! লাউড স্পীকারে তাদের অহংবোধ জোরে প্রকাশ করছে। দর্শক গ্যালারিতে আকর্ষণীয় মহিলারা তাদের ভাষণের তারিফ করছে। একজন মহান ব্যক্তি তোমাদের লোক মিঃ নেহেরু। আমার মনে হয়, আজকের বিশ্বে তিনি একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব। দেখতে কি সুন্দর। এখন কি সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা বলার সময় হয়নি। অনেকদিন আগে আমরা ভাগ্যক্রমে মিলিত হয়েছিলাম পুরোপুরি নয়, আংশিকভাবে। হ্যাঁ, মিঃ প্রধান মন্ত্রী, আপনি মিলিত হয়েছিলেন। যেমন মিলিত হয়েছিল আরও অনেকে।

হুকুম চাঁদের বন্ধু প্রেম সিং লাহোর গিয়েছিল তার স্ত্রীর গয়নাপত্র ফিরিয়ে আনতে। সেখানে সে মিলিত হয়েছিল ফলেট হোটেলে। এই হোটেলে ইউরোপীয় সাহেবরা একে অন্যের বউ নিয়ে প্রমোদে মত্ত হয়। এই হোটেলের পাশেই পাঞ্জাব এ্যাসেম্বলি বিল্ডিং। এখানে পাকিস্তানের সাংসদরা গণতন্ত্রের কথা বলে, আইন প্রণয়ন করে। প্রেম সিং হোটেলে বসে বিয়ার পান করে সময় কাটোত আর হোটেলে অবস্থানরত ইউরোপীয়দের বিয়ার পান করার আমন্ত্রণ জানাত। ওদিকে তার নিজের বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করত। ফেজ টুপি ও পাঠান পাগড়ি পরিহিত ডজনখানেক লোক। সে বেশি পরিমাণ বিয়ার পান করে তার ইংরেজ বন্ধু ও অর্কেস্ট্রার লোকদের বিয়ার পান করার আমন্ত্রণ জানাত। নিজ গৃহে যাদের সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। তার ইংরেজ বন্ধুরা মাত্রাতিরিক্ত বিয়ার ও হুইস্কি পান করে প্রেম সিংকে মহৎ ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। নৈশ আহারের জন্য দেরি হচ্ছে দেখে তারা বলেছে, শুভ রাত্রি মিঃ... আপনার নামটা মনে

করতে পারছি না। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মি. সিং। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। মি. সিং, আবার দেখা হবে। খাবার রুমে গিয়ে তারা বলেছে, লোকটি ভাল। বৃদ্ধ হলেও ক্ষমতা আছে। এখনও মদ পান করছে। এমন কি বাদ্য দলের লোকরাও আগের চেয়ে অনেক বিয়ার পেয়েছে। আপনি আর কি শুনতে চান স্যার, গোয়ার ব্যান্ড মাস্টার মেনডোজা তার কাছে জানতে চেয়েছে। অনেক রাত হয়েছে, আমরা এখন বন্ধ করতে চাই। ইউরোপীয় কোন সঙ্গীত সম্পর্কে প্রেম সিং কিছু জানে না। বিপদে পড়ে সে। তার মনে হলো, একজন ইংরেজকে সে বলতে শুনেছে ব্যানা নাজ-এর মতো শব্দ। তাই সে বলল। মেনডোজা ডি-মেলো, ডি-সিলভা, ডি-সারাম ও গোমেজ বানানাজ-এর সুর তুলল। তাদের যন্ত্রে। প্রেম সিং লন অতিক্রম করে গেটের দিকে গেল। ব্যান্ড দল দেখল, প্রেম সিং চলে গেছে। তারা গড় সেভ দি কিং-এর সুর তুলল।

হুকুম চাঁদের পিয়নের মেয়ে সুন্দরী। নিয়তি তাকে নিয়ে গেল। গুজরানওয়ালা যাওয়ার রাস্তায় মিলনের জন্য। চারদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে। দু'হাত ভর্তি লাল সোনালী চুড়ি। হাতের তালুতে মেহেদি রং। মনসা রামের সাথে রাত কাটাবার সুযোগও তার হয়নি। তাদের আত্মীয়স্বজন তাদের এক মিনিটের জন্যও একা থাকতে দেয়নি। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে স্বামীর মুখখানাও সে ভাল করে দেখতে পায়নি। নতুন বউকে সাথে করে রাম ওজরানওয়ালা যাবে। ওখানে সে পিয়নের চাকরি করে। সেশন কোর্ট এলাকায় তার নিজস্ব একটা কামরা আছে। ওখানে তার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। বউকে সে ওখানে নিজের করেই পাবে। তাকে খুব উৎসাহী মনে হলো না। বাসে বসে সে অন্য যাত্রীদের সাথে খোশ-মেজাজে আলাপ করতে শুরু করল। তার আগে আলাপে অনেকে উদাসীনতা দেখাল। কেউ কেউ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করল না যে, বিবাহিত মহিলাটি তার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। ঘোমটা মুখে মহিলাটি বসে আছে, তো আছেই। স্বামীর দিকে ফিরে একটা কথাও বলছে না! হাত থেকে সোনালী চুড়ি একটাও খুলবে না। এতে অকল্যাণ হয়, তার বান্ধবীরা তাকে বলেছিল। বাসর রাতে তোমার স্বামী যখন তোমার সাথে মিলিত হবে তখন তার দ্বারাই যেন ওগুলো ভেঙ্গে যায়।

প্রতি হাতেই প্রায় ডজনখানেক চুড়ি, কাবুজি থেকে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত। হাতের আঙ্গুল দিয়ে একবার সে নাড়াচাড়া করে দেখল। চুড়িগুলো শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর। এগুলো ভাঙতে রামকে বেশ জোরে জড়াজড়ি করতে হবে এবং কিছুটা নিষ্ঠুরও হতে হবে। হঠাৎ করে মেয়েটির দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চলন্ত বাস থেমে গেল। রাস্তার ওপর বড় পাথর। প্রায় হাজার খানেক লোক তাদের ঘিরে ধরল। প্রত্যেককে বাস থেকে নেমে যেতে বলা হলো। শিখদের কেটে ফেলা হলো। দাড়ি কামানো লোকদের কাপড় খুলে দেখা হলো। সুন্নত দেয়া লোকদের ছেড়ে দেয়া হলো, যাদের সুন্নত করা ছিল না তাদের সুন্নত করানো হলো। শুধু লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া নয় পুরো লিঙ্গটাই কেটে ফেলা হলো। যে মনসা রামের দিকে তার স্ত্রী ভাল করে তাকাচ্ছিল না, সেই মনসা রামকে তার স্ত্রীর সামনে উলঙ্গ করা হলো। কয়েকজন লোক তার হাত-পা ধরে রাখল, আর একজন লোক তার লিঙ্গ কেটে কর্তিত অংশ তার স্ত্রীকে দিল। উন্মত্ত লোকগুলো রামের স্ত্রীর ইজ্জত লুণ্ঠ করল। হাতের চুড়ি তাকে নিজে খুলতে হলো না। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা অবস্থায় সব চুড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সম্ভবত ঐ চুড়িই তার জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছিল।

সুন্দর সিং-এর কাহিনী অবশ্য অন্য ধরনের। হুকুম চাঁদ তাকে সেনাবাহিনীর জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। সে ভাল কাজ করেছিল। বর্মা, ইরিত্রিয়া ও ইতালিতে সাহসের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সে খুবই নাম করে এবং বহু মেডেল পায়। সিন্ধুতে সরকার তাকে জমি প্রদান করে। ট্রেনের মধ্যেই সে চরম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তার সাথে তার স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে ছিল। ৪০ জন বসার এবং ১২জন ঘুমাবার কামরায় পাঁচ শর বেশি পুরুষ, মহিলা ও শিশু ওঠে। কামরায় ছোট একটা প্রক্ষালন কক্ষ। সিস্টার্নেও পানি নেই। কামরার মধ্যে তাপমাত্রা ১১৫ ডিগ্রী। বাইরে আরও বেশি। নিশ্চয়ই। আশপাশে কোন গাছপালা নেই। দেখা

যায় শুধু সূর্য আর বালি. পানি নেই কোথাও। প্রতিটি স্টেশনেই রেলিংয়ের ধারে বর্শা হাতে লোক দাঁড়িয়ে। এরপর একটা স্টেশনে এসে ট্রেন থেমে গেল। চারদিন ঐভাবেই রইল। কাউকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। সুন্দর সিং-এর ছেলেমেয়েরা খাদ্য ও পানির জন্য চিৎকার করল। অন্যরাও খাদ্য ও পানির আশায় আর্তচিৎকার করল। সুন্দর সিং নিজের প্রস্রাব ছেলে-মেয়েদের পান করাল। কিন্তু তারপর …। সে তার রিভলবার বের করে সন্তানদের গুলি করে হত্যা করল। সাঙ্গারা সিং-এর বয়স ছয়। তার মাথার লম্বা চুল দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হলো। চার বছরের শিশু দীপুর চোখ উল্টে গেল। চার মাসের শিশু আমারো তার মায়ের শুকনো বুকে কিছু দুধ পাওয়ার আশায় চিৎকার করছিল। চিৎকারে তার মুখে রক্তবিন্দু ফুটে উঠল। সুন্দর সিং তার স্ত্রীকেও রেহাই দিল একটা গুলি ছুড়ে। এরপর সে পাগলপ্রায় হয়ে গেল। সে তার নিজের মাথায় রিভলবার ধরল। কিন্তু গুলি ছুড়ল না। নিজেকে হত্যা করার কোন অর্থ হয় না। ট্রেনটি আবার যাত্রা শুরু করল। স্ত্রী ও সন্তানদের মৃতদেহ জড়িয়ে সে পড়ে রইল। এভাবেই সে চলে এলো ভারতে। সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করেনি। তার পরিবারের সদস্যরাই জীবন দিয়ে মুক্ত হয়েছে।

হুকুম চাঁদের মনে হলো তিনি সত্যি দুঃখী। রাত ঘনিয়ে এলো। নদীর দিক থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা গেল। বারান্দার পাশে জেসমিন ফুল গাছের ঝোপে জোনাকিরা মিট মিট করে আলো জ্বালালো। হুকুম চাঁদের জন্য বেয়ারা হুইস্কি এনেছিল। কিন্তু তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বেয়ারা তাঁর জন্য রাতের খাবার দিল। কিন্তু তিনি কিছুই খেলেন না। ঘরে রাখা হারিকেন তিনি সরিয়ে নিতে বললেন। অন্ধকারে বসে তিনি অনন্ত আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কেন তিনি মেয়েটিকে চন্দননগর ফেরত পাঠালেন? মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে কপালে আঘাত করে তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, কেন? সে যদি রেষ্ট হাউসে তাঁর সাথে থাকত, তাহলে বাকি পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে কি না তা তিনি চিন্তাও করতেন না। কিন্তু সে এখানে নেই, সে আছে ট্রেনে। ট্রেনের শব্দ শুনতে পেলেন হুকুম চাঁদ।

হুকুম চাঁদ চেয়ারের এক পাশে সরে বসলেন দু’হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদলেন কিছুক্ষণ। তারপর মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা শুরু করলেন।

৪.১০ আকাশে চাঁদ উঠল

রাত এগারোটার সামান্য কিছু পরে আকাশে চাঁদ উঠল। ক্ষয়প্রাপ্ত চাঁদকে মনে হলো ক্লান্ত। সমতল ভূমিতে এর অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়ল। অস্পষ্ট আলোয় সব কিছু দেখা গেল কিছুটা ঝাপসাভাবে। ব্রিজের কাছে চাঁদের আলো খুব কম পড়ছিল। রেল লাইনের ধারে উঁচু বাঁধের জন্য এলাকাটি ঝাপসা দেখাচ্ছিল।

সিগন্যালের কাছে মেশিনগান রাখার জায়গাটি বালির বস্তা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। রেল লাইনের দু'পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বালির বস্তা পড়ে ছিল। সিগন্যালের খুঁটি এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন মনে হয়, অনেক প্রহরী এক সাথে এলাকাটি পাহারা দিচ্ছে। দু'টো বড় ডিম্বাকৃতি চোখের মতো-একটার ওপরে আরএকটা, বস্তু থেকে লাল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সিগন্যালের দু'টো অংশ আড়াআড়ি সমান্তরাল অবস্থায় ছিল। নদী তীরের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের মতো মনে হচ্ছিল। নদীর পানি চকচক করছিল না। শান্ত নদীর পানিতে মাঝে মাঝে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

নদীর তীর থেকে সামান্য দূরে একটা ঝোপের পরে খালি জায়গায় একটা জীপ দাঁড়িয়ে ছিল। এর ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছিল। গাড়িতে কেউ ছিল না। জীপের লোকরা গাড়ি থেকে নেমে রেল লাইনের দুধারে কয়েক ফুট অন্তর ব্যবধানে বসে ছিল। দুপায়ের মাঝে রাইফেল ও বর্শা নিয়ে তারা অপেক্ষায় ছিল। ব্রিজের প্রথম লোহার খুটিতে আড়াআড়িভাবে একটা মোটা দড়ি বাঁধা ছিল। রেল লাইন থেকে প্রায় কুড়ি ফুট ওপরে দড়ি বাঁধা ছিল।

এলাকাটি এমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল যে, একজন অন্যজনকে চিনতে পারছিল। না। এ কারণে তারা বেশ জোরেই কথা বলছিল। একজন আহ্বান জানাল:

চুপ কর! শোন!

তারা চুপ করে শুনল। কিছুই শোনা গেল না। শোনা গেল কেবল নলখাগড়া বনে বাতাসের শব্দ।

চুপ করে থাক, নেতার আদেশ শোনা গেল। এভাবে কথা বলতে থাকলে তোমরা সময়মতো ট্রেনের শব্দ শুনতে পাবে না।

অতঃপর তারা চাপা গলায় কথা বলতে লাগল।

সিগন্যালের একটা অংশ ডাউন হওয়ার সময় ষ্টিলের তারের সঞ্চালনে শিন শিন আওয়াজ শোনা গেল। ডিম্বাকৃতি সিগন্যালের চোখ লাল রং থেকে সবুজে পরিণত হলো। চাপা গলায় কথা বলা থেমে গেল। লোকগুলো দাঁড়িয়ে রেল লাইন থেকে মাত্র দশ গজ দূরে অবস্থান নিল।

ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল হুইসেলের শব্দ। একজন রেল লাইনের ওপর কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল।

চলে এসো, বোকা কোথাকার, কর্কশ শব্দে চাপা কণ্ঠে নেতা বলল।

ট্রেন আসছে, নিশ্চিত হয়ে সে গর্বের সাথে বলল।

নিজের জায়গায় ফিরে যাও, আবার নির্দেশ এলো নেতার।

ধূসর শূন্যতার দিকে সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল। ঐদিক থেকেই ট্রেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এরপর ওরা দড়ির কাছে চলে এলো। যেমন শক্ত তেমনি কাটার মতো লোকগুলোর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। ভয়ে ওরা কেঁপে উঠল।

স্টেশন থেকে বেশ দূরে একটা আলো জ্বলছিল। হঠাৎ করে ওটা নিভে গেল। কিন্তু তার পাশেই আর একটা আলো জুলে উঠল। এরপর একে একে আরও আলো জ্বলে উঠল। ট্রেনটাও ক্রমাগত এগিয়ে আসছিল। লোকগুলো আলো জ্বলার দিকে তাকিয়ে ট্রেনের শব্দ শুনতে লাগল। ব্রিজের দিকে কেউ আর খেয়াল করল না।

ইস্পাতের খিলানের ওপর একজন লোক ওঠার চেষ্টা করছিল। খিলানের ওপর দড়ির কাছে ওঠার পর তাকে ওদের কেউ দেখে ফেলল। ওরা লোকটিকে নিজের দলের লোক মনে করল। দড়ির বাঁধন ঠিক আছে কিনা তা বোধ হয় সে পরীক্ষা করে দেখছে।

লোকটি দড়ি টেনে দেখল। বেশ শক্ত করেই বাঁধা। ইঞ্জিনের ধোঁয়া নির্গত হওয়ার উঁচু অংশ দড়িতে বেঁধে গেলে হয়ত দড়ি ছিড়ে যেতে পারে, কিন্তু গেরো খুলবে না। লোকটি দড়ির ওপর শুয়ে পড়ল। তার পা রইল গেরোর দিকে। তার হাত দড়ির প্রায় মাঝখানে পৌঁছে গেল। লোকটি বেশ লম্বা।

ট্রেনটি ক্রমেই নিকটে আসতে লাগল। দৈত্যের মতো ইঞ্চিনাটা এবং চিমনি দিয়ে নির্গত আগুনের ফুলকি ট্রেন লাইন দিয়ে এগিয়ে আসছে। ট্রেনের বিকট শব্দের মধ্যে হুইসেলের শব্দ প্রায় শোনা যায় না। অস্তমান চাঁদের আলোয় পুরো ট্রেনটা এবার দেখা গেল। ইঞ্জিনের কাছে কয়লা রাখার বগি থেকে শেষ বগি পর্যন্ত ছাদের ওপর লোক এমনভাবে রয়েছে যে, ফাঁকা জায়গা বলতে কিছুই নেই।

লোকটা এখনও দড়ির ওপর শুয়ে আছে। নেতা পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, ওখান থেকে সরে এসো। গাধা কোথাকার, তুমি মারা পড়বে। এখনই সরে যাও।

লোকটি নেতার দিকে ঘুরল। সে তার কোমরবন্ধ থেকে ছোট একটা কৃপাণ বের করে দড়ির ওপর আঘাত করতে শুরু করল।

লোকটি কে? কে ঐ লোকটি....?

আর সময় নেই। ব্রিজ থেকে ওরা ট্রেনের দিকে তাকাল। ট্রেনের কাছ থেকে তাকাল ব্রিজের দিকে। লোকটি তার সব শক্তি দিয়ে দড়ি কাটার চেষ্টা করছে।

নেতা ঘাড়ের ওপর রাইফেল নিয়ে গুলি ছুঁড়ল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না গুলি। একটা পায়ে গুলি লাগল। আঘাতপ্রাপ্ত পা-টি দড়ি থেকে ছিটকে শুনো ঝুলতে লাগল। অন্য পা-টি তখনও দড়ির সাথে জড়িয়ে ছিল। পাগলের মতো সে দ্রুত আঘাত করতে লাগলো দড়ির ওপর তার ছোট কৃপাণ দিয়ে। ইঞ্জিনটা আর মাত্র কয়েক গজ দূরে। প্রতিটি হুইসেলের সাথে ইঞ্জিন থেকে নির্গত হচ্ছিল আকাশ ছোঁয়া গোলাকার ধোঁয়া। কেউ আবার একটা গুলি ছুঁড়ল। এবার লোকটির দেহ দড়ি থেকে ছিটকে পড়ল। কিন্তু সে হাত ও চিবুক দিয়ে দাঁড়িতে ঝুলে রইল। সে নিজেকে উচু করে বাম বোগালের নিচে দড়ি রাখতে সমর্থ হলো; ডান হাত দিয়ে সে শুরু করল দড়ি কাটা। ফালি ফালি হয়ে গেল দড়ি। দড়ির সামান্য একটা মাত্র গুণ অবশিষ্ট ছিল। সে কৃপাণ ও দাঁত দিয়ে তা ছেড়ার চেষ্টা করল। ইঞ্জিন তার কাছাকাছি চলে এসেছিল। আকস্মিক, তার ওপর এক সাথে অগুনতি গুলি বর্ষিত হলো। লোকটি কেঁপে উঠে নিঃসাড় হয়ে পড়ে গেল রেল লাইনের ওপর। শক্ত দড়িটাও ছিড়ে গেল। তার নিস্পন্দ দেহের ওপর দিয়ে ট্রেনটি অতিক্রম করল। চলল পাকিস্তানের দিকে।

***

Table of Contents

কাহিনী সংক্ষেপেঃ
অনুবাদকের কথা
১.০১ ডাকাতি
১.০২ ঐ বছরের আগষ্ট মাসের এক গভীর রাতে
১.০৩ জুগ্‌গাত্‌ সিং
১.০৪ রেল ব্রিজের উত্তর পাশে
১.০৫ গাড়িটা বাংলো ত্যাগ করার সময়
১.০৬ যে রাতে ডাকাতি হলো
১.০৮ পরদিন সকালে ইকবালকে গ্রেফতার করা হলো
১.০৯ ইকবালকে গ্রেফতার করতে দুজন কনষ্টেবল
১.১০ পুলিশ বন্দীদের হাজির করার পর
১.১১ ইকবাল ও জুয়াকে টাঙ্গায় করে
১.১২ সন্ধ্যার সময় একজন পুলিশ
২.১ কলিযুগ
২.২ দুঃখজনক ঘটনার ছায়া
২.৩ বর্ষাকালের শুরু
২.৪ বাথরুমের দরজা বন্ধ ও খোলার শব্দ
২.৫ ইকবালকে তাঁর সেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছিল
২.৬ বৃষ্টির ধারা কমে গিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
৩.১ মানো মাজরা
৩.২ হেড কনস্টেবলের আগমন
৩.৩ ইমাম বখশ
৩.৪ মানো মাজরায় বেশি লোক ঘুমাতে পারল না
৩.৫ সারা রাত ধরে বৃষ্টি
৪.০১ কর্ম
৪.০২ প্রার্থনার জন্য গুরুদুয়ারায়
৪.০৩ মিত সিং-এর কামরায়
৪.০৪ হুকুম চাঁদ
৪.০৫ মানো মাজরায় অনেক পরিবর্তন
৪.০৬ টাঙ্গা চন্দননগর ছেড়ে গেল
৪.০৭ গুরুদুয়ারার আঙিনায়
৪.০৮ যেমনটি সিনেমার নায়ককে দেখা যায়
৪.০৯ বুড়ো বোকার মতো আর কোন বোকা হয় না
৪.১০ আকাশে চাঁদ উঠল

Table of Contents

কাহিনী সংক্ষেপেঃ
অনুবাদকের কথা
১.০১ ডাকাতি
১.০২ ঐ বছরের আগষ্ট মাসের এক গভীর রাতে
১.০৩ জুগ্‌গাত্‌ সিং
১.০৪ রেল ব্রিজের উত্তর পাশে
১.০৫ গাড়িটা বাংলো ত্যাগ করার সময়
১.০৬ যে রাতে ডাকাতি হলো
১.০৮ পরদিন সকালে ইকবালকে গ্রেফতার করা হলো
১.০৯ ইকবালকে গ্রেফতার করতে দুজন কনষ্টেবল
১.১০ পুলিশ বন্দীদের হাজির করার পর
১.১১ ইকবাল ও জুয়াকে টাঙ্গায় করে
১.১২ সন্ধ্যার সময় একজন পুলিশ
২.১ কলিযুগ
২.২ দুঃখজনক ঘটনার ছায়া
২.৩ বর্ষাকালের শুরু
২.৪ বাথরুমের দরজা বন্ধ ও খোলার শব্দ
২.৫ ইকবালকে তাঁর সেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছিল
২.৬ বৃষ্টির ধারা কমে গিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
৩.১ মানো মাজরা
৩.২ হেড কনস্টেবলের আগমন
৩.৩ ইমাম বখশ
৩.৪ মানো মাজরায় বেশি লোক ঘুমাতে পারল না
৩.৫ সারা রাত ধরে বৃষ্টি
৪.০১ কর্ম
৪.০২ প্রার্থনার জন্য গুরুদুয়ারায়
৪.০৩ মিত সিং-এর কামরায়
৪.০৪ হুকুম চাঁদ
৪.০৫ মানো মাজরায় অনেক পরিবর্তন
৪.০৬ টাঙ্গা চন্দননগর ছেড়ে গেল
৪.০৭ গুরুদুয়ারার আঙিনায়
৪.০৮ যেমনটি সিনেমার নায়ককে দেখা যায়
৪.০৯ বুড়ো বোকার মতো আর কোন বোকা হয় না
৪.১০ আকাশে চাঁদ উঠল